মুসলিম বিশ্বে
ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)

জুলফিকার আলী নদভী অনূদিত
সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)-এর বিশিষ্ট খাদেম ও খলিফা
ফাযিল, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত
শিক্ষক, মাদরাসাতুল হুদা, বাসাবো, ঢাকা।

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা।

মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

মূল : সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)

অনুবাদক : জুলফিকার আলী নদভী

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ আব্দুর রউফ

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

Tel : 02-712-1121; Cell : 01190-529411;

01822-806163

প্রকাশকাল

আগস্ট ২০১২ খ্রী.

শ্রাবণ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

রমজান ১৪৩৩ হিজরী

কম্পিউটার কম্পোজ

মাহফুজ কম্পিউটার

৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা।

সেল : ০১৯১১-৪৭৬৫৭৭

মুদ্রণ

মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস

৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

প্রচ্ছদ : বশির মেসবাহ, সালসাবিল।

ISBN : 978-984-90177-1-4

বিনিময় : সাদা : ২২৫.০০ টাকা মাত্র।

Western Civilization : Islam & Muslim : (Muslim Bishwey Islam & Pashchattaya Savvotar Danda) : Written by Sayed Abul Hasan Ali Nadvi (R) in Arabic, translated by Zulfikar Ali Nadvi into Bengali and published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh. Tel: +88-02712-1121, Fax: 88-02-7118420, Cell: 01822-806163; 01190-929411.

E-mail : roufster@gmail.com website : www.muhammadbrothers.com

Price : Tk. 225.00 Only. U. S. # 8.00 only

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের। লাখো কোটি দরূদ ও সালাম রাসূলে আরাবী খাতিমুল আম্বিয়া, রাহ্‌মাতুল-লিল-আলামীন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওপর যাঁর আগমনে এ নশ্বর দুনিয়া ধন্য হলো এবং আমাদেরকে এক মহান আল্লাহ্ বান্দার পরিচয়ে সম্মানিত করলো।

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত দা'ঈ ও মুবাল্লিগ, মশহুর বুযুর্গ, মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ) পশ্চিমা সভ্যতা সম্পর্কে বিশ্বের কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রের নেতিবাচক ও অসর্তকতামূলক আচরণ ও পদক্ষেপের কারণে বিচলিত ও শংকিত হয়ে পড়েন। কারণ সুকৌশলে পশ্চিমা কৃষ্টি, কালচার ও পশ্চিমা জাহেলী সভ্যতাকে মুসলমানগণ নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টিতে মেশাতে শুরু করছে। ফলে ইসলামী কৃষ্টি, কালচার ও সভ্যতা থেকে ক্রমেই দূরে সরে আসছে মুসলমানরা। চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েছে এ বিস্ময়কর মুসলিম ঐতিহ্যমণ্ডিত কৃষ্টি, কালচার ও সভ্যতা। পশ্চিমা আগ্রাসী সভ্যতার থাবায় মুসলমানরা যেন বন্দী হয়ে পড়েছে! পশ্চিমা সেই তাগুতী সভ্যতাকে কাটিয়ে নিজেদের হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে বিশ্ববরেণ্য ইসলামী দা'ঈ সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ) তুলে নিলেন তাঁর কলম। লিখে চললেন অবিরাম। তাঁর লেখনী থেমে থাকেনি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। বিশ্বে মুসলিম জাতিকে তিনি দিয়েছেন যুগোপযোগী এক বিস্ময়কর দিক নির্দেশনা। তার-ই একটি ফসল এ গ্রন্থটি।

১৯৭০ খ্রী. মূল কিতাবটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)-রচিত প্রায় সকল কিতাব প্রকাশের এক মহা গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে অতি সন্তর্পণে, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে। "মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব" তারই একটি গ্রন্থ। পরবর্তীতে প্রকাশের অপেক্ষায় "কারওয়ানে জিন্দেগী", "খুতবাতে আলী মিয়া", "ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার", "হযরত আলী (রা)-এর জীবন ও খিলাফত", "সীরাতে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ)", "হযরত আব্দুল কাদির রায়পুরী (রহ)," "সীরাতে সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)-এর জীবন ও কর্ম", "কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি", "তাবলীগ ও দ্বীনী দাওয়াত", "আমার আব্বা" ইত্যাদি আরো বেশ কিছু কিতাব।

এ কিতাবটির অনুবাদক হযরত সাইয়্যিদ আবুল হাসান নদভী (রহ)-এর বিশিষ্ট খাদেম ও খলিফা যথেষ্ট সময় দিয়ে ও মেহনত করে এ দুর্লভ কাজটি নিষ্ঠার সাথে সুসম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে যাযা, খায়ের ও বরকত দান করুন! এই কিতাবটি সর্বশেষ সংশোধন ও পরিমার্জনায় দায়িত্বের ভার নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন জনাব আজিজুল ইসলাম সাহেব। জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব কম্পোজে সুনিপুণ স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর দক্ষতা দিয়ে। তাঁকেও আল্লাহ পাক যাযা দান করুন! এ ছাড়া এ বই প্রকাশে যাঁরা আন্তরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও দু'আ করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

মানুষ মাত্রই ভুল করে। যতদিন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ) জীবিত ছিলেন, ততদিন শায়খের কিতাবের প্রুফ সংশোধন ও সম্পাদনাসহ পরিমার্জনায় এ ভুল-ত্রুটি সংশোধনের গুরু দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিলো। আজ তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বেহেশ্তে উত্তম জায়গা দান করুন, এই দু'আ-ই করি। সহৃদয় পাঠক মহলের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন, যদি কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় এবং তা যদি তিনি আমাদের অনুগ্রহ করে জানান, তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের নেক মকসুদ কবুল করুন। আমীন!

তারিখ : ১২-০৭-২০১২ ইং, ঢাকা। **মুহম্মদ আবদুর রউফ**

অনুবাদকের আরজ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين - اما بعد -

আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাজার কোটি শোকর আদায় করছি। এ মুহূর্তে অধমের কল্‌ব, কলম, দিল ও দেমাগ, অস্থি-মজ্জা আল্লাহ্‌র দরবারে সেজদাবনত যে, তিনি তাঁর এ অধম বান্দাকে দীনের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। বর্তমান যমানায় দীনের কাজ করতে পারা বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আমার মুরশিদ ও মাখদূম হযরত আল্লামা সায়েয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ) ও তাঁর গ্রন্থসমূহকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বর্তমান বিশ্বে সকল স্তরের দীন দরদী ও দীনহিতৈষী মুসলমানগণ তাঁর গ্রন্থসমূহ হতে ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে। ফলে তাঁর গ্রন্থগুলো সর্বজনসমাদৃত হয়ে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ের আলো ও চোখের জ্যোতি হয়ে স্বমহিমায় চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে। বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহ প্রত্যহ তা হতে আলোর মশাল ও পথের দিশা খুঁজে পাচ্ছে, যেন তা প্রত্যহ হীরার জ্যোতি "সিরাজাম মুনীরা"-এর ভূমিকা পালন করছে। হযরতের গ্রন্থসমূহকে বাংলা ভাষী পাঠকবৃন্দের কাছে পৌঁছে দেয়ার মৌলিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন বাংলার যমীনে হযরতের প্রধান খলিফা আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হযরত মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ)। হযরত যখন মাওলানাকে "মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?"-এর তরজমা করার দায়িত্ব দেন তখন এ অধমের দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছিলেন: ان سے کام لینا -এর দিয়ে কাজ নেবেন। হয়ত হযরতের তাওয়াজুহ-এর ফলে "মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?"-এর সম্পূরক গ্রন্থ "মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব" গ্রন্থটি অনুবাদ করার তৌফিক দান করেছেন।

এ গ্রন্থটিতে মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন প্রাণকেন্দ্র তুরস্ক হতে মিশর ও আরব বিশ্ব, তিউনিসিয়া হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত, কামাল আতাতুর্ক, জামাল আবদুন নাসের, কর্নেল গাদ্দাফী ও স্যার সৈয়দ আহমদ থেকে শুরু করে ইখওয়ানুল মুসলিমীন, জামাআতে ইসলামী ও ইমাম খোমেনীর ইরানী বিপ্লব পর্যন্ত সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকের

কর্মপন্থা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও সংশয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ঐ সকল দেশ, সংগঠনের সংকট চিহ্নিত করে তা মুকাবিলা করার ইসলাম ও বাস্তবসম্মত দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ঐ সকল দিক নির্দেশনাগুলোর বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে মুসলিম বিশ্বে যে রাজনৈতিক সংকট, মানসিক সংকট ও অস্থিরতা বিরাজ করছে গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠক তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

হযরত (রহ) বক্ষমান গ্রন্থে মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে যে আশা ও আশংকা ব্যাক্ত করেছিলেন বর্থমানে তার প্রতিফলন ঘটেছে। তুরস্ক ও মিশরে ইতিমধ্যে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিউনিসিয়া, ইরাক ও লিবিয়াতে ইসলামী ভাবাপন্ন সরকার গঠন হয়েছে। ইয়ামান ও সিরিয়াতে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে।

পরিশেষে পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য আরজ করতে চাই যে, ইতিপূর্বে গ্রন্থটির দু'টি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তাতে অসংখ্য ত্রুটি থাকার কারণে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ) গ্রন্থটির আরেকটি অনুবাদের কথা প্রায় বলতেন। আর মাওলানা লিয়াকত আলী সাহেব, শিক্ষা সচিব, মাদরাসা দারুর রাশাদ, আমাকে এর অনুবাদের তাকীদ করতেন। মুহাম্মদ ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেবও এ ব্যাপারে যথেষ্ট খোঁজ-খবর নিতেন। হয়ত তাঁদের তাগাদার কারণে অনুবাদ কাজটি সম্পাদন করা দ্রুত সম্ভব হলো। অনুবাদের কাজে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জন সহযোগিতা করেছেন এবং পূর্ব অনুবাদ গ্রন্থ হতেও যথেষ্ট সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁদের সকলকে উত্তম বদলা দান করুন। (আমীন) ! আল্লাহ্পাকের দরবারে দু'আ ও মুনাজাত করি যেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন এবং আমাদের খেদমতকে কবুল করে সর্বোত্তম বদলা যেন দান করেন! আমীন!

বিনীত

তারিখ : ২৯-০২-২০১২ খ্রী. ঢাকা।

আবূ তুরাব জুলফিক্বার আলী নদভী
মাদরাসাতুল হুদা, ঢাকা।

বিষয়সূচী

তৃতীয় সংস্করণের কথা

আল্-হামদুলিল্লাহ্! গ্রন্থকারের বই "মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব"-এর তৃতীয় সংস্করণ ছাপানোর সুযোগ এসেছে। প্রত্যেক গ্রন্থকারের ন্যায় আমিও (গ্রন্থকার) এ গ্রন্থটির প্রচার-প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতায় স্বাভাবিকভাবে অতিশয় আনন্দিত ও আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ। সকল গ্রন্থকারই কবিদের (যার প্রতিটি গযল, ছন্দ ও চরণ অতি প্রিয়) তার প্রতিটি রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হয় কিন্তু নির্দ্বিধায় বলতে হয় যে, আমার দৃষ্টিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ, চেতনা সৃষ্টিকারী ও আকর্ষণীয় গ্রন্থ। কারণ এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ে রচিত। প্রথম সংস্করণের অবতরণিকায় উল্লেখ করা হয়েছে :

"আমার নিকট বর্তমানে এটি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের জন্য সবচেয়ে বড় ও প্রকৃত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তরে যে, পশ্চিমা সভ্যতার বিষয়ে এসব রাষ্ট্র কী পদক্ষেপ অবলম্বন করেছে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা চয়ন-গ্রহণে ও সমাজের সংকীর্ণ দাবী নিয়ন্ত্রণে কী পন্থা গ্রহণ করেছে এবং এ বিষয়ে মেধা-প্রতিভা কতটুকু সফল হয়েছে? এ কথার অর্থ দুনিয়ার চালচিত্রে উক্ত সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য কী স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এ সব দেশে ইসলামের ভবিষ্যত কী?"

আমার অন্য রচনাবলীর ন্যায় সেগুলোর কোন কোনটি দশের অধিক সংস্করণ ছাপা হয়েছে। এত দিনে এ গ্রন্থের তিনের অধিক সংস্করণ ছাপানো হতো কিন্তু আমার রচনাবলীর মধ্যে এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হলো, এটির প্রতিটি সংস্করণ ছাপানোর সময় সংশোধন ও উক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে সব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার সমীক্ষা সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ এসব রাষ্ট্র সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে এবং এদের উন্নতি-অগ্রগতি ও সংস্কারও অব্যাহত রয়েছে। নতুন পদক্ষেপ, চেষ্টা-তদবীর, শক্তিশালী চিন্তা-চেতনা, রাজনৈতিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি কাজ করে যাচ্ছে। আমার একের পর এক ব্যস্ততা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত পরিবর্তন ও সংস্করণসমূহের চিত্র সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। এরই মধ্যে মিশর, লিবিয়া, ইয়ামেন, আলজিরিয়া ও আফগানিস্তানে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। পাকিস্তান ও ইরানেও মৌলিক সংস্কার, পরিবর্তন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে।

সুতরাং এসব পরিবর্তনের আলোচনা এড়িয়ে গ্রন্থের পুনঃমুদ্রণ হলে এটাকে সচেতন পাঠক এ বিষয়ে শূন্যতা উপলব্ধি করে থাকবেন। আমি উক্ত সংস্কার, আন্দোলন-সংগ্রাম ইত্যাদির যথাযথ ও বাস্তবধর্মী সমীক্ষা পরিচালনার অপেক্ষায় ছিলাম। সেজন্য নতুন সংস্করণ ছাপাতে অনেকটা বিলম্ব হয়ে গেল। যা হোক, অতি মাত্রায় ব্যস্ততার কারণে এ দায়িত্ব আমার ঐ সব বন্ধুর ওপর অর্পণ করি যাঁরা এর সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট এবং যাঁদের জ্ঞান-গরিমা ও তথ্য সদাসমৃদ্ধ। তাঁরা উক্ত দায়িত্বশীল ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে নোট ও তথ্য সংগ্রহ করেন।

সে সব তথ্য আমি পাঠ করি এবং সে সবের সহযোগিতায় গ্রন্থটি রচনা করি। আমার এ কাজে তিনজন সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা হলেন স্নেহের ভাতিজা আল-বা'ছুল ইসলামী আরবী পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসানী[১], স্নেহের ভাগিনা সাইয়িদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী ও মৌলবী সাইয়িদ ওয়াজিহ হাসানী নদভী (আর রাইদ আরবী পত্রিকার সম্পাদক)। উক্ত লেখকগণের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ এবং তাঁদের প্রতি দু'আ রইলো। তবে আমি নিশ্চিত যে, উক্ত রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে এ গ্রন্থটি সর্বশেষ (বর্তমান পর্যন্ত) তথ্যে সমৃদ্ধ ولعل الله يحدث بعد ذالك امرا। ইতোমধ্যে এ গ্রন্থের আরবী ও ইংরেজী কয়েকটি সংস্করণ বের হয়েছে। আশা করি গ্রন্থটি বর্তমানে তদ্রূপ আগ্রহের সাথে পঠিত হবে যেমন শুরুতে হয়েছিল এবং যে উদ্দেশে রচিত হয়েছে তা পূর্ণ ফলপ্রসূ হবে।

৬ সফর ১৪০১ হিজরী
১৫ ডিসেম্বর ১৯৮০ খ্রী.

আবুল হাসান আলী নদভী
দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা,
লাখনৌ, ভারত।

১. পরিতাপের বিষয়, গত ১৪ জুন ১৯৭৯ খ্রী. নবীন প্রতিভা ৪৪ বছর বয়সে মাত্র কয়েক ঘণ্টার অসুস্থতায় পরকালের ডাকে সাড়া দেয়। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিন!

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله

আমি (গ্রন্থকার) আল্লাহ্র প্রশংসায় সদা তৎপর। কারণ "মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব" গ্রন্থে বিশেষ ও প্রয়োজনীয় সংযুক্তসহ এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপানোর সুযোগ হয়েছে। গ্রন্থটি মুসলিম সাম্রাজ্যে ইসলামী ও পাশ্চাত্যে চিন্তা-চেতনার মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নামে সর্বপ্রথম ১৯৬৫ খ্রী. বৈরুতের দারুল ফীকর থেকে ছাপা হয়। পরে ১৯৬৮ খ্রী. কুয়েতের আদ-দুরুল কুয়েতীয়া থেকে দ্বিতীয়বার ছাপা হয় যার বর্তমান নাম দারুল কলম। দারুল কলম অচিরেই এর তৃতীয় সংস্করণ ছাপাতে যাচ্ছে। ছাপার সমস্যা, প্রচার-প্রসারের দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে (অবশ্য আমার রচনাবলীর ক্ষেত্রে) আরবী থেকে উর্দু অনেক পেছনে থাকে। তা না হলে ইতোমধ্যে উর্দুর কয়েকটি সংস্করণ ছাপা হয়ে যেতো।

আরবী সংস্করণে যা সংযুক্ত হয়েছে তা আরও কতিপয় সংযুক্তিসহ নতুন উর্দু সংস্করণে ছাপানো হবে। তাই এ সংস্করণ প্রথম উর্দু সংস্করণের তুলনায় (যা ১৯৬৪ খ্রী. ছাপানো হয়েছিল) অধিক উপকারী ও সর্বশেষ তথ্যসমৃদ্ধ। বইয়ের শেষে "শেষ কথা" নামে একটি শিরোনাম সংযুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে বইয়ের সম্পূর্ণ সারসংক্ষেপ ও রূহ তুলে ধরা হয়েছে। ইতিমধ্যে এর ইংরেজী সংস্করণ Western Civilization: Islam & Muslim শিরোনামে ছাপা হয়েছে।

ইংরেজী উচ্চ শিক্ষিত সমাজ ও পরিবেশে তা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পঠিত ও সমাদৃত হয়েছে। গভীর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষিগণের অভিমত: চিন্তা-চেতনা, গবেষণা ও মুসলমানদের মাঝে আত্মসচেতনাবোধ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ধারাবাহিতায় আরবীতে ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ও উর্দুতে 'ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানুকা[১] উরুজ ওয়া ছাওয়াল কা আছর'-এ করা হয়েছিল আর এ গ্রন্থটির মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

তদ্রূপ ওটা এ ধারায় প্রথম এবং এটি ওটির দ্বিতীয় মেরুদণ্ড। প্রথম গ্রন্থের সমাপ্তি ইকবালের এ চরণ দ্বারা করা হয়েছে :

معمار حرم باز به تعمير جهان خيز

১. বাংলা অনুবাদ "মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল" মুহম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

আর এখন আলোচ্য গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্বকে নবীন সাজে সজ্জিত করতে কী কী ঘটনা ও বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কোন্ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। আর এ কাজ স্বদেশে হেরম শরীফের পাদদেশে কতটুকু প্রয়োজন ও কত কঠিন! যদি হেরেমবাসী এ কাজের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কিছুটা অনুভব করে তবে আমার আকাঙ্ক্ষা ও শ্রম সার্থক হবে।

یک حرف کاشکے است کہ صد جانو شتہ ایم

২৪ জুন, ১৯৭০ খ্রী.।

আবুল হাসান আলী নদভী
দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ্
লাখনৌ, রায়বেরেলী, ভারত

অবতরণিকা

বর্তমানে প্রায় সমস্ত মুসিলম রাষ্ট্রে একটি মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। একে আমরা ইসলাম ও পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। এসব দেশের প্রাচীন ইতিহাস, মুসলমান সম্প্রদায়ের ইসলামের সাথে গভীর সম্পর্ক ও ভালবাসা রয়েছে। এ নামে স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত ছিল এবং অবশেষে বিজয় অর্জিত হয়েছে, এ শক্তির সহায়তায় এসব দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়েছে। এদের সকলের ঐক্যবদ্ধ দাবী হলো এখানে কেবল ইসলামী চিন্তা-চেতনা উজ্জীবিত থাকবে এবং এখানে ঐ জাতীয় জীবনাদর্শের অনুসরণই একমাত্র বৈধতা রাখে যার প্রতি ইসলাম আহ্বান জানিয়েছিল।

কিন্তু এর বিপরীতে যাদের হাতে বর্তমানে এসব রাষ্ট্রের পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে তাদের মন-মানসিকতা, শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির প্রধান দাবী ছিলো এসব রাষ্ট্রে পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ আমদানী করা হোক এবং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের পদাংক অনুসরণ করে ইসলাম পরিচালনা হোক! আর এক্ষেত্রে যে সব ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, জীবন বিধান, আইন-কানুন ও ঐতিহ্য এ উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক সেসবের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হোক! এক কথায় দেশ ও সমাজের উন্নতিতে দৃঢ় সংকল্পের সাথে ও অত্যন্ত ধীর গতিতে সব কিছু পশ্চিমাদের ছাঁচে ঢেলে সাজানো হোক!

এ নীতি অনুসরণ করে কোন কোন রাষ্ট্রে কতিপয় পদক্ষেপ নিয়ে এক্ষেত্রে অনেকে সফলতার মুখ দেখেছে বা সফলতার কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। আর কিছু রাষ্ট্র সেদিকে দৌড়াচ্ছিল কিন্তু তাদের অবস্থা ও নিদর্শন ঐরূপ দেখা দিয়েছিল:

'দিল তো গন্তেব্যে পৌছে গেছে। দেহ সকালে যাক বা বিকালে।'

আমার দৃষ্টিতে বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সবচেয়ে বড় ও প্রকৃত সমস্যা এটি। এটি কাল্পনিক বা ধারণাপ্রসূত নয়। তাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব-প্রতিপত্তি, দাপট, (যার দৃষ্টান্ত মানব সভ্যতার ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়) ঐ সকল দেশের বস্তুবাদী ও রাজনৈতিক শক্তির উত্থান গোটা মুসলিম বিশ্বের সম্মুখে এ বিষয়টিকে একটি প্রশ্নবোধক ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং এর জবাব প্রত্যেককে কড়ায়-গণ্ডায় দিতে হবে। এ সিগন্যাল ব্যতীত কোন দেশের গাড়ী সম্মুখে এক চুল পরিমাণও অগ্রসর হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার

ব্যাপারে এসব দেশ কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, তাদের সমাজকে বর্তমান ও আধুনিক জীবন-জীবিকার সাথে খাপ-খাওয়াতে, সমকালীন কঠিন সমস্যার তাকিদে মুক্তির জন্য কী পন্থা অবলম্বন করেছে এবং এ বিষয়ে কতটুকু বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে? এ সব প্রশ্নের উত্তরে একথা আসে যে, বিশ্বের বুকে এসব সম্প্রদায়ের অবস্থা কি দাঁড়াবে এবং এ দেশসমূহে ইসলামের ভবিষ্যত কি এবং তারা বর্তমানে ইসলামের চিরন্তন ও সার্বজনীন বার্তা নিয়ে কতটুকু সফল হয়েছে?

এ বিষয়ে দীর্ঘ দিন যাবত তীব্রভাবে অনুভূত হয় যে, বিষয়টি তথ্য, বাস্তবতা ও ইতিহাসের আলোকে তা সমীক্ষা করা হোক! এক্ষেত্রে যতটুকু কাজ হয়েছে নিরপেক্ষ, বাস্তবধর্মী, নিরপেক্ষ তদন্ত-অনুসন্ধান ও সমীক্ষা চালানো হোক। তৎসহ এও বলা হোক যে, ইসলামী ও মুসলিম সমাজের জন্য (এজন্য কেবল ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও জীবন বিধান অবলম্বন শুধু নয় বরং এ লক্ষ্যে দাওয়াত প্রদানে বিশ্ব নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন ও বিশ্বের মহাসাবা করা অতি জরুরী, উন্নতি করতে এবং জীবনের দ্রুত গতিসম্পন্ন কাফেলার সাথে অগ্রসর হতে সঠিক, উপযুক্ত ও মাধ্যম পন্থা কোন্‌টি? বর্তমানে সকল মুসলিম রাষ্ট্র, বিশেষ করে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ইসলামী দেশগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরামর্শ প্রদান। এ বিষয়ে যদি চুল পরিমাণ ভুল-ত্রুটি এবং অসম নীতি ও পন্থা অবলম্বন করা হয় তবে তারা কোথা থেকে কোথায় চলে যাবে তার কোন হদিস থাকবে না। যেমন : কবি বলেন–

یک لحظہ غافل بو دم ،ھد سالہ راھم دور شد -

'যদি ক্ষণিকের তরে উদাসীন হও শত বছরের ব্যবধানে নিক্ষিপ্ত হবে।'

আমি এ চিন্তা-চেতনাকে সম্মুখে রেখে বিগত বছরসমূহে আরবীতে একটি প্রবন্ধ রচনার কাজ শুরু করেছিলাম। পরে অতি দ্রুত তা বইয়ের আকৃতি ধারণ করে। উক্ত বইটি ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ ইং 'পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের অবস্থান' শিরোনামে ছাপানো হয় এবং আরব রাষ্ট্রসমূহে, বিশেষ করে শিক্ষিত ও ধার্মিক মহলে তা গভীর আগ্রহের সাথে পঠিত হয়। কোন কোন লেখক এ গ্রন্থকারকে (আমাকে) সরাসরি পত্র লিখে উৎসাহিত করেন। অবশেষে আমার ইচ্ছা ও ইঙ্গিতে আল-বা'ছুল ইসলামী-এর সম্পাদক স্নেহের মৌলবী মুহাম্মাদ হাসানী [আল্লাহ্ তাকে লেখালেখিতে বিশেষ যোগ্যতা দিয়েছেন এবং আমার (লেখকের) সাথে রচনা ও চিন্তার ক্ষেত্রে তার বিশেষ সম্পর্ক ও মিল রয়েছে] উর্দুতে এর অনুবাদ করেন। আমি যখন তা সংশোধন করতে শুরু করি তখন কিছু

স্থানে সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই ইতিমধ্যে এ বিষয়ে কিছু নতুন নতুন বিষয় সম্মুখে আসে এবং কিছু নতুন তথ্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তাই বিভিন্ন স্থানে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। এর ফলে অনুবাদের পর বইটি আরও শত গুণ সুন্দর হয় এবং গবেষণার মান ও উপকারিতা বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে আমি ইউরোপ ভ্রমণে যাই। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তার লালন ভূমি ও কেন্দ্রে দেখার সুযোগ হয়। তাই গ্রন্থের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক মতামত সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া সফরে আরও নতুন বই-পত্র পেয়ে তা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হই। অবশেষে যাবতীয় সংযোজন ও পরিমাপের পর বইটি "মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব" শিরোনামে ছাপানো হয়েছে। যেভাবে এর আরবী সংস্করণ আরব দেশসমূহে আগ্রহের সাথে পঠিত হয়েছে সেভাবে ঐসব স্থানে যেখানে উর্দু ভাষা চালু আছে সেখানেও আগ্রহের সাথে পড়া হবে। ইনশাআল্লাহ্ এর ইংরেজী সংস্করণও ছাপানো হবে।

আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করি তিনি যেন ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দ ও কর্তাব্যক্তিদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভালভাবে বোঝবার তাওফীক দেন এবং তারা যেন এ বিষয়ে সঠিক পথে চলেন। পরিশেষে ড. মুহাম্মাদ আসিফ কুদওয়ায়ী ও হাকীম আবদুল কবী-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে অতি জরুরী বলে মনে করছি। কারণ তাঁদের গ্রন্থ থেকে গৃহীত দীর্ঘ উদ্ধৃতি বইটির মান বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

২৪ অক্টোবর, ১৯৬৩ খ্রী.।

আবুল হাসান আলী নদভী
১০, কুইন্সওয়ে, লন্ডন

মুসলিম বিশ্বে
ইসলাম ও পশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে কোন কোন দেশের বিরুদ্ধাচরণ অথবা নিরপেক্ষতা অবলম্বন

মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার কবলে

খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইসলামী বিশ্বকে একটি সংকটপূর্ণ, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয় সম্পর্কে তাদের সঠিক কর্মপন্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করত একটি স্থায়ী ও স্বাধীন দুনিয়া হিসেবে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব।

এটা ছিল কর্মক্ষম জীবন ও প্রফুল্লতা, সাহসিকতা ও সংকল্প এবং উন্নতি ও সম্প্রসারণ ক্ষমতায় পরিপূর্ণ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষয়। কারণ এটাকে মানব ইতিহাসের অধিক শক্তিশালী ও অতি বিস্তৃত সভ্যতার মধ্যে গণ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে (যদি গভীরভাবে দেখা যায়) তা ছিল ঐ সমস্ত প্রভাব ও কার্যক্রমের স্বভাবগত ফলাফল যা বহুদিন হতে ইতিহাসে কাজ করছিল এবং যথাসময়ে এই নতুন আকারে প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল।

মসলিম বিশ্ব অধিকভাবে এ বিপদের সম্মুখীন ছিল। কেননা জীবনের কারখানা হতে যখন সমস্ত পুরানো ধর্ম বাদ পড়ে যায় তখন কেবল ইসলামই দীনী ও উত্তম আচার-ব্যবহারের দাওয়াতের বাহক এবং মানব সমাজে জীবন যাপনের একমাত্র রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে অবশিষ্ট রয়ে যায়। অনেক বিশাল বিস্তৃত উর্বর দেশ এই ইসলামী বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই এই যান্ত্রিক সভ্যতার চ্যালেঞ্জ অন্য কোন জাতির ও জীবন পদ্ধতির তুলনায় মুসলিম বিশ্বের দিকে অধিক পরিমাণে ধেয়ে এসেছে।

মিশ্র সভ্যতা

এই সভ্যতা নিজ প্রশস্ত গণ্ডিতে শামিল করেছিল অনেক কিছু : আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, তত্ত্বীয় বিধি-বিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও নির্মাণশিল্প সংক্রান্ত আশ্চর্যজনক ও অভিনব জ্ঞান-বিজ্ঞান যা পাশ্চাত্য জাতির উন্নতির দীর্ঘ ভ্রমণের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। এই সভ্যতা সাধারণত মানবিক জ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞান, কারিগরি ও গণিতশাস্ত্রের উন্নতির অবশ্যম্ভাবী সফলতা অর্জন করেছিল। এটি বিজ্ঞ ও দক্ষ

পদার্থবিদদের ধারাবাহিক চেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষারও নির্যাস ছিল। এ হিসেবে ওটা বিভিন্ন অংশ ও উপাদানের এমন একটি মিশ্রণ ছিল যার সম্পর্কে একই ধরনের নির্দিষ্ট কোন মত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এই মিশ্র সভ্যতা এক পর্যায়ে অসম্পূর্ণ ও আরেক পর্যায়ে সম্পূর্ণ ছিল। অপকারীও ছিল, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উপকারী ও যথার্থও ছিল। কোন ক্ষেত্রে সঠিক ছিল, আবার কোন ক্ষেত্রে ক্রুটিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে ঐ সমস্ত প্রকাশ্য ও সন্দেহাতীত জ্ঞানের সঙ্গে এমন ক্রুটিপূর্ণ অনুমান, কল্পনা ও চিন্তা এবং তাদের ধারণা মতে এমন সিদ্ধান্তও অন্তর্ভুক্ত ছিল যার মধ্যে বাদানুবাদ, গভীর চিন্তা ও বিবেচনার স্থান রয়েছে। তার মধ্যে এমন জ্ঞানের ফলাফলও ছিল যা গভীর চিন্তা ও বিবেচনা এবং ধ্যান ও অভিজ্ঞতার সারভাগ ছিল। আর এমন কিছু ছিল যার সম্পর্কে কিছু বলা সময়ের পূর্বে কথা বলা হতো। আর এমন অংশ ও উপাদানও ছিল যা কোন বিশেষ দেশ ও জাতির জন্যে নির্দিষ্ট নয়। যেমন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। আর এমন জিনিসও ছিল যাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থানীয় প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল এবং পাশ্চাত্য পরিবেশ ও সামাজিকতার গভীর ছাপও তাদের ওপর পড়েছিল। ওটা সেই ঐতিহাসিক বিপ্লব ও ঘটনাসমূহের ফল ছিল যা পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে নিজ কাজের সীমা ও কেন্দ্রের মধ্যে অতিক্রম করতে হয়েছিল। আবার এমন জিনিসও ছিল যার দীন ও আকীদার সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। আর এমন অংশও ছিল যার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্কই ছিল না।

সভ্যতার এই মিশ্রণ এই বিষয়টিকে অধিক কঠিন করে দিয়েছে এবং এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে। মুসলিম বিশ্বকে এক সংকটপূর্ণ ও কঠিন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে এবং মুসলিম বিশ্বের নেতা ও চিন্তাবিদদের বুদ্ধিমত্তার জন্যে এটা একটি পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছে।

নেতিবাচক ব্যবস্থা

এই নতুন ও কঠিন অবস্থা হতে বাঁচার জন্যে তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে : প্রথম ব্যবস্থা হলো বিরুদ্ধাচরণ করা অর্থাৎ মুসলিম বিশ্ব এই সভ্যতার সমস্ত ফলাফল ও উপকারিতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করবে। তার কোন ভাল বা মন্দ কথা শুনতে ইচ্ছুক হবে না। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে ঐ সভ্যতা হতে একদিকে সরে পড়া এবং তা হতে কোন ফল ভোগ না করা, এমন কি ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখা, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা পাশ্চাত্য জাতি শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র,

কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি পাশ্চাত্য জাতি হতে অর্জন করা নিষিদ্ধ মনে করা এবং নতুন যন্ত্রপাতি, মেশিন, আসবাবপত্র ও জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসকে গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা।

এই নীতির প্রকৃতি ও শরীয়ত অনুযায়ী এর হুকুম ও ফলাফল

এই নীতি বা ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাভাবিক পরিণতি হলো বিশ্ব হতে মুসলিম বিশ্বের পেছনে পড়ে থাকা এবং জীবনের দ্রুতগামী যাত্রীদল হতে বিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে মুসলিম বিশ্ব অন্যদের হতে ছিন্ন হয়ে যাবে। মুসলিম বিশ্ব সীমাবদ্ধ একটি দ্বীপে পরিণত হবে যার চতুষ্পার্শ্বস্থ দুনিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সমুদ্রে এরূপ অনেক দ্বীপ হওয়া সম্ভব। কিন্তু স্থলভাগে এ ধরনের দ্বীপের কোন স্থান নেই। মানুষের প্রকৃতির সাথে (যা নিজের পরিবেশ দ্বারা অল্প বিস্তর প্রভাবান্বিত ও উপকৃত হয়) যুদ্ধ করা হলে তা কোন সময় কৃতকার্য হয় না।

এ সমস্ত বাস্তবতা ছাড়াও এ নীতি ব্যবস্থা সংকীর্ণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ দ্বারা সৃষ্টিগত শক্তিসমূহকে অকেজো করে দেয়া হবে। এটা এই স্বাভাবিক দীনের সঠিক ব্যাখ্যা ও বর্ণনাও নয়। কারণ তা জগতে জ্ঞান ও দূরদর্শিতাকে ব্যবহার করার প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছে এবং লাভজনক জ্ঞানসমূহ হতে উপকৃত হওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। বরং তা দীনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নিজের অনুগতদেরকে যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দিয়েছে।

কুরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ـ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আকাশ ও জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত্রি-দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহর পরিচয়ের যথেষ্ট) নিদর্শন রয়েছে। সেই সকল জ্ঞানীর জন্যে যারা কখনো আল্লাহবিমুখ নয়, বরং দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে। আর তাদের বৈশিষ্ট্য হলো আকাশ ও জমিনের

সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (চিন্তার ফল এই যে, আল্লাহর পরিচয়ের দরজা খুলে যায় এবং বলে ওঠে) হে আল্লাহ! এই সমস্ত যা তুমি সৃষ্টি করেছ তা নিঃসন্দেহে অকেজো ও অনর্থক নয়। নিশ্চয় তোমার সত্তা হতে কোন অনর্থক কাজ বের হয় না এবং তা হতে তোমার সত্তা পবিত্র। হে আল্লাহ! আমাদেরকে পরকালে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর। [সূরা আলে ইমরান, ১৯০-১৯১]

অন্য জায়গায় আছে :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ .

[সূরা বাকারা : ৩০]।

হে মুসলমান, যথাসাধ্য শক্তি তৈয়ার কর এবং ঘোড়া প্রস্তুত রাখ, শত্রুদের মুকাবিলার জন্য সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ার কর যাতে আল্লাহ ও নিজের শত্রুদের ওপর ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়। [সূরা আনফাল - ৫০]

اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا ۔

অর্থাৎ জ্ঞানের কথা মুমিনের হারানো ধন, সে যেখানেই পাবে সেখান থেকে তা নেয়ার তার অধিকার আছে। [তিরমিযী, বাবুল ইলম]

ইসলাম মানব জাতিকে এই জগতে আল্লাহ তা'আলার খলীফা বলে ঘোষণা করেছে। তার জন্য পানি, স্থল, চন্দ্র, সূর্য ও রাতদিনকে আল্লাহ তা'আলা অনুগত করে দিয়েছেন। মানুষ মুখে বা অবস্থা দ্বারা যেই প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশ করেছে তাই তাকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের প্রতি এই উপকারের কথা বলেছেন যে, বান্দাদের জন্য এমন লৌহ সৃষ্টি করেছেন যা খুবই শক্ত এবং মানুষের বহু প্রয়োজনীয় কাজে তা ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের দিকে মনোযোগ দেয়া সম্পর্কে মুসলমানদের জন্য হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।

আহযাবের যুদ্ধে ইরানীদের নিয়মে তিনি নিজেই পরিখা খনন করেছেন। পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর ইসলামী শাস্ত্রে জ্ঞানী ও মুসলিম আইন অভিজ্ঞগণ এই নমুনার ওপর কাজ করতে থাকেন, তারা এই সব ব্যাপারে কালের সাথে তাল মিলিয়ে চলতেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবহার এবং নিজে স্থায়ী ও উপকারী জ্ঞান অর্জনের জন্য অন্য জাতির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতেন। কেবল তাই নয়, বরং অন্য জাতি হতে অগ্রগামী হয়ে যেতেন।

আবার কোন কোন সময় তারা এই মাঠে শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের আদর্শ স্থাপন করতেন।

যদি দুনিয়ার কোন দেশ চক্ষু, কর্ণ বেঁধে নতুন সভ্যতার শক্তিশালী মুকাবিলাকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে অথবা তাকে একেবারে বাদ দিয়ে সুখের নিদ্রা যেতে চায় আর নিজের সীমাবদ্ধ দুনিয়া হতে কোন প্রকারেই বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত না থাকে সেই দেশকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সম্মুখীন হতে হবে। তার বিভিন্ন স্থানে অবাধ্যতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভীষণ আন্দোলন সৃষ্টি হয়ে যাবে। কাজেই এই নীতি মানব জাতির এ স্বভাবজাত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষ চায় সর্বদা সম্মুখের দিকে দেখতে ও প্রতিটি নতুন জিনিসের সন্ধান করতে। এ ছাড়া কোন সময়ই মানুষের তৃপ্তি আসে না। সম্মান, উচ্চ মর্যাদা, শক্তি ও নতুন নতুন জিনিসের আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই অবস্থিত। মানুষকে প্রতি মুহূর্তে এক নতুন পরিমণ্ডলের সন্ধানে ব্যস্ত থাকতে এবং নতুন উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করতে দেখা যায়। মানুষের মধ্যে এমন একটি বাসনা রয়েছে যা কোন দিনও পরিশ্রান্ত হয় না, আর এমন একটি আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে যা কোনদিন পরিতৃপ্ত হয় না।

তাছাড়া এ নীতি সৃষ্টির রীতি এবং এই জগতের স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি কোন দেশ এই প্রকৃতিবিরোধী নীতিকে জোরপূর্বক গ্রহণ করতে চায়, তাহলে এই সভ্যতা তাদের ঘরে ও পরিবারবর্গের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করবে, যেভাবে বন্যায় বেষ্টিত কোন গ্রাম অথবা শহরের মধ্যে কোন সংবাদ ও যোগাযোগ ছাড়া পানি প্রবেশ করে এবং চতুর্দিক হতে ঐ গ্রাম বা শহর পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়।

বিচ্ছিন্নতা ও বিমুখিতার পরিণতি

মুসলিম বিশ্বের কোন দেশ যদিও বা (নিজের জীবনের কোন সময়ের আবর্তনে) নতুন সভ্যতা হতে দূরে রয়েছে, তাদের ঐ সভ্যতার ভাল-মন্দ কোনটির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেনি এবং এই নতুন সভ্যতার উপকারী জ্ঞান ও উপকরণ হতে হাত গুটিয়ে নিজের সীমাবদ্ধ দুনিয়াতে অবরুদ্ধ রয়েছে। তবুও এটা নিশ্চিত যে, এ বিরতি বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে না। এই সভ্যতা ও সামাজিকতার ঢেউ অন্তরের অন্তস্তলে ও জীবন যাপনের মূলে অনুপ্রবেশ করে যায়। আর প্রচলিত সমস্ত আচার-ব্যবহার সমূলে নিজের সাথে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং তা সর্বদা তার দ্বারে আঘাত করতে থাকে এবং তার শান্তি ও আরামের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে থাকে।

সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব, হৃদয়জয়ী শক্তি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন তারা এ কথাও জানেন যে, প্রাচ্যদেশসমূহ আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উভয় দিক থেকে অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছে এবং ঈমানী শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের অধঃপতন এসেছে। এ সকল শক্তি থাকলে তবেই এই সভ্যতার মুকাবিলা সফলতার সাথে করা সম্ভব হতো। তাদের এই ধারণা ঠিক যে, এই ধরনের মুসলিম দেশের রক্ষণশীল সভ্যতা, জীবন যাপন প্রণালী, সামাজিক ব্যবস্থা বেশি দিন স্থায়ী থাকতে পারে না। তাদের দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে না। আধ্যাত্মিক দুর্বলতার সাথে কোন জাতি বেশি দিন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না এবং এমন শক্তিশালী সভ্যতার মুকাবিলাও করতে পারে না। কারণ এই পাশ্চাত্য সভ্যতা তো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে!

বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ মোহাম্মদ আসাদ (যিনি ইউরোপে জীবন কাটিয়েছেন এবং ইসলামী দেশসমূহে দীর্ঘ দিন ভ্রমণ করেছেন) ১৯৩২ সালে শান্তিপূর্ণ দেশ আরব উপসাগরীয় দেশগুলো ভ্রমণ করেছিলেন। আরব তখনও নিজের পুরাতন আরবী ও ইসলামী ঐতিহ্য পালন করে যাচ্ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা তখনও এদেশে প্রবেশ করতে পারেনি এবং নতুন আবিষ্কারসমূহ এখনও বালুকাময় দেওয়ালের বেষ্টনী ভেদ করতে পারেনি। তিনি এই সমস্ত দেখে এই সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, এই বিচ্ছিন্নতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব হতে দূরে সরে থাকা কি বেশি দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারবে? তিনি নিম্নলিখিত উক্তি লিখেছিলেন :

গভীর চিন্তা ও বিবেচনার পর আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে যায়দ (যিনি আসাদ সাহেবের গাইড হিসেবে সফরসঙ্গী ছিলেন) এবং যায়দের সম্প্রদায় আরব নিজদেরকে এই বিপদ হতে আর কতদিন রক্ষা করতে পারবে যা হাজার কৌশল ও প্রতারণার মাধ্যমে তাদেরকে ঘেরাও করতে যাচ্ছে। কোন ভদ্রতা ও অনুগ্রহ ছাড়াই অতি সত্বর তা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবেই। আমরা এমন এক সময় জীবন যাপন করছি, যে সময় প্রাচ্য অগ্রগামী পাশ্চাত্যের মুকাবিলায় যা চতুর্দিক হতে প্রাচ্যকে কোণঠাসা করে রাখছে– নীরব ও নিরপেক্ষ শেখ হয়ে বসে থাকতে পারবে না। হাজার হাজার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংঘবদ্ধ শক্তি বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখে পরাজয় বরণ করে এর সাথে সংমিশ্রণের ফলে সভ্যতা-কৃষ্টি ও আচার-ব্যবহারেই শুধু হারাবে না, নিজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি ও সংযোগ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে?[১]

---

১. ROAD TO MECCA, P-103-104.

মোহাম্মদ আসাদ সাহেবের ধারণা ঠিকই হয়েছে। সত্যিই এ বিচ্ছিন্নতা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। অল্প দিনের মধ্যেই মুসলিম বিশ্বের এই পবিত্র কেন্দ্রে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছে। নতুন নতুন আবিষ্কৃত বস্তুসমূহ ও পাশ্চাত্য পণ্যদ্রব্য বন্যার স্রোতের মত আছড়িয়ে পড়ছে এবং বিলাসের সাজ-সরঞ্জাম ও নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা বাজার ও ঘর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে, জীবন যাপনের সরলতা, সহনশীলতা, পৌরুষ, অশ্বারোহণ, উচ্চ সাহস, উদ্দীপনা এই সমস্ত গুণ অন্তর্হিত হয়ে গেছে যা প্রাচীন কাল হতে আরবদের বিশেষত্ব ছিল।

উপসাগরীয় দেশসমূহের মাঝে আরব পাশ্চাত্যের এই নতুন সম্বন্ধ ও সংযোগ সামাজিকতা ও রাজনীতির মাধ্যমে কিছুটা এবং বেশির ভাগ পেট্রোলের মাধ্যমে হয়েছে। পরস্পরের এই আদান-প্রদান ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ বা উপকৃত (যার আরম্ভ সভ্যতা ও ব্যবসার ময়দানে হয়েছে) একেবারে দ্রুত ও বুদ্ধিমত্তাবিহীনভাবে হয়েছে। এর পেছনে কোন মূল্যবান চিন্তা অথবা কোন বোঝা-পড়া বা ভাল পরিকল্পনা ছিল না। ফলে পাশ্চাত্যের মুকাবিলায় পরাজয় বরণের যে ভয় আসাদ সাহেব করেছিলেন তা একটি প্রকৃত ঘটনা হয়ে সম্মুখে এসেছে এবং রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও বাহ্যিক আচার-আচরণে পরিবর্তনের পর আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ এই তুফানের কবলে পতিত হয়েছে।

এই পরিবর্তন ও বিপ্লব, আরবের শান্ত ও নীরব মরুভূমিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। পাশ্চাত্যের পণ্যদ্রব্য, যথা : আরাম-আয়েশের সাজ-সরঞ্জাম ও বিলাসের আসবাবপত্র তথায় প্রচুর এসেছে। ফলে জীবন যাপনের মান হঠাৎ উচ্চ হয়ে উঠেছে এবং শত শত বছরের সরল জীবন ও কার্যক্রম জটিল হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্যের অধিবাসী নিজেরাই বিষয়টি অনুভব করেছেন এবং এ ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন। আমেরিকার জনৈক গ্রন্থকার Don Peretz তাঁর The Middle East Today গ্রন্থে লিখেছেন : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হতে অনেক প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাব তেল দ্বারা অর্জিত সম্পদের (যার সঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রভাব ও অন্তর্ভুক্তি রয়েছে) কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। পুরাতন ও সাধারণ সভ্যতার উত্তরাধিকারিগণ যারা বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে ঐক্যবদ্ধভাবে রেখেছিলেন বর্তমানে তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কারণ রাজপরিবার ও উচ্চ পরিবারের লোকজন যারা তেলের সম্পদে ধনী হয়ে গিয়েছেন, তারা পাশ্চাত্য বিলাসদ্রব্যসমূহ, অভিনব বিলাস, রীতিনীতি বা আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য রুচি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে গিয়েছেন। এই পরিবর্তনের কারণে নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভীষণভাবে অশান্তি ও অসন্তুষ্টি সৃষ্টি

হয়েছে। কারণ তারা এভাবে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপনের শক্তি রাখে না। যথা : বেদুঈন পরিবার বর্তমানে পশু পালন ও পশু রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হতে বঞ্চিত হয়ে শহরের আশেপাশে সমবেত হচ্ছে। আর এ কারণে রাজপরিবার ধীরে ধীরে শহরের অশান্ত ও অসন্তুষ্ট নিম্ন শ্রেণীর জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে যাচ্ছে।[১]

তিনি অন্যত্র বলেন, অন্যদিকে প্রচুর ধন-দৌলত যা অসীম ক্ষমতাশালী সৌদি পরিবারের কোষাগারে জমা হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি, অর্থের অপব্যয় সীমাহীনভাবে দেখা দিয়েছে। তেল দ্বারা অর্জিত অর্থের একটি বড় অংশ অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করে নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। এ দ্বারা প্রধানত রাজপরিবারই উপকার লাভ করেছে। রাজপরিবারের মধ্যে তার স্ত্রীগণ ও শ্বশুর বংশীয় আত্মীয়-স্বজনও শামিল রয়েছে যাদের সংখ্যা প্রচুর। এদের সকলের কাছে আয়ের অংশ সোজাসুজি পৌঁছে যায়। বর্তমান সৌদি রাজপরিবার পূর্বের মরুভূমির শাসনকর্তা ওহাবী দলপতির পদমর্যাদা রাখেন না, বরং তিনি প্রাচ্যের জাঁকজমকপূর্ণ সকল রকম আমোদ-আহ্লাদের সাজ-সরঞ্জামের মধ্যেই জীবন যাপন করেন। বিশজন রাজপুত্রের মধ্যে সকলেই পৃথক পৃথক বিলাসবহুল মূল্যবান মোটর গাড়ি ক্রয় করেছেন এবং খুব জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা নির্মাণ করাচ্ছেন যা নতুন ধরনের আমোদ-প্রমোদের সরঞ্জাম (যথা : শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র ও গোসলের জন্য নতুন ধরনের হাউজ) দ্বারা সজ্জিত।[২]

যেই উদ্যম ও উৎসাহের সাথে কোন এক সময় ওহাবী গোত্র ইসলামের মূলনীতিসমূহ সংরক্ষণ করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে তারা যে সরলতার ওপর জোর দিয়েছিলেন তা বর্তমানে একেবারেই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে বিদেশী আমোদ-প্রমোদের সাজ-সরঞ্জামের বিরুদ্ধে জোরালো কোন বাদানুবাদ হয় না। এখন ঐ সবকে কেবল গ্রহণ করে নেয়া হয় নি, বরং সমাজের সব শ্রেণীর লোককে তা প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সেই সকল গোত্র যারা প্রথমে ওহাবী নিয়মের সরল-সহজ, জীবন যাপন করত, বর্তমানে তারা মরুভূমির বাসস্থান ছেড়ে তেলের নতুন কেন্দ্রের কাছে এসে বসবাস করছে। সেখানে বাস করার পর তারা পাশ্চাত্যের নতুন আবিষ্কৃত দ্রব্যের ব্যবহারে বেশি বেশি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। ঐ সমস্ত দ্রব্য তারা আরমকো (Aramco)-কোম্পানীতে চাকরী করে যে প্রচুর পরিমাণে বেতন পায় তা দ্বারা ক্রয় করে।

---

১. THE MIDDLE EAST TODAY, P. 402.

২. THE MIDDLE EAST TODAY, P. 406-407.

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যদি জাযিরাতুল আরবকে নিজ পায়ে দাঁড় করাবার উপযুক্ত চেষ্টা করা যেত, পরিকল্পিত ও সুষ্ঠুভাবে দেশ গঠন, দেশকে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা চলত, তবে দেশ এত হীনতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হতো না। এভাবে যদি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সমালোচনামূলক ও গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা করা যেত এবং " خذ ما صفاودع ماكدر " অর্থাৎ ভাল জিনিস গ্রহণ কর এবং মন্দ জিনিস ছেড়ে দাও– এর পুরাতন ইসলামী আরবীনীতির ওপর যদি কাজ করা হতো তবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ইসলামী কেন্দ্রের ওপর বন্যার স্রোতের মত এসে পড়ত না এবং কেবল এর খোলস ও বাহ্যাড়ম্বর দিকটি তাদের ভাগে আসত না। কিন্তু এর জন্য দূরদর্শিতা, ধৈর্য, গভীর চিন্তা ও মনোনিবেশের প্রয়োজন ছিল। প্রকৃত অবস্থা এই যে, যাদের ওপর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার ছিল তাদের মধ্যে এ সকল গুণের বড়ই অভাব ছিল।

এই আরব ইসলামী কেন্দ্র ও ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক, সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের কথা বলতে গিয়ে এই কথা ভুললে চলবে না যে, এর একটি চিরস্থায়ী বিশিষ্ট পদমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং থাকাও উচিত। সমস্ত পরিকল্পনা, সংশোধন ও উন্নতির যাবতীয় চেষ্টা এবং কাল ও স্থানের সকল সুযোগ-সুবিধা তার অনুগত ও অধীন হওয়া উচিত। স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও যুগের সহজ অবস্থাকে গ্রহণ করা, এ দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি বিষয় ইসলামের মৌলিক ভিত্তি ও মূলনীতির প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষা ও সভ্যতার এমন এক উপযুক্ত পোশাক এর জন্য তৈরি করতে হবে যা ওর সুন্দর দেহকে ঠিকভাবে সজ্জিত করে। আর যাতে সেই সজ্জায় ওর মৌলিক মর্যাদা, সম্মান, মূল্য ও তার মূল বার্তার সঙ্গে সংযোগ ও মিল থাকে। সে কারণে এই বার্তা সমস্ত মানবতার কাছে সব সময়ে ও সব যুগে পৌঁছাবার জন্যে দায়িত্বশীল।

অনুরূপভাবে এ কথা নির্ধারিত মূলনীতির মত মীমাংসিত থাকা উচিত যে, জাযিরাতুল আরব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লাগানো একটি বাগান যা তার দাওয়াত ও মেহনতের ফল। এই কারণে জাযিরাতুল আরবের ওপর একমাত্র তাঁর ও তাঁর সাহাবী এবং তাঁর দাওয়াতের ওপর যারা ঈমান রাখেন তাদেরই হক বা অধিকার রয়েছে। তাই এ স্থানে যে মূলনীতি ও কাজের পদ্ধতি, প্রোগ্রাম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে, সেটি এ প্রকৃতির আয়নাস্বরূপ এবং এর অনুরূপ হবে। এ জাযিরাতুল আরবের জন্য প্রয়োজন দীনের চিন্তা ও ঈমানের

নিরাপত্তার বিরোধী প্রতিটি জিনিস হতে দূরে থাকা, নতুবা তার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূরদৃষ্টি ভবিষ্যতের এই বিপদকে দেখেছেন বলে জাযিরাতুল আরব হতে ইয়াহুদী ও নাসারাকে বহিষ্কারের অসিয়ত করেছিলেন এবং এও ইরশাদ করেন যে, এখানে ইসলাম ছাড়া যেন অন্য কোন দীন বা ধর্মের অস্তিত্ব না থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর পয়গম্বরী প্রজ্ঞাপূর্ণ অসিয়ত অনুযায়ী অমুসলিমকে জাযিরাতুল আরব হতে কেবল শারীরিকভাবে বহিষ্কৃত করাই যথেষ্ট নয়, বরং তাদের সব রকমের প্রভাব, দাওয়াত ও সামাজিক রীতিনীতিকেও বহিষ্কার করা বোঝায় অর্থাৎ অমুসলিমের কোনরূপ প্রভাব, আচার ব্যবহারের চিহ্ন সেখানে থাকতে পারবে না। এটি প্রত্যেক জ্ঞানী লোকেরই জানার কথা।

এছাড়া এই জাযিরাতুল আরবে দু'টি হারাম শরীফ অবস্থিত। ঐ শহরটি শান্তি ও নিরাপত্তার শহর যেখানে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন, নবুয়ত দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন এবং যেখানে হজ্জ-এর ফরয ও যাবতীয় আহকাম-আদেশ আদায় করা হয়। আর এ পুণ্য ভূমিতে প্রিয় শহর (মদীনা) অবস্থিত। সেখানে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করেছেন, যেখানে তাঁর মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রথম আদর্শ ইসলামী সমাজ স্থাপিত হয়েছে, যে স্থান হতে ইসলামী দাওয়াত ও বিজয়গাথা ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। এ যে একটি বৃহৎ ও চিরস্থায়ী দায়িত্ব! এই কারণে এই দেশকে ইসলামী জীবনের প্রাণকেন্দ্র এবং ইসলামের পরিষ্কার আয়না হতে হবে যেখানে পৌঁছে প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করবে, আমি ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে আছি, যেখানে ওর প্রকৃত রুচি ও মেজাজের উজ্জ্বলতা দেখা যেতে পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ঐ জায়গাকে স্থায়ীভাবে হজ্জ পালনের কেন্দ্র এবং মুসলমানদের জন্য বার্ষিক ঠিকানা ও আশ্রয়কেন্দ্র বানিয়েছেন। এই কারণে এ বিশ্বাস নেয়ার অধিকার আছে যে, তারা এমন একটি শহরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন, যে শহর পবিত্রতার মূল উৎস, দীনের প্রাণকেন্দ্র এবং ইসলামের চারিত্রিক ও আত্মিক রাজধানী। ইসলামবিরোধী প্রবণতা ও ইসলামী শিক্ষার বিরোধী প্রভাব হতে এই দেশ যথাসাধ্য দূরে থাকবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখে ইসলামী বিশ্ব হতে দূরে অবস্থিত কোন দেশের মত আত্মসমর্পণ করবে না। কারণ ওর বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব আলাদা।

এর পরিকল্পনায় থাকতে হবে সরলতা, বাস্তবতা, দুনিয়ার প্রতি যৎসামান্য উদাসীনতা ও আড়ম্বরহীন জীবনের ছোঁয়া। ফলে এখানে দূর-দূরান্ত হতে যারা আসে তারা এই পরিবেশ ও সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হবে এবং অনুভব করবে যে, এখানে পূর্বের মুসলমানগণ হজ্জ আদায় করতেন এবং নিজেদের মধ্যে পূর্ববর্তীদের মত অনুভূতি জাগ্রত করবে। এরূপ হওয়া উচিত নয় যে, হারাম শরীফই কেবল ইবাদত ও শান্তির বিশেষ এক দ্বীপ বনে থাকবে যার চতুর্দিকে বস্তুবাদী সভ্যতার সমুদ্রের ঢেউ উঠছে এবং ওর অরোধ্য তরঙ্গসমূহ হারাম শরীফের দেওয়ালের সাথে আঘাত করে আরও অগ্রসর হয়ে আসছে।

কেবল সামাজিক ঐতিহ্য ও দেশীয় রীতিনীতি কোন কার্যক্ষম সভ্যতার মুকাবিলা করতে পারে না

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রত্যাখ্যান অথবা তাকে স্থগিত রাখার মানসিকতা প্রকৃতপক্ষে কোন প্রাচ্য দেশে বেশি দিন স্থায়ী থাকতে পারে না। কারণ ঐতিহ্য ও রীতি-রেওয়াজ অথবা সামাজিক নিয়মনীতির কাঠামোর পেছনে বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন শক্তিশালী আকীদা প্রয়োজন। তদুপরি এর সাথে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও থাকা চাই যা পরিবর্তনশীল জগতের প্রকৃতির সঙ্গে ইসলামের চিরস্থায়ী মূল বিষয়সমূহের সমন্বয় সাধন করার যোগ্যতা রাখে। আধুনিক সভ্যতার ভাল ও উপকারী অংশ এবং মন্দ ও অনুপকারী অংশের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতাও রাখে। অন্যথায় বর্তমান অবস্থায় এই সুস্থ-সবল ও গতিশীল সভ্যতার মুকাবিলায় বেশি সময় টিকে থাকা সম্ভব নয় এবং এর ঘাত-প্রতিঘাত হতে কোন জাতিকে রক্ষা করাও সম্ভব নয়। যে সকল দেশ নিজেদের পুরাতন ঐতিহ্যকে প্রিয় মনে করে, কিন্তু এটাকে টিকিয়ে রাখা ও প্রশস্ত করার যোগ্যতা রাখে না এবং শক্তিশালী ঈমান ও পরিপূর্ণ জ্ঞানও তাদের নেই, তবে তাদের ভাগ্যে সত্বর হোক অথবা দেরিতে হোক, অবনতি ও পতন অনিবার্য।

এভাবে যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার উপায়-উপকরণ দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিষয়টি নিয়মিতভাবে বিবেচিত ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী না হয় এবং অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা এবং ভালমন্দের পার্থক্যের ভিত্তির ওপর না হয়, তাহলে এই সভ্যতা দেশের নেতা, পরিচালক ও দীনের আলিমদের ইচ্ছার বিপরীত এই দেশ অথবা সমাজের ওপর অপরিহার্যভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে বসবে। জনসাধারণ আনন্দ ও উৎফুল্ল হয়ে তাকে গ্রহণ করবে। শিক্ষিত সমাজ ও চিন্তাবিদগণ এর রাস্তা পরিষ্কার করে দেবেন এবং ভাল-মন্দ, উপকারী ও অনিষ্টকারীর মধ্যে পার্থক্য করা

ছাড়াই ঐ দেশের নাগরিকগণ ক্ষুধার্ত জনগণের মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ফলে চারিত্রিক ও দীনী মূল্যবোধসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে। দেশের নেতা, পরিচালক, দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ হতভম্ব হয়ে যাবে। তাদেরকে পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত বলে মনে হবে এবং তাদের কাছ থেকে চিরতরে কর্তৃত্ব চলে যাবে।

সভ্যতা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও জ্ঞানসুলভ পদক্ষেপের প্রয়োজন

প্রাচ্যের প্রায় দেশ (কোন দেশকেই বাদ দেয়া যায় না) বর্তমানে এক এক করে পাশ্চাত্য সভ্যতার গ্রাসে পরিণত হয়েছে। কোন বাধা ছাড়া এই বিপদসংকুল স্রোত তাদেরকে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ ছিল তাদের নেতৃত্ব সাধারণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞান, তা নির্বাচন ও পার্থক্য করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হতে বঞ্চিত ছিল। চিত্রের উভয় দিক তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়নি। শিক্ষা পদ্ধতি ও দেশের নতুন শাসন বিধানের ভিত্তি জ্ঞানসূচক পরিকল্পনা (Planning) ও আধুনিক অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

এছাড়া বৃহত্তম কারণ ছিল খাঁটি ইসলামী শিক্ষা হতে বিমুখ হওয়ায় বা ইসলামী শিক্ষা বর্জিত হওয়ায় দেশে এমন এক অবস্থা ও এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যাকে জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি কোনমতেই সঙ্গত বলে মনে করতে পারে না এবং কোন যুগে বা কালে তার স্থিতিশীল হওয়ার যোগ্যতা ছিল না, বিশেষ করে এই পরিবর্তনশীল ও পরিবর্তনমুখী কালে তো নয়ই!

আফগানিস্তানেও (যে দেশ গোটা প্রাচ্যে নিজ রীতিনীতি ও রেওয়াজের প্রতি বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান ছিল, বরং প্রাচীন আফগানী ঐতিহ্য বজায় রাখার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদর্শনের জন্য প্রসিদ্ধ) এই বিপদ উপস্থিত হয়েছিল। তা বহুদিন যাবত পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব হতে ও সব রকমের ভাল-মন্দপ্রসূত পরিবর্তন হতে নিজেকে রক্ষা করেছিল এবং পুরাতন সভ্যতা, সামাজিক ঐতিহ্য ও রীতিনীতিসমূহকে দাঁতে কামড়িয়ে ধরে রেখেছিল। তারা আধুনিক সভ্যতার ফলে উপকারী অংশসমূহকেও গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না।

আফগানিস্তান, রাশিয়া ও ভারতবর্ষের (তা তখন বৃটিশ রাজত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল) মধ্যে অবস্থিত বৃহৎ দায়িত্ব, সময়ের শোচনীয়তা ও বিপদের আশংকা সত্ত্বেও তারা ছিল শিক্ষা, শিল্প ও সামরিক বিষয়ে ভীষণ পশ্চাৎপদ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর পর্যন্ত তারা নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান, নতুন সংগঠন ও প্রয়োজনীয় সামাজিক উন্নতি হতে বঞ্চিত ছিল। এই পশ্চাৎগতির

বিষয়টি এমন এক জ্ঞানী বিখ্যাত মুসলমান পর্যটক দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে যিনি ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্তান ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি আট বছর সেখানে জীবন যাপন করেন এবং রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে একজন স্থানীয় বাসিন্দার মত ঐ দেশের অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি হলেন যফর হাসান আইবক।[১]

তিনি আফগানিস্তানের শিক্ষা অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর 'আপবীতি' গ্রন্থে লিখেছেন :

ঐ সময় আফগানিস্তান শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু পেছনে ছিল। সম্ভবত সমস্ত আবাদীর মধ্যে শতকরা একজন বা দু'জন লেখাপড়া জানত। তারাও কেবল পুরাতন মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষা লাভ করেছে। পুরাতন শাসনকর্তা সম্ভবত নিজ প্রজাগণকে এই কারণে শিক্ষা দিতে ভয় পেতেন, যদি প্রজাগণ শিক্ষিত হয়, তাদের চক্ষু খুলে যাবে এবং তারা স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। আমীর হাবিবুল্লাহ খাঁর (সিরাজুল মিল্লাতে ওয়াদ্দীন) সময় একটি সাধারণ মকতব (হাবিবিয়া মকতব নামে) আর একটি সামরিক স্কুল (হারবিয়া মকতব) নামে স্থাপিত ছিল। আফগানিস্তানে নতুন শিক্ষা ও বর্তমান উন্নতির ভিত্তি আমীর হাবিবুল্লাহ খাঁর সময় স্থাপিত হয়, যদি তিনি আমীর আব্দুর রহমান খাঁর (যিয়াউল মিল্লাত ওয়াদ্দীন) পর আফগানিস্তানের অধিপতি না হতেন তা হলে সম্ভবত সে দেশে নতুন সভ্যতা ও আধুনিক শিক্ষার নামও কেউ জানত না।[২] কাবুল ছাড়া অন্য কোন শহরে আধুনিক পদ্ধতির কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। জনগণ পুরাতন পদ্ধতিতে মসজিদে কুরআন শরীফের শিক্ষা লাভ করত। যে সমস্ত কেরানী দপ্তরে কাজ করত যাদেরকে আফগানিস্তানে

---

১. যফর হাসান কর্নেল পূর্ব পাঞ্জাবের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি লাহোর সরকারী কলেজে বি. এ. শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। জিহাদের আবেগ, ইংরেজদের সাথে শত্রুতা ও ভারতের স্বাধীনতার উৎসাহে বিহ্বল হয়ে শিক্ষা ও ভারতকে ত্যাগ করেন এবং হিজরত করে ১৯১৫ সালে কাবুল চলে যান। সেখানে মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধির একজন শিষ্য ও সাহায্যকারী হন এবং জেনারেল নাদের খাঁর বিশ্বস্ত ডান হাত হয়ে কয়েক বছর পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা ও আফিগানিস্তানের গঠন ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি সামরিক ও রাজনৈতিক ময়দানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২২ সালে কর্মের সীমা সংকীর্ণ হওয়ায় ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারায় তিনি মাওলানা সিন্ধির সঙ্গে কাবুল হতে তুরস্কের দিকে রওনা হয়ে যান। তুরস্কের আরটিলারী ক্যাপটেনের পদ পর্যন্ত উন্নীত হন। তৎপর ঐ দায়িত্ব হতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর চিত্তাকর্ষক, শিক্ষণীয় চক্ষু খুলে দেয়ার মত গ্রন্থ (আত্মজীবনী) 'আপবীতি'র ১ম অংশ লাহোরের মনসূর বুক ডিপোর পক্ষ হতে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়।

২. আপবীতি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫।

মির্জা বলা হতো; তারা প্রাইভেটভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত ছিল। তাদের সাধারণ জ্ঞান খুব সীমিত ছিল। আমীর হাবিবুল্লাহ খান ১৯০৫ সালে ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এরপর আফগানিস্তানে আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল।[১]

আমি (জালালাবাদে) পত্র লেখার জন্য কাগজ ও লেফাফা তালাশ করি, তখন জানা গেল যে, সেখানে এমন কোন দোকান নেই যেখানে দোয়াত, কলম, পেন্সিল বিক্রয় হয়। এরপর আমাকে বলল, কাগজ কসাইয়ের দোকানে বিক্রয় হয়। কিন্তু দোয়াত-কলম কেউ বিক্রয় করে না।[২]

তখন আফগানিস্তানে শিল্প ও ব্যবসার অবস্থা যা ছিল তা নিম্নের বিবরণ দ্বারা অনুমান করা যায় :

যফর হাসান লিখছেন, "এই সময় কাবুলে একটি জুতার দোকান ছিল, যদ্দারা সাধারণত সৈনিকদের প্রয়োজন পূরণ করা হতো। স্থানীয় লোকদের জন্য জুতা খুব কমই তৈরি করা হতো। সাধারণত কাবুলের বাজারসমূহে ভারত ও বৃটিশের তৈরী জুতা পাওয়া যেত। হাত দ্বারা বানানো তাঁতের সুতির ও পশমী কাপড় গ্রামে বেশি ব্যবহার করা হতো। হারাতে উটের পশম দ্বারা ভাল পশমী কাপড় বানানো হতো। কার্পেট খুব বেশি তৈরি হতো। আফগানী ডিজাইনের কার্পেট যাকে ফীলপায়া বলা হতো, বিভিন্ন দেশে তা রফতানী করা হতো।[৩]

যাতায়াত, পরিবহন ও ডাক বিভাগের অবস্থা নিম্নের বর্ণনা হতে অনুমান করা যায় : আফগানিস্তানে তখন কোন রেল লাইন ছিল না। বর্তমানেও কোন রেল লাইন নেই। তা ছাড়া চলাচলের রাস্তা খুবই কম ছিল এবং যা ছিল তাও কাঁচা। পাকা রাস্তা ছিল কাবুল শহরে এবং তার আশেপাশে, কাবুল, জালালাবাদ, ডাক্কা, কাবুল লগচান, কাবুল জাবালুস সেরাজের বিদ্যুৎ কারখানা, জালালাবাদ পগমানের ও শেতায়িয়ার (কর্মচারী ও দরবারীদের শীতকালীন ভ্রমণ ও শিকারের স্থান) মধ্যে স্থাপিত ছিল। ঐ রাস্তাসমূহে যে সমস্ত পুল ছিল, সেগুলোও বেশি শক্ত ছিল না। বর্ষাকালে স্রোতে নষ্ট হয়ে যেত। কাবুল, কান্দাহার, হেরাত, মাজার শরীফ, গরদেইষ, গজনীর মত শহর ও বড় গ্রামসমূহের মধ্যের রাস্তাগুলো খুবই বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। যদি কোন সময় কোন রাজপুত্র অথবা গভর্নরের ঐদিকে যাওয়ার প্রয়োজন হতো তখন তা সাময়িকভাবে মেরামত করে দেয়া হতো। আর তা না হলে যেভাবে আছে, সেভাবে

---

১. আপবীতি, পৃ. ৮০।
২. ঐ, পৃ. ৬৭-৬৮।
৩. ঐ, পৃ. ৫৫।

থেকে যেত। সওয়ারী ও বোঝা বহন করার জন্য সাধারণত ঘোড়া, খচ্চর, টাট্টু ঘোড়া ও উট কাজে লাগানো হতো। ঘোড়ার গাড়ি প্রচলন কাবুল অথবা জালালাবাদের মধ্যেই ছিল। মোটর কার কেবল হাবিবুল্লাহ খানের আরোহণের জন্য ছিল। অন্য আমীর ও মন্ত্রিগণ ঘোড়ায় আরোহণ করতেন। এই কারণে তাদের আস্তাবলে ভাল ভাল ঘোড়া থাকত। ডাকের অবস্থা একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় ছিল।

বেশির ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশাবলী গভর্নরদের ও জেলার শাসন-কর্তাদের কাছে পৌঁছাবার জন্য ব্যবহৃত হতো। মানুষ সাধারণত এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাবার সময় চিঠিপত্র সঙ্গে নিয়ে যেত। এই সম্পর্কে ডাক বিভাগ দ্বারা লোকের উপকার সাধিত হতো না। ভারত হতে সপ্তাহে দু'বার ডাক আসত। কোন কোন সময় সপ্তাহে মাত্র একবার আসত, বিশেষ করে শীতকালে একবার আসত। ডাকের সঙ্গে সংবাদপত্র আসত। কাবুল ও জালালাবাদের মধ্যে একখানা টেলিফোন লাইন ছিল। এ দ্বারা কেবল আমীর সাহেব শীতকালে জালালাবাদ গেলেই একটু ভালভাবে কাজ নেয়া হতো। সরকারী সংবাদ পৌঁছানো ছাড়া অন্য কোন প্রাইভেট কাজ তা দ্বারা নেয়া হতো না। টেলিগ্রাফ বিভাগ মোটেই ছিল না।[১]

ঠিক মহাযুদ্ধের সময় যখন আফগানিস্তান দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে পরিবেষ্টিত ছিল, সামরিক শক্তি, যুদ্ধের প্রস্তুতি ও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের দিক দিয়ে দেশের কি অবস্থা ছিল তার ধারণা আইবক সাহেবের এই বর্ণনা দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে। তিনি লিখছেন :

ঐ সময় আফগানী সৈনিকদের হাতিয়ার প্রাথমিক ধরনের ছিল। কেবল কাবুলের সৈনিকদের আধুনিক ধরনের বন্দুক ছিল। ঐ সমস্ত বন্দুককে আফগানরা 'কুলিং জান্ডারদার' বলত। আর কতেক বৃটিশ মার্টিনা (Martina) বন্দুক ছিল। কতেক মেশিনগান ও দু'টি জার্মানীর দ্রুত অগ্নি সংযোগকারী তোপ ছিল। অন্যান্য তোপ পুরাতন ও পিতলের ছিল এবং এই ধরনের সমরাস্ত্রের পৃথিবীর কোথাও ব্যবহার ছিল না। সৈনিকদেরকে সরকারীভাবে সরকারী রসদ ভাণ্ডার হতে খাদ্য সরবরাহ করা হতো না, বরং তাদেরকে মাসিক বেতন দেয়া হতো, যা তাদের পরিবার-পরিজনের জীবন যাপনের জন্যও যথেষ্ট হতো না। আটা ক্রয় করে রুটি তৈরি করত এবং রুটির সঙ্গে খাওয়ার জন্য তরিতরকারি নিজেই সংগ্রহ করত। চুল্লির জন্য এদিক-ওদিক হতে ও পাশের বৃক্ষসমূহ হতে জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে

১. আপবীতি, ৫৬/৫৭

আনতে হতো। এ কারণে তাদের প্যারেডের জন্য সময় খুব কম থাকত। তাই তাদের মধ্যে সৈনিকী নিয়মানুবর্তিতাও ছিল না এবং তাদেরকে শক্তিশালীও দেখা যেত না।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগ সম্পর্কে আফগানিস্তানের দৈন্যদশা ও অসহায় অবস্থার ধারণা নিম্নের বিবরণ দ্বারা পাওয়া যাবে :

সারা দেশে কেবল একটি সিভিল ও একটি সামরিক হাসপাতাল ছিল। সিভিল হাসপাতালের প্রধান সার্জন ডা. মুনির বেগ (তুরস্ক) ও অভ্যন্তরীণ রোগের অভিজ্ঞ ডাক্তার ফখিমা ছিলেন। ভারতীয়রা এখানে কম্পাউন্ডারের কাজ করত। মিলিটারী হাসপাতালের কর্মকর্তা আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে জনৈক সুজাউদ্দৌলার আত্মীয় ছিলেন, নাম হলো ডা. আল্লাহ্ জোযায়া। তিনি লাহোরের অধিবাসী ছিলেন।[১]

মহকুমা অফিসারদের ও দায়িত্বশীল পদস্থ কর্মকর্তাদের যোগ্যতার মান খুবই নিম্ন মানের ছিল। সাধারণ অবস্থায় সামান্য লেখাপড়ার উর্ধ্বে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা কারো ছিল না। তখন আফগানিস্তানের সি. আই. ডি.'র প্রধান ফার্সী ভাষার প্রাথমিক ব্যাকরণও জানতেন না। তিনি ইংরেজী ভাষার প্রাথমিক পাঠ যফর হাসান আইবক থেকে নিতেন। তিনি লিখছেন :

তখনকার আফগানী জনগণ ও তাদের শাসকদের দৃষ্টান্ত অন্ধদের মধ্যে কানা রাজার সঙ্গে তুলনা দেয়া যেতে পারে। লোক অশিক্ষিত ও নিম্নস্তরের ছিল। যে ব্যক্তি সামান্য লেখাপড়া জানত, তারই চাকরি হতো। সরকারী কাজে অনেক অনুপযুক্ত লোক ছিল। কেউ জিজ্ঞেস করত না কোন্ যোগ্যতাবলে তারা এত বড় বড় পদ পেয়েছেন। বর্তমানে আফগানিস্তানে গ্রাজুয়েট ও ডিগ্রীপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ অফিসার খুবই কম।[২]

অবশেষে এখানেও এই পর্দার উন্মোচন হয়েছে এবং তারাও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবন পদ্ধতি (দুর্বলতা ও সমস্ত দোষ-ত্রুটির সঙ্গে) গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিয়েছে এবং চক্ষু বুজে দ্রুততার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবন প্রণালীকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। এই ৩২ বছরের সময়ে সেখানে এমন অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে যা আফগানী সমাজ সহ্য করতে পারেনি যার প্রতিশোধ হিসেবে আমীর আমানুল্লাহ খানকে নিজ পৈতৃক সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছিল। বর্তমান আফগানিস্তান ঐ

---

১. আপবীতি, পৃ. ৬৩।

২. ঐ, পৃ. ১১৭।

সমস্ত আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি খুব আনন্দ-উৎসাহ ও আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করছে। এই মহাপরিবর্তনের অনুমান এক চাক্ষুষ সাক্ষীর বর্ণনা দ্বারা করা যায় :

টাইমস অফ ইন্ডিয়া-এর ইউরোপীয় রিপোর্টার Ritchie Colder যিনি ১৯৬৩ সালে আফগানী স্বাধীনতা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, ঐ পত্রিকার ১৯৬৩ সালের ২৮ জুলাই-এ প্রকাশিত সংখ্যায় লিখেছেন :

বিস্তৃত আকারে ছেড়ে দেয়া আতশবাজি ও পটকার (যা এর পূর্বে আফগানিস্তানে দেখা যায় নি) প্রতিটি দর্শনীয় খেলা দেখে পাঁচ লক্ষ দর্শকের মুখ হতে প্রশংসা ও জয়ধ্বনির চিৎকার বের হচ্ছিল। এভাবে আফগানিস্তান স্বাধীনতা উৎসব সপ্তাহ উদ্‌যাপন করছিল। আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী (যিনি আমাদের সঙ্গে লেকের পার্শ্বে রাজকীয় বৈঠকে বসা ছিলেন এবং যেখানে পরপর পটকা ছেড়ে দেয়া হচ্ছিল) আমাকে বলেছিলেন, আপনি অসময়ে এসেছেন। আমরা এখন স্বাধীনতা উৎসব পালন করছি। এমন সময় পঞ্চবর্ষীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি ঐ জবাবে বলেছিলাম, না, না, এটা খুবই উপযুক্ত সময়।

কোন দেশের ইতিহাস বা চরিত কথা ঐ সময় ভালভাবে পরীক্ষা করা যায় যখন তারা আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকেন। আমি তো আফগান মেয়েদেরকে মুচকি হাসি দেখতে চাই ঠিক ঐ সময় জনৈকা সুন্দরী মেয়ে আমাদের দলে এসে পড়ল যার মুখে মুচকি হাসি ছিল। এসব যা কিছু ঘটেছিল তা ঐ আলোতে সংঘটিত হয়েছে যা বিদ্যুৎ স্কিম বাস্তবায়নের ফলে কাবুল শহরকে আলোকিত করেছিল। সেখানকার সমস্ত অট্টালিকা নতুন নতুন শিল্প ও বৈষয়িক উন্নতির নিদর্শন ছিল। কিন্তু এর চেয়ে অধিক আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের দৃশ্য আমার সম্মুখে যা পেয়েছি তা-ই ছিল দর্শনীয়।

তিন বছর পূর্বে এই দেশের মেয়েরা পর্দানশীন ছিল। তখন যদি এমন অবস্থায় বের হওয়ার অনুমতিও পেত, তখন তারা চাদরে আবৃত হয়ে আসত যাতে তাদের মাথা হতে পা পর্যন্ত ঢাকা থাকে এবং ওড়না তাদের মুখমণ্ডলকে ঢেকে রাখে। ওড়নার মধ্যে দেখার জন্য ছিদ্র থাকত মাত্র।

বর্তমানে এই সমস্ত পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে গিয়েছে। এখন কিছু সংখ্যক মেয়ে রাজকীয় উৎসবে বোরকা পরিধান করে আলাদা বসতে দেখা যায়। মুখ খোলা রাখবার স্বাধীনতা যা পাওয়া গিয়েছে, তাতে এখনও তারা অভ্যস্ত হয় নি। কিন্তু বেশি সংখ্যক মেয়ে পর্দাহীন হয়ে গিয়েছে।

আফগানিস্তানের বাইরে যারা থাকেন, তাদের জন্য অনুমান করা কঠিন হবে যে, এই পরিবর্তন আফগানী মেয়েদের ওপর কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছে! ৩২ বছর পূর্বে বাদশাহ আমানুল্লাহকে ধর্মীয় আলিমগণ এই কারণে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন যে, তিনি তাঁর রাণীকে বেপর্দা বের হবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

এই দাবিটি প্রায় ঠিক বলে গণ্য করা হবে যে, আফগানী মেয়েদের পর্দাহীন হওয়ার সূচনা মা ও শিশুদের চিকিৎসা কেন্দ্র হতে হয়েছে। যখন ডাক্তার আন্না মারিয়া গেড (Anna Maria Gade) যিনি বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য বিভাগের আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার দিল্লীর প্রধান) দশ বছর পূর্বে ডেনমার্ক হতে আফগানিস্তানে এসেছিলেন। সেখানে সন্তান প্রসব করাবার কোন মহিলা ডাক্তার ছিল না। সমগ্র আফগানিস্তানে তখন ১২০ জন ডাক্তার ছিল, তারা সবাই পুরুষ ছিলেন। কোন পুরুষ ডাক্তারকে মেয়েদের দেখার অনুমতি ছিল না। স্থানীয় ধাত্রিগণ নতুন ধরনের চিকিৎসা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। ডাক্তার সেই ধাত্রীদেরকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। শিক্ষার্থিনীদের মধ্যে শাহী পরিবারের মেয়েরাও ছিল।

মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হলো, বোরকা-পরা অনেক মহিলাও সেখানে আসতে লাগল। তথায় মহিলাদের কেবল শারীরিক চিকিৎসা হলো তাই নয়, বরং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হলো। মহিলা ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর তাদের এই জ্ঞানও জন্মেছিল যে, মহিলারাও এই পেশায় পুরুষের মত জীবিকা উপার্জন করতে পারে এবং এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, অসুস্থ মহিলারা ঐ চিকিৎসা কেন্দ্র হতে এই অনুভূতি নিয়ে এসেছে যে, তারাও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখন আর তাদের গৃহের আসবাবপত্রের মত বাড়িতে গোপন করে রাখা চলবে না।

বর্তমানে ঐ সমস্ত মহিলার জন্য উচ্চ ধরনের হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে যার কর্মকর্তা হলো উচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত মহিলাগণ, যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-পদ্ধতির ওপর সীমাহীন গুরুত্ব দেয় এবং এই সম্পর্কে ডাক্তার গেইড যে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন তা চালু রেখেছেন।

১৯৫৯ সালের আগস্ট মাস হতে আফগানিস্তানের মহিলারা চলাফেরা করতে আরম্ভ করেছে। এক রাজকীয় আদেশ অনুসারে মহিলাদেরকে বোরকা হতে বের হওয়ার আদেশ দেয়া না হলেও অনুমতি দেয়া হয়েছে।

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারগ্রাজুয়েট মা'সুমা কাযেমী মহিলা যিনি নব জীবনের প্রতীক ছিলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই আদেশ জারি হওয়ার

পর তুমি কি করেছিলে? সে উত্তরে বলল, আমি ও আমার বোন বোরকা ও চাদরসমূহ আগুনে পুড়িয়ে ফেললাম এবং শপথ গ্রহণ করলাম, আর কোনদিন বোরকা ও চাদর ব্যবহার করব না। মাসুমা ও তার বোন ফিরোজা জনৈকা ব্যাংক কর্মকর্তার মেয়ে। এই দুই ভগ্নি ১৯৬৫ সালে শিক্ষা শেষ করে মহিলা ডাক্তার হয়ে যাবে। মহিলা ডাক্তারদের প্রথম দল ১৯৬৪ সালে সাত বছরের ডাক্তারী পাঠ শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হবে।

বর্তমানে আফগানিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা চলছে, পূর্বে তথায় ছাত্রীরা চাদর ব্যবহার করে ভিন্নভাবে বসে পড়তে অভ্যস্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিনা বেতনে চলছে। ছাত্রদের বই-পুস্তক, বেতন, কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়া সব বিষয়ের ভার সরকার বহন করেন। অতি সত্বর অনেক ছাত্রী ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হবে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুরুষ ও মহিলা শিক্ষকের খুবই প্রয়োজন ছিল। কারণ সেখানে শিক্ষা বিদেশী শিক্ষকদের ওপর বেশির ভাগ নির্ভর করত।[১]

১৩৯৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে যখন গ্রন্থকারের আফগানিস্তান যাওয়ার এবং সেখানের অবস্থা নিকট থেকে দেখার সুযোগ ঘটে, তখন তিনি কাবুল নদী হতে ইয়ারমুকের নদী পর্যন্ত লীমায় ভ্রমণ কাহিনীতে কতেক আধুনিকতাপ্রিয় আফগানী মহিলাদের আলাপ-আলোচনার একটি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে যেয়ে যা লেখেন, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

আমি এ কথা অনুভব করতে বাধ্য হয়েছি যে, দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার বহু অগ্রগতি হয়েছে এবং তার ফলাফলও প্রকাশ পাচ্ছে। ১৯২৮ সাল ও ১৯৭৩ সালের মধ্যে সাগরসম ফারাক সৃষ্টি হয়েছে। আমীর আমানুল্লাহ খানের সময় পর্যন্ত আফগান জাতি ইসলামী ও আফগানী ভাবধারার ওপরে ভীষণ দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির ছিল এবং একে দাঁতে কামড়িয়ে রেখেছিল। এক্ষেত্রে তাদের শক্ত অবস্থান সীমা অতিক্রম করেছিল। তারই ফল ছিল যে, আমীর আমানুল্লাহ খান পুরাতন রীতির বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তার বিরুদ্ধে হৈ চৈ ও আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণেই তাকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান অবস্থা একেবারেই ভিন্ন।

১. Times of India, 28. July–1963.

আফগান জাতি নিজের অতীতকাল হতে বহু দূরে সরে পড়েছে। এই দূরত্ব দিন-ক্ষণ হিসেবে বহু কম অর্থাৎ মাত্র ৪৫ বছর। কিন্তু চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতা সাংস্কৃতিক দিক থেকে বহু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। সাধারণত একটি জাতি শত শত বছরে এই দূরত্ব অতিক্রম করে। বর্তমানে পর্দা প্রথা পশ্চাদ্‌বর্তিতা, অজ্ঞতা ও দরিদ্রতার চিহ্নস্বরূপ হয়ে গিয়েছে। এ কারণে পর্দার বিষয়টি দীনদার আলিম ও রাজধানী হতে দূরে বসবাসকারী কৃষকদের পল্লীগ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং দীনের পথপ্রদর্শক আলিমগণ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দলের মধ্যে সৃষ্ট সাগর খুবই প্রশস্ত যা অতিক্রম করা সহজ নয়।

আমার সফর সঙ্গী শেখ আহমদ জামাল কাবুলে অন্য মহিলাদের এক বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। আমি ঐ সময় গযনী ছিলাম বিধায় অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। আমি যখন ফিরে আসি তখন তিনি আমাকে বললেন, পর্দা, পুরুষের তালাকের ক্ষমতা, পুরুষের একের অধিক বিবাহের ক্ষমতা সম্পর্কে বহু তর্ক-বিতর্কসহ আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, আফগানী মেয়েদের মনোভাব ও চিন্তাধারা কত দূর অগ্রসর হয়েছে এবং বিদেশী সভ্যতা ও চিন্তাধারার প্রচার ও প্রভাব কি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে।[১]

১৯৭৮ সালে সৈনিকদের এক বিপ্লবের ফলে সরদার দাউদ খান-এর রাজত্ব উলটিয়ে দেয়া হয়েছিল। জনগণের ওপর অত্যাচার, কঠোরতা ও সৈনিকদের সামান্য গৃহযুদ্ধের পর সেনাবাহিনীর কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং রাশিয়ার সাথে বিশেষভাবে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আলিম ও দীনদার যুবকগণকে গ্রেফতার করা হয় এবং তারা হত্যা ও লুটপাটের শিকারে পরিণত হয়। জুলুম ও অত্যাচারের ফলে ও আফগানী জনসাধারণের ধর্মীয় মেজাজ ও দীনী ক্রোধের কারণে কম্যুনিস্ট রীতিনীতির বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন সৃষ্টি হয়ে যায়। এ কারণে রাশিয়াকে হস্তক্ষেপ করে দু'বার নতুন শাসক নিযুক্ত করতে হয়েছে। পরে এতেও যখন কাজ সফল হয়নি তখন প্রকাশ্যে সৈন্য পরিচালনা করে দেশকে নিজেদের দখলে এনে নিজ পরিচালনাধীন করে নিতে হয়।

এ পদক্ষেপের কারণে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ রাশিয়ার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছে এবং তা নগ্ন আগ্রাসন বলে আখ্যায়িত হয়েছে। এই ঘটনা ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি বলে মনে করা হয়েছে। যেমন অতীতের একটি বড় দেশ অন্য একটি ছোট দেশের

১. দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক, ৩১-৩২।

ওপর সৈন্য পরিচালনা ও শক্তি প্রয়োগ করে নিজ কবলে এনে তাকে গোলাম বানিয়ে নিত। রাশিয়ার এ ঘৃণ্য আগ্রাসনের ফল যার নমুনা অতীতে কোন সময় দেখা যায়নি। এর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে এবং কম্যুনিজমের বিশেষ মানব সাম্য ও অত্যাচারিতদের পৃষ্ঠপোষকতার বিশেষ দাবির প্রতি জোর ধাক্কা লাগিয়েছে এবং ছোট ছোট শান্তিপ্রিয় ও আত্মসচেতন দেশ যাদের নিকট নিজ বিশ্বাস ও জীবনের রীতিনীতি খুবই মূল্যবান তারা আজ ভীত এবং তাদের মনে আজ সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا। অর্থাৎ হতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা এর পর কোন পথ বের করে দেবেন।

তদ্রূপ ইয়ামান ও ঐ সমস্ত দেশের অবস্থাও একই। যারা বহুদিন যাবত আধুনিক বস্তুসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারা উপকারী জ্ঞান, অনিষ্টকারী নয় এমন উপায়-উপকরণ শৃংখলাপূর্ণ আধুনিক অভিজ্ঞতা, জনকল্যাণ প্রচেষ্টা ও সামরিক কলা-কৌশলকেও সীমায় প্রবেশ করতে অনুমতি দেয় নি।

ইয়ামানের ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ উন্নতি ও সুব্যবস্থাপনা, বহির্জগতের সাথে সংযোগ ও যুগের গতির সঙ্গে সহযোগিতার যে অবস্থা ছিল তার অনুমান নিজের অভিব্যক্তি দ্বারা করা যায় যা মিসরের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক (روز اليوسف) 'রোয আল ইয়ুছুফ'-এর আরব সংক্রান্ত বিষয়ের সম্পাদক মমদূহ রিযা সাহেব, ইয়ামানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল উমরীর السيد محمد عبد الله العمرى সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অর্জন করেছেন যা ১৯৫৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এক কথোপকথন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। সেই তথ্যের আলোকে নিম্ন অবস্থা জানা যায় :

১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ইয়ামানে নিয়মিত কোন আদমশুমারী হয়নি। আয়ের উপায় কেবল কর ও কাস্টমের শুল্ক ছিল। কৃষিই ছিল ইয়ামানের নাগরিকদের জীবিকার উপায়। তথায় পানি সিঞ্চনের উপায় কেবল দু'টি ছিল, বৃষ্টির পানি ও কূপের পানি। বার্ষিক বাজেট কেবল দুই কোটি পাউন্ড ছিল। দেশের রক্ষিত সম্পদ ইয়ামানের ইমাম (নেতা)-এর ব্যক্তিগত সম্পদ (৮ কোটি পাউন্ড) ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সমগ্র দেশে সাধারণত চলাচলের কোন রাস্তা ছিল না। কেবল দু'টি শহর, মুখা ও তায়ায-এর মধ্যে কিছু দিন পূর্বে ১২০ কি. মি. একটি দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে যা ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কাঁচা ছিল। সমগ্র দেশে কেবল ছয় শ' মকতব ছিল।

এ ছাড়া সমস্ত শহরে প্রাইমারী স্কুল ছিল। তায়ায, মুখা ও হুদাইতেই কেবল মাধ্যমিক স্কুল ছিল। সেনাবাহিনী তিন প্রকারের ছিল। প্রথম যে বাহিনী বর্তমানে কার্যরত আছে তারা ছয় ব্রিগেড ছিল। দ্বিতীয় বাহিনীকে ট্রেনিং দিয়ে অবসর দেয়া হয়েছিল। প্রয়োজনের সময় তারা দায়িত্ব পালন করত। এরা ছিল ১৪ ব্রিগেড। এ ছাড়া তৃতীয় বাহিনী ছিল বিভিন্ন গোত্র দ্বারা গঠিত বিশ হাজার লোকের একটি দল। চতুষ্পদ জন্তুই আসা-যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল। দেশে কেবল কয়েকখানা প্রাইভেট মোটর গাড়ি ছিল। কোন বিমান বাহিনী ছিল না। মাত্র ১১ খানা বিমান ছিল যার মধ্যে ডকোটা ছিল তিনখানা। দেশে কোন হোটেল, কোন রেস্তোরাঁ ছিল না এবং কোন কারখানা ছিল না, এমন কি কোন পুলিশ বাহিনীও ছিল না। সরকারী ভাবে কোন ইউরোপিয়ান কোম্পানীকে কয়লা ও পেট্রোল উত্তোলনের ঠিকাদারী দেয়া হয়েছিল।[১]

দেশের এ পশ্চাদ্‌গতি, চতুর্দিকের অবস্থা ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের উন্নতির প্রভাব সরকারকে বেশ কিছু সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ করতে বাধ্য করেছে। এর একমাত্র পন্থা ছিলো উন্নত দেশসমূহ হতে সাহায্য গ্রহণ করা। তাই ইয়ামান সরকার রাশিয়া ও গণচীনের সাথে বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করলেন। এ সরকারদ্বয় ইয়ামান সরকারকে বড় রকমের ঋণ দিয়েছিলেন এবং কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার ভার নিলেন। যেমন ১৯৫৮ সালে চীনের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তাতে চীন ইয়ামান সরকারকে ৭০ মিলিয়ন ফ্রাংক সুদবিহীন ঋণ মঞ্জুর করেছে যা নিম্নের পরিকল্পনাসমূহ সম্পন্ন করার জন্য খরচ করা হবে : ১. পাঁচ শ' কিলোমিটারের একটি রাস্তা যা হুদাইদাকে সানআর সঙ্গে মিলিত করবে; ২. কাপড়ের একটি কারখানা স্থাপন; ৩. শুঁটকীর একটি কারখানা স্থাপন; ৪. একটি চিনির কল স্থাপন ও ৫. একটি কাচের কারখানা স্থাপন।[২]

জীবনের পথে দ্রুত গতিতে চলন্ত যাত্রীদল হতে এভাবে দূরে পড়া ও পশ্চাৎমুখিতার (যা কোন বোঝা-পড়া ও চিন্তিত পরিকল্পনা এবং আত্মনির্ভরশীলতা ও দীনী আবেগের কারণে ছিল না, বরং কেবল অলসতা, ভীরুতা ও অজ্ঞতারই ফল ছিল) শেষ ফল এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, এই বন্ধ দরজা ঝঞ্ঝা-বাত্যার প্রবল ধাক্কায় এভাবে বিধ্বস্ত হয়ে খুলে যাবে যে, কে প্রবেশকারী আর কে বাইরে গমনকারী তা জানা যাবে না এবং ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। কারণ

১. আরবী থেকে উর্দূ অনুবাদ। অনুবাদক ড. মুহাম্মদ ইকবাল আনছারী নদভী।

২. আল-ইয়ামান লেখক, আমীন সাঈদ, পৃ. ২৮১।

আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রোত পুরাতন রীতিনীতির সুস্থ, ভাল কর্ম-চিন্তাধারা ও মূল্যবোধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ইয়ামানকে এক সময় ইয়ামানে মায়ামূন অর্থাৎ বরকতের ইয়ামান বলা হতো এবং সে দেশের বাসিন্দাদের ঈমানী শক্তি ও দীনী নিপুণতার সাক্ষ্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজ পবিত্র মুখে আলঙ্কারিক শব্দে প্রকাশ করেছেন :

أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنَ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ ط وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ .

অর্থাৎ "তোমাদের কাছে ইয়ামানের বাসিন্দাগণ আসছেন, যাদের মন খুবই কোমল এবং যাদের স্বভাব খুবই নরম, ঈমান ইয়ামানের অংশ, দীনের বোধ ইয়ামানের বস্তু, জ্ঞান ইয়ামানের অধিকার।"[১]

সেই ইয়ামান মানসিক ও চারিত্রিক বিশৃঙ্খলা ও কম্যুনিজমের কবলে পতিত হবে এবং বিদেশীরা তাদের জীবনের কাঠামো তৈয়ার করবে?

আমি ইয়ামানের এই পরিবর্তনের কথা যা বর্তমানে প্রকাশ পাচ্ছে, ১১ বছর পূর্বে ইয়ামানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সায়্যিদ আব্দুল্লাহ আল উমরীর কাছে (যার সাক্ষাতের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) এ আশংকার কথা প্রকাশ করেছিলাম এবং তাকে সঠিক ও সংযত রাস্তার ইঙ্গিত দিয়েছিলাম, যে রাস্তা থেকে ইয়ামান নিজ বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে উন্নতি করতে পারে এবং অপরিকল্পিত ও দ্রুত গতিতে যে পরিবর্তনসমূহ ধেয়ে আসছে তা হতে রক্ষা পেতে পারে।

১৯৫১ সালে লিখিত আমার ডায়রী হতে কিছু অংশ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে : (৭ই জমাদিউল উলা ১৩৭০ হি. মোতাবেক ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ খ্রী.) অদ্য আমরা ইয়ামানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী মোহম্মদ আব্দুল্লাহ আল উমরীর সঙ্গে কছরুল জাযীরা হোটেলে সাক্ষাৎ করার জন্য যাই। আমি তাকে বললাম, বর্তমানে আরবের অধিকাংশ দেশ কর্তৃত্বহারা হয়েছে। তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার উগ্র জলোচ্ছ্বাসের কবলে পড়েছে। অবশ্য ইয়ামানকে তা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে। কেননা ইয়ামান এখনও নিজ দেশের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। আমি আশা করি, ইয়ামান পাশ্চাত্য সভ্যতা, তার শিক্ষানীতি, জীবনদর্শন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবে না এবং দূরদর্শিতার বিপরীত কোন কাজও করবে না।

১. বুখারী শরীফ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি এভাবে ঝুঁকে পড়বে না যেভাবে পিপাসিত ব্যক্তি পানির প্রতি ঝুঁকে পড়ে অথবা পতঙ্গ আগুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা পাশ্চাত্য সভ্যতা হতে কেবল ঐ অংশ গ্রহণ করবে, যা তাদের জীবনধারা, তাদের ধর্ম, তাদের মন-মেজাজ, তাদের দীনী দাওয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। তারা এর অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসসমূহ ও তার মন্দ হতে হাত গুটিয়ে রাখবে। ইয়ামান এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বহির্জগত হতে দূরে থেকে জীবন যাপন করে আসছে। তাদের এই অনুভূতি ছিল যে, তারা যাত্রীদল হতে বহু পেছনে পড়ে রয়েছে। আমার ভয় হয়, তাদের এই অমনোযোগিতা ও অসমতার ক্ষতি পূরণের জন্য তাদের গতিকে তারা এত তীব্র না করে, যাতে তাদের বার বার হোঁচট্ খেতে হয় অথবা তাদের পথভ্রষ্ট হতে হয়। আর তাদের এমন অবস্থায় পড়তে না হয় যার ক্ষতি পূরণ কখনও সম্ভব নয়।

আমি তাকে বললাম, আমার মতে ইসলামী দেশসমূহে প্রকৃত জীবনের ভিত্তি হলো সাধারণ জনগণের মাঝে সঠিক ও শক্তিশালী দীনী অনুভূতি জাগ্রত থাকা। আর তা ব্যাপক দাওয়াতী প্রোগ্রাম, সর্বসাধারণের সাথে ব্যাপক গণসংযোগ, দীনী প্রশিক্ষণ ও তার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও জ্ঞান সৃষ্টি করা দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে।

দ্বিতীয় শক্তিশালী ভিত্তি হলো, সঠিক শিক্ষা পদ্ধতি। আর তা হল সেই জ্ঞান যা ওহী ও নবুয়ত দ্বারা এসেছে, যা সকল সন্দেহ ও দ্বিধার ঊর্ধ্বে এবং যা প্রতিটি যুগের জ্ঞান, প্রতিটি ভাল সভ্যতা ও ভাল জীবনের ভিত্তি ও উৎস। একে পদার্থ বিজ্ঞান, আধুনিক বিজ্ঞান, যুগের অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতালব্ধ আবিষ্কার ও গবেষণার সাথে একত্র করতে হবে। কারণ পাশ্চাত্য এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে এবং প্রাচ্যের ওপর প্রভাবশালী হয়েছে। আমার আশা যে, ইয়ামান এ দুই শক্তিকে একত্র করার কাজে কৃতকার্য হবে। তখন আমি আশা করতে পারি সমগ্র আরবদেশে, যাকে ইসলামী রাষ্ট্রও বলা যায় না, পাশ্চাত্যও বলা যায় না, এক্ষেত্রে ইয়ামানের একেবারে এক স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য হবে।"[১]

এই প্রকার ও অনুভূতির প্রকাশ জনৈক পাশ্চাত্য বিদ্বান W. Erich Bethmann তাঁর গ্রন্থে (Yemen On The Threshold) করেছেন। গ্রন্থকার ১৯৫৯ সালে ইয়ামান ভ্রমণ করেছিলেন, যখন ইমাম আহমদের আমল ছিল। তিনি

---

১ مذاكرات سائح فى الشرق العربى , কায়রো হতে প্রকাশিত, পৃ. ৭০-৭২।

আধুনিক উন্নতির দরজা বন্ধ রেখেছিলেন। গ্রন্থকার নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিজের আনন্দ ও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন :

বর্তমান যুগের সহজসাধ্য ব্যবস্থা ও আরাম-আয়েসের সামগ্রী হতে বঞ্চিত হওয়া এবং বর্তমান সময়ের জীবন যাপনে বহু প্রয়োজনীয় বলে পরিচিত জিনিসের অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা না রাখা সত্ত্বেও এদেশের (ইয়ামানের) জনগণ তুলনামূলকভাবে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। মরহুম ইমাম ইয়াহইয়া ও বর্তমানে ইমাম আহমদের এই বর্জন নীতি সত্ত্বেও বর্তমান যুগের শক্তিসমূহ ইয়ামানের সহজ-সরলে অভ্যস্ত জীবনে অনেক কিছু পরিবর্তন এনে ফেলবে। ফলে এর ফলাফল অনেক বিপজ্জনক হবে। অবশ্য এই ইমামদ্বয় সর্বদাই এই চেষ্টা করেছেন যে, ইয়ামানের দরজা যথাসম্ভব শক্তভাবে বহির্বিশ্বের জন্য বন্ধ থাকুক। এই কাজে তারা বিশেষভাবে কৃতকার্যও হয়েছেন। কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী থাকার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে।

নতুন যুগ ইয়ামানের দরজায় ধাক্কা মারছে। বিমান, মোটর কার, টেলিফোন ও বিদ্যুতের আলোর প্রবেশ সেখানে ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে এবং অন্যান্য জিনিসও এর পেছনে পেছনে পৌঁছাচ্ছে। এই ধাক্কার প্রতিফলন খুবই শক্তিশালীভাবে অনুভূত হবে। এ সম্পর্কে একটি মধ্যবর্তী কালও আসছে। এ মধ্যবর্তী সময়টি কি কোন ভীষণ রক্তপাত ছাড়া চলে যাবে অথবা কি দেশে রক্তপাত, অশান্তি ও তুমুল ফাসাদ এনে ছাড়বে? এটা বিশেষভাবে এ কথার ওপর নির্ভর করে যে, এই মধ্যবর্তী সময়ে সরকার কোন্ পথ অবলম্বন করছে এবং নতুন ধরনের শাসন ব্যবস্থা (যার ভিত্তি বর্তমান যুগের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয়তার ওপর) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে?

এই মধ্যবর্তী সময়টি খুব ধীর গতিতে হতে হবে এবং এর জন্য খুবই বুদ্ধিমত্তা খাটাবার প্রয়োজন আছে যাতে প্রাথমিক পদক্ষেপ যেন সঠিকভাবে হয় এবং যে পন্থা অবলম্বন করা হয় তা যেন সুষ্ঠু হয়![১]

অতঃপর তিনি ঐ সমস্ত পরিকল্পনা, পরিচালন পদ্ধতি ও নতুন সংশোধনসমূহের আলোচনা করেছেন যা ইয়ামানের উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্য জরুরী এবং তিনি ঐ সমস্ত অভিজ্ঞ লোকের আলোচনা করেছেন যারা দেশের গঠন ও দেশের উন্নতির জন্য সঠিক ও নিঃস্বার্থ পরামর্শ দিতে পারেন। আর তিনি পার্থিব ও আত্মিক

---

১. Yemen on the threshold, পৃ. ৭১।

বিষয়াদির সমন্বয় সাধন ও দেশের যথাযথ উন্নতির চেষ্টা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। অথচ একজন পাশ্চাত্য জ্ঞানী অপেক্ষা একজন মুসলমান প্রাচ্যের চিন্তাবিদ হতে এই ধরনের কথা আশা করা অধিক বাঞ্ছনীয় ছিল, তিনি লিখছেন :

নিঃসন্দেহে ইয়ামান উত্তমরূপে জীবিকা অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, যত্নবান হবে। কেবল পার্থিব উন্নতি মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে পারে না এবং দ্রুত মানুষকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না। যে সমস্ত দেশ পার্থিব ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নতি করেছে, তাদের দৈনন্দিন জীবনে আক্ষেপ ও বিষণ্নতা হতে এর প্রমাণ মেলে। মৌলিক মানবীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে এবং আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষের (যাদের দ্বারা জাতি গঠিত হয়) অন্তরে জীবিত শক্তির মর্যাদা লাভ করলে তখনই জাগতিক উন্নতি এক নিয়ামতরূপে সাব্যস্ত হতে পারে এবং জীবনের প্রতিটি দিক পরিপূর্ণ করতে পারে।

ইয়ামান বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজের মূল্যবান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও পার্থিব উন্নতির মধ্যে স্বাভাবিক পরিমাপে সমন্বয়ে বিধান করতে পারে এবং তা এমনভাবে হবে যা তাদের প্রয়োজনোপযোগী হয়। তবেই তারা আবার আরবের আদন বাগানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর তখনই সেখানে মানুষ শান্তির সাথে বসবাস করতে পারবে। জ্ঞান ও উন্নতির সুন্দর সমন্বয় দ্বারাই ইয়ামান কেবল আরব বিশ্বের জন্য নয়, ইসলামী বিশ্বের জন্যও আদর্শ হতে পারে এবং সমষ্টিগতভাবে জগতের উন্নতিতেও অংশ নিতে পারে।[১]

কিন্তু উক্ত চিন্তানায়ক পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের আশা পূর্ণ হয়নি, সেভাবে ইয়ামানের শুভাকাঙ্ক্ষী মুসলমানদের বাসনাও পূর্ণ হয়নি। ইয়ামান ধারাবাহিকভাবে ঐ সমস্ত বিপ্লবের সম্মুখীন হতে থাকে, যে সমস্ত বিপ্লব তাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই বিপ্লবের পেছনেও কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না। কোন পরিষ্কার উদ্দেশ্যও ছিল না, কোন সুষ্ঠু সংস্কার ও গঠনমূলক স্কিমও ছিল না। তদুপরি এ দ্বারা ইয়ামানের পুরাতন ভাল ভাল ঐতিহ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়নি এবং একে ইসলামী জগতে ও আরব জগতে খুব উচ্চ স্থান দেবার আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাবও তথায় বিদ্যমান ছিল না। বরং পশ্চাৎপদ ও দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের অবস্থা বারবার নানা পরিবর্তন দ্বারা আরও দুর্বল হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ সহানুভূতি কারও ছিল না। এ সমস্ত আন্দোলন ব্যক্তিগত, বংশীয় ও দলীয়করণ

১. Yemen on the threshold, পৃ. ৭৪।

উদ্দেশ্যের ফল ছিল। ফলে তা সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণীও করা যেতে পারে না যে, এর কর্মতৎপরতা শেষ হয়ে যাবে। এ কারণেই ইয়ামান এখনও এক ক্রান্তিকাল অতিবাহিত করছে। এখন এর ভ্রমণের দিক অজ্ঞাত এবং এর মর্মাল অনির্দিষ্ট।

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইয়ামানের শাসক ইমাম আহমদের ইন্তিকাল হয়। তার পুত্র ইমাম বদর তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি তার পিতার আমলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করেছেন, ইউরোপে বারবার ভ্রমণ করেছেন। পৃথিবীর নতুন পরিবর্তনসমূহ স্বচক্ষে দেখেছেন। পরিবর্তনের অবস্থা অন্যের তুলনায় তার অধিক জানা থাকার কথা। কিন্তু তার ক্ষমতা এক সপ্তাহের বেশি ছিল না। ইতিহাস তার কার্যকলাপ দেখার সময় পায়নি। তার সেনাবাহিনীর প্রধান আব্দুল্লাহ সালাল মিসরের বিপ্লবী সরকারের নেতা জামাল আব্দুন নাসেরের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্রোহ করেন। কারণ মিশরের বিপ্লবী সরকার তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । সুতরাং ইয়ামানের নতুন সরকার মিশরের জামাল আব্দুন নাসেরের আধুনিকতা ও কম্যুনিস্ট নীতি গ্রহণ করলেন। ইয়ামানে খুব দ্রুত গতিতে পরির্বতন আনতে চেষ্টা করলেন। এই পরিবর্তন ধর্মহীনতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অতএব, নতুন সরকারের প্রভাব ইয়ামানী রাজ্যের যে সমস্ত অঞ্চল ও যে সমস্ত শ্রেণীর ওপর ছিল তাদের মধ্যে আধুনিক ও ধর্মহীন সামাজিক রীতিনীতি খুব তীব্রভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। এটা শহরের বাসিন্দাদের ওপরই বেশি প্রকাশ পেল। গ্রামের লোকজন নিজেদের পুরাতন নেতাদের প্রভাবে নতুন সরকারের কাছে নতি স্বীকার করেনি এবং নিজেদের জীবনেও পরিবর্তন গ্রহণ করেনি। ফলে ইয়ামানে দু'টি দল হয়েছে। এক বিপ্লবী দল যার রজ্জু আধুনিক বস্তুবাদী মনোভাবধারী নেতাদের হাতে ছিল এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা মিসরের জামাল আব্দুন নাসের করতেন। দ্বিতীয় দল প্রাচীন মনোভাব গ্রহণকারীদের দল, যাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইমাম বদরের প্রতি সহানুভূতিশীল সউদী শাসক। দু'দলের মধ্যে মানসিক ও সামরিক দ্বন্দ্ব বহু বছর ধরে চলছিল।

এই দ্বন্দ্বের কারণে দেশে অধঃপতন ও ধ্বংস নেমে আসে। বিপ্লবী সরকারের দখল যেখানে ছিল সেখানে ইসলামী বিশেষত্বের ও মাহাত্ম্যের ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু দেশে সামাজিক পর্যায়ে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। নাগরিক জীবনে কিছু সংশোধন

ও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এ কথা সত্য যে, নতুন ও পুরাতনের মধ্যে কোন সুষ্ঠ বোঝা-পড়া হয়নি। প্রগতিবাদীরা ক্ষমতায় থাকায় তাদের শক্তি ও প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এই দল দেশের জীবনকে কেবল খাঁটি ধর্মহীনতায়ই নয়, বরং নাস্তিকতার রঙে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করছিল। অন্যদিকে কিছু অজ্ঞ জনসাধারণ ও তাদের ধর্মীয় ও পুরাতন সরকারী নেতাদের দল যাদের শিক্ষা-দীক্ষা পুরাতন মাদ্রাসা ও মকতবে হয়েছিল। তারা নতুন যুগের বিপদসমূহ ও তার বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে ও তার মুকাবিলার জন্য সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মনযোগী হতে সক্ষম হয়নি।

তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য তালিকা ও শিক্ষানীতি এমন ছিল যে, তা দ্বারা যোগ্য লোক তৈরি করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। যারা যুগের আপদ-বিপদে সময়মত পরিচিতি লাভ করে তার মুকাবিলার জন্য কার্যকর পন্থা গ্রহণ করতে পারে। অতএব, এই সমস্ত লোক যেই মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার ধারক-বাহক ছিলেন, তারা দ্রুত জাতীয় জীবনে স্বীয় প্রভাব ও মর্যাদা হারাতে থাকে।

ইয়ামানের দক্ষিণে আদন, হাযারামৌতের এলাকা অবস্থিত। এই এলাকা অনেক দিন যাবত ইংরেজদের অধীনে ছিল। অতএব, ইংরেজদের আমল হতে সেখানে দু'টি দল ছিল। স্বাধীনতা পাওয়ার পর সেখানে ছোট ছোট সতেরটি রাষ্ট্র একত্র হয়ে দক্ষিণ ইয়ামান নামে অভিহিত হয়েছে এবং ঐ এলাকা ইংরেজদের প্রভাবে নতুন সামাজিক ব্যবস্থায় উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে।

১৯৬৭ সালের আগস্ট মাস হতে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চরমপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বারা বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফলে তাদের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ এ এলাকায় পুরাতন ঐতিহ্য ও পুরাতন জীবন পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এভাবে এই ইসলামী এলাকা নতুন কার্যকলাপের ফলে শীঘ্র এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সেখানে কেবল কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশ্যে নাস্তিকতার প্রভাব দৃষ্ট হয়, দীনের মৌলিক বিষয়াদির প্রতি বিদ্রূপ করা হয়, ধর্মীয় মূল্যবোধসমূহকে সমূলে উৎখাত করানোর চেষ্টা চলে। ইসলামী জীবন মুছে ফেলার উদ্দেশে ঐ সমস্ত কাজকর্ম হতে থাকে যা পৃথিবীর অমুসলিম দেশসমূহেও সাধারণত এভাবে হয় না। আর এই কাজ কম্যুনিস্ট খেয়ালী নেতাদের দ্বারা হতে থাকে, যাদের সংখ্যা দেশে খুবই কম। কিন্তু সৈন্য ও শক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে তাদের প্রভাব বহু গভীরে পৌঁছে গেছে।

আসল ইয়ামান বর্তমানে গণ-ইয়ামান নামে পরিচিত। সেখানে উল্লিখিত সমস্যা সৌদি সরকারের আর্থিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার ফলে পরিমাণে কিছু

কম। কিন্তু দক্ষিণ এলাকা যা আদন ও হাযারামৌতকে নিয়ে গঠিত যাকে ডেমোক্রেটিক ইয়ামান বলা হয়, সেখানে উল্লিখিত অবস্থা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। সেখানের সরকার ও নেতারা রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখে এবং তাদের কাছ থেকে সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ করেন।

মুসলিম বিশ্বে বিপ্লব ও বিদ্রোহের আসল কারণ

খাঁটি দীনী অনুভূতি (যা ইসলামী শিক্ষাদীক্ষার অপরিহার্য ফল) এই সমস্ত অবস্থার সংশোধন ও পছন্দসই পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট কার্যকর ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা নিজ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা অতিশয়োক্তি ও উচ্চ অভিপ্রায়ের সঙ্গে স্বাধীনতা ও সাম্যের ডাক উচ্চ স্বরে দিচ্ছে এবং পুরাতন জীবন পদ্ধতি ও পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে বদলাবার চেষ্টায় আছে (তা যে কোন ধরনেরই হোক)। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সমাজে এক অশান্তি ও অসন্তুষ্টির সঞ্চার হয়েছে। এই সকল অবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে ঘৃণা, অসন্তুষ্টি ও বিদ্রোহের অগ্নিকণা প্রজ্বলিত হয়েছে। এর ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না রেখেই এই আগুন তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে। মুসলিম দেশসমূহে সব সময়ে সামরিক বিদ্রোহ ও বিপ্লব দেখা যায়, এর একমাত্র কারণ এই অশান্তি ও অসন্তুষ্টি।

সম্ভবত মুসলিম বিশ্বে এই সমস্ত বিপ্লবের আশংকা অন্যান্য দেশের তুলনায় এই কারণেই বেশি যে, মুসলিম দেশগুলোতে হাজার হাজার দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও দীনের বোধ ও অনুভূতি থাকেই, যা প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও অবস্থার সংশোধনের জন্য কার্যকর প্রচেষ্টা চালাতে মানুষকে কোন না কোন সময় উদ্বুদ্ধ করে এবং মানুষ ভুল বা ঠিক পন্থায় প্রচলিত অবস্থা হতে নিজেকে মুক্তি দেয়।

যা হোক, যে পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোন অংশে সাধারণ পশ্চাদ্‌গতি ও দুর্বলতা পাওয়া যাবে, সে পর্যন্ত এর কোন কোন শ্রেণীর লোকের দরিদ্রতা ও অর্থনৈতিক অনটনের এই অবস্থা থাকবে এভাবে যে, লক্ষ লক্ষ লোকের একবেলা খাবার জুটবে না এবং পরার জন্য কাপড় পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে এক শ্রেণীর মধ্যে অজস্র ও সীমাতিরিক্ত ধন মওজুদ করা, অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা এবং জনগণের সম্পদ নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করার প্রবণতা নির্বুদ্ধিতা ও পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। আর আমীর ও ধনীদের আরাম-আয়েশের কথা ও তাদের পাপাচার ও অসদাচরণের লজ্জাজনক কাহিনী গল্পের সৌন্দর্য বাড়াবে এবং সভা-সমিতিতে মধুর আলোচনার বিষয় হবে।

অন্যদিকে অজ্ঞতা ও অশিক্ষিতের হার সাধারণ অবস্থায় পরিণত হবে, জনসাধারণের অধিকাংশ শিক্ষা হতে বঞ্চিত থাকবে এবং মুসলিম বিশ্বের (যার বড় অংশ প্রাচ্যে অবস্থিত) অথবা তার কোন অংশে ঐ অবস্থা স্থায়ীভাবে বিরাজ করবে যার ছবি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তুরস্কের প্রসিদ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদ কবি ও সাহিত্যিক মুহাম্মদ আকিফ খুব সুন্দরভাবে অংকন করেছেন। সুতরাং এরূপ বেদনাদায়ক অবস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন লোকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাই যুক্তিসংগত। মুহাম্মদ আকিফ তার এক কবিতায় লিখেছেন :

মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি এতদিন প্রাচ্যে ভ্রমণ করেছ, তুমি ওখানে কি দেখেছ? আমি কি বলব, কি দেখেছি? আমি : এদিক হতে ওদিক পর্যন্ত বিধ্বস্ত গ্রাম দেখেছি, আরও দেখেছি সম্পদহীন জাতিসমূহ, ভাঙ্গা পুলসমূহ, শুষ্ক নদীসমূহ, জনমানবহীন রাস্তাসমূহ, কুঞ্চিত মুখমণ্ডল, নত হওয়া কোমর, সংজ্ঞাহীন মস্তিষ্ক, অনুভূতিবিহীন মন, বক্র জ্ঞান। আরও দেখেছি অত্যাচার, দাসত্ব, জীর্ণশীর্ণ অবস্থা, কপটতা, কৃত্রিমতা, ঘৃণার যোগ্য পাপসমূহ, বিভিন্ন প্রকারের রোগ, বিরান জঙ্গল, ঠাণ্ডা চুল্লী, অনাবাদী ক্ষেত, অপরিষ্কার শরীর, অকর্ম হাত-পা। আরো দেখেছি জামাতবিহীন ইমাম, ভাই ভাইয়ের শত্রু, দিন দেখেছি, যার কোন উদ্দেশ্য নেই, রাত দেখেছি যার কোন ভোর নেই।[১]

যতদিন এই সমস্ত দেশের আলিম সমাজ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাদের দীনী ফরয আদায় করা এবং অভিজাত ও ধনীদের সম্মুখে সত্য কথা বলা হতে বিরত থাকবেন, পদ ও মর্যাদার জন্য অথবা গুরুত্ববিহীন বিষয়সমূহ নিয়ে ঝগড়া করা ও শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া তাদের রীতিনীতি হবে, যতদিন দীনের শিক্ষামত কার্যাদি পরিচালিত হবে না, যতদিন তারা জাগতিক লিপ্সা পরিত্যাগ করবে না, আল্লাহর ভয়-ভীতি, আত্মমর্যাদা, চারিত্রিক ও ধর্মীয় নির্ভীকতার কার্যকর দৃষ্টান্তসমূহ প্রায় লুপ্ত থাকবে, যতদিন বিরোধী প্রচারণা, বিরোধী আন্দোলন ও বিরোধী চিন্তাধারা ইসলামী সমাজে কোন সময় গোপনে, কোন সময় প্রকাশ্যে প্রবেশ করতে থাকবে এবং তা ইসলামী বিশ্বে কাজ করবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করবে, সেখানকার সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক অবস্থাসমূহ তাকে সাহায্য করবে এবং তার উদ্দেশ্যকে শক্তি যোগাবে, এই স্বাভাবিক ও অনৈসলামী অবস্থা এই ইসলামী দেশসমূহে স্থায়ী থাকবে ততদিন এ সকল দেশ চারিত্রিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় পতিত হবে এবং রাজনৈতিক

---

১. তুর্কি মেঁ মাশরিক ও মাগরিব কি কাশমাকাশ, পৃ. ১৯৩। ترکی میں مشرق ومغرب کی کشمکش

বিপ্লব ও সামরিক বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত থাকবে। এই সমস্ত দেশ আগ্নেয়গিরির মুখে দাঁড়িয়ে আছে, যে কোন সময় তা ফেটে পড়তে পারে।

এ অবস্থার প্রতিকার

এ অবস্থাকে কোন সামরিক শক্তি, কোন প্রকারের শাস্তি, শাসন, কোন নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন বাধা দিতে পারে না। অনুরূপভাবে সাংবাদিকতা ও রেডিও'র প্রচারণাও এতে পরিবর্তন আনতে পারে না। ধন-সম্পদ দ্বারা বিবেক ক্রয় করা হচ্ছে। বিদেশী দূতাবাস লৌকিকতাপূর্ণ ও জাঁকজমকে সজ্জিত উৎসব পালন করছে। ধর্মীয় লোকদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আন্তর্জাতিক ইসলামী কনফারেন্স ও সেমিনারে কতক পরিকল্পনা করা হচ্ছে যা দ্বারা এই সমস্ত দেশের ইসলাম প্রীতির কথা সময় সময় প্রকাশ করা হয়। এ সকল সীমাবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও দীনী কিছু ভাব প্রদর্শন এ বিপ্লব ও বিদ্রোহের রাস্তা বন্ধ করতে পারে না। এর একমাত্র পথ হলো যে, বাস্তবতা ও প্রকৃত ঘটনাকে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতা এবং খাঁটি দীনী রূহ ও দীনী অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে মুকাবিলা করতে হবে।

তদুপরি দেশে দীনের খাঁটি শিক্ষা মোতাবেক ব্যাপকভাবে প্রকৃত ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য সততা ও আন্তরিকতার সাথে চেষ্টার সূচনা করতে হবে। যে সমস্ত জিনিসকে উৎখাত করা এবং যে সমস্ত স্কীম আরম্ভ করার প্রয়োজন তা আরম্ভ করতে যেন কালবিলম্ব করা না হয়, ইসলাম, কুরআন ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোকে ও ইসলামী আইন মোতাবেক সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনসাধারণের সুখ-শান্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকের জন্য সাধ্যানুযায়ী জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। অতিরিক্ত খরচ ও সীমাহীন অপব্যয় বন্ধ করতে হবে। কারণ তা জনসাধারণের আসল প্রয়োজনকে পূর্ণ করতে দেয় না। ধনী ও অর্থশালী ব্যক্তিদের মধ্যে ত্যাগের শক্তি সৃষ্টি করতে হবে এবং নিজ দরকারী খরচ ব্যতীত অতিরিক্ত সম্পদ জনকল্যাণে ব্যয়ে উৎসাহিত করতে হবে এবং يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ، قُلِ الْعَفْوَ অর্থাৎ "হে নবী! আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছে, জনকল্যাণে কি পরিমাণ খরচ করতে হবে? আপনি জবাবে বলুন, নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর।"

এই আদেশের ওপর আমল করার আগ্রহ পয়দা করতে হবে এবং গরীবদের মধ্যে উৎকণ্ঠাহীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে তাদের নিজ পরিশ্রম, মেহনত ও

যোগ্যতা দ্বারা তারা যেন নিজেদের জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী অর্জনে সক্ষম হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুনভাবে এরূপ স্টাইলে সাজাতে হবে যে, তা ইসলামী আকাইদ ও ইসলামের মূলনীতি ও আধুনিক যুগের পরিবর্তন, জ্ঞান ও উপায়ের উপকরণের সাথে সমন্বিত হয় এবং উভয়ের চাহিদা পূর্ণ করে। নতুন বংশধরের মধ্যে একদিকে ঈমান, বিশ্বাস, সৎ স্বভাবের শক্তি, নিজ ধর্মকর্মে স্থায়ী থাকা, আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান, নিজ দীনের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং এর জন্য কুরবানী বা আত্মত্যাগের প্রেরণা থাকতে হবে। অপরদিকে নতুন আবিষ্কারের ক্ষমতা, স্বাধীন চিন্তা, উচ্চ সাহস ও দৃঢ় ইচ্ছা সৃষ্টি করতে হবে। সাহস ও মনোবলের সাথে পাশ্চাত্যের মুকাবিলা করতে পারে এমন যোগ্যতা ও গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে।

এ মানসিক অস্থিরতা ও বিদ্রোহ হতে বাঁচার জন্য জনসাধারণের মধ্যে দীনী প্রাণশক্তি, শক্তিশালী ঈমান, চারিত্রিক অনুভূতি, ইসলামী বিচক্ষণতা সৃষ্টি করতে হবে। এই মানসিক অস্থিরতা, হৃদয়হীনতা ও বিদ্রোহের মূল উৎস তথা উৎপত্তি দূর করার জন্য এর কারণ ও এর উৎসমূল উৎপাটনের জন্য ব্যাপক সংশোধনের দরকার এবং চরিত্র ও কর্মের মধ্যে পরিবর্তনের প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশসমূহ হতে ঐ সমস্ত বস্তু গ্রহণ করতে হবে যা ইসলামী দেশসমূহ ও ইসলামী সমাজের জন্য উপকারী হয়। তা আকীদার বিপরীত না হয় এবং তা নিজ স্থানে কার্যকরভাবে প্রয়োজনীয় উপকার করার ক্ষমতা রাখে, জাতি ও দেশকে শক্তিশালী করার সামর্থ্য রাখে। জীবনের উন্নতি, আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতের উদ্দেশে সহায়ক হয়।

একমাত্র রাস্তা

প্রাচ্যেরা মুসলিম দেশগুলোতে শান্তি স্থাপনের জন্য ও মুসলিম জাতিসমূহকে নিজের আকীদা ও ইসলামী জীবনের ওপর স্থায়ী রাখার জন্য বর্তমানে এ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। বিশুদ্ধ চিন্তা ও বুদ্ধির সিদ্ধান্ত এই, মুসলিম বিশ্বে প্রকৃতপক্ষে এমন এক উন্নত দৃষ্টিসম্পন্ন ইসলামী সমাজ স্থাপনের প্রয়োজন আছে, যাতে ইসলামী জীবনের নিয়ম-পদ্ধতি ও বাস্তবসম্মত সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার পূর্ণ সুযোগ থাকবে।[১]

---

১. এ মন্তব্যটি মুহাম্মদ আসাদ-এর ROAD TO MECCA হতে গৃহীত।

মুসলিম বিশ্বে আধুনিকতা, পাশ্চাত্য আন্দোলন, তার প্রবর্তক ও সমলোচনাকারী :

দ্বিতীয় অবস্থান

দ্বিতীয় পন্থা হলো পাশ্চাত্যের কাছে পরাজিত হওয়া ও পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। একজন ভক্ত ও আবেগপূর্ণ অনুসরণকারীর ন্যায়, যাকে তুলনা করা যায় একজন বুদ্ধিমান ও গুরুভক্ত ছাত্রের সাথে, যে এখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। এর প্রকাশ এভাবে ঘটে যে, মুসলিম বিশ্বের কোন অংশ এই জড়বাদী ও যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে এবং নিজ বিশেষ মেজায ও মনোভাবধারী সভ্যতাকে যেভাবে আছে সেইভাবে গ্রহণ করে নেয়। এর সমস্ত মৌলিক আকীদা, চিন্তার ঝোঁক, জড়বাদী চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিকে কবুল করে নেয় (যা মুসলিম বিশ্বের পরিবেশ হতে বহু দূরে, ভিন্ন অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐ অবস্থায় বিকশিত ও প্রতিপালিত হয়েছে)। আবার নিজ দেশে একে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে চায় এবং তার জন্য প্রতি প্রকারের ত্যাগ ও কুরবানী উৎসর্গ করতে ও এর জন্য আধ্যাত্মিক মূল্য আদায় করতে প্রস্তুত হয়।

তুরস্ককে পাশ্চাত্য বানাবার চেষ্টা ও তার কারণ

এ পদ্ধতির চিন্তা-চেতনা এই কর্মপন্থার সর্বপ্রথম পরীক্ষা তুরস্কে করা হয়েছে। তুরস্কের এই প্রবণতা বেশ কিছু স্বাভাবিক ক্রিয়া ও দীর্ঘ ইতিহাসের ফল ছিল। তুরস্ক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোন প্রস্তুতি ছাড়া ও দুশমনের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সামরিক বিদ্যা ও শিল্পে উন্নতি লাভ করা ছাড়া ইউরোপের মুকাবিলা করেছিল। ইউরোপ হতে উপকারী জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রয়োজনীয়, সামরিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা এবং দেশকে আধুনিক পদ্ধতিতে পুনঃগঠন করার মত জরুরী বিষয়ে অলসতা ও অবহেলা করেছিল। তদুপরি তখনকার আলিম ও দীনী পথ প্রদর্শকগণ দেশ ও জাতিকে জ্ঞান ও সৎ চিন্তার পথ প্রদর্শনে কোন বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার প্রমাণ দেয়নি, যা তাদের পদমর্যাদা হিসেবে তাদের কাছ থেকে আশা করা হয়েছিল। তারা ঐ সমস্ত ভিনদেশী মত ও পথ যা দেশে দ্রুত প্রবেশ করছিল তারও বাধা দিতে পারেনি। অবশ্য বিদেশ হতে আমদানীকৃত বস্তুসমূহের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় স্বাভাবিক ছিল এবং প্রবেশের অধিকার ছিল। কিন্তু তারা ভাল, মন্দ, উপকারী ও অনুপকারী বস্তুর মধ্যে প্রভেদ

করতে পারেনি এবং জ্ঞান ও চিন্তার ঐ সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়ে গিয়েছেন, যে সীমান্তে জ্ঞানের যাত্রীদল অষ্টাদশ শতাব্দীতে চলেছিল।[১]

তদুপরি তুরস্কের শেষ বাদশাহগণ ধর্ম ও খিলাফতকে নিজ খেয়াল খুশিমত ও ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। দেশের পশ্চাৎগতি, সামরিক ব্যবস্থার অবনতি, বার বার পরাজয় ও অপমানজনক অকৃতকার্যতার ব্যাপারে এই বাদশাহদেরও কোন কোন সময় হাত থাকত। আবার কোন কোন সময় ঐ সকল বাদশাহ, তাদের মন্ত্রীবর্গ ও পারিষদগণ শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে জাতিকে বিক্রি করতেও দ্বিধাবোধ করত না। এই সমস্ত ঘটনা যদিও ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপারে ছিল, কিন্তু গোপনীয় ছিল না। ফলে তা যুবকদের অসন্তুষ্টি ও বিরাগের কারণ ঘটিয়েছিল।

কঠিন ও নাজুক পরিস্থিতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে তুরস্ক যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, তা স্বভাবজাত ও স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও একটি ইসলামী দেশের জন্য এই ধরনের অবস্থা প্রথম পরীক্ষার বিষয় ছিল। ইসলামী সমাজকে ইতিপূর্বে দু' ধরনের পরীক্ষা অতিক্রম করতে হয়েছিল। প্রথম পরীক্ষা হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মুসলিম সমাজের ওপর উপস্থিত হয়েছিল। তখন মুসলিম সমাজ শক্তিশালী, সতেজ ও জীবন উন্নতির যোগ্যতায় পরিপূর্ণ ছিল। তার ছিল বিজয়ী শক্তির মর্যাদা। তার বিপরীত দু'টি পুরাতন ও বৃহৎ সভ্যতা ছিল। একটি পাশ্চাত্য রোমান ও গ্রীসের সভ্যতা, দ্বিতীয়ত প্রাচ্যের পারস্য দেশের ইরানী সভ্যতা। এই উভয় সভ্যতা ছিল পুরাতন জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, উন্নত সমাজ ব্যবস্থা, সাহিত্য ও দার্শনিক নীতিসমূহের ভাণ্ডার এবং সামাজিকতার ক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতির ধারক-বাহক।

ইসলামী জগত, যা ছিল প্রতি প্রকারের হীনতা, নীচুতার অনুভূতি হতে সুরক্ষিত এবং আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্বাসের সমুদ্র দ্বারা পরিপূর্ণ, তা কোন প্রকারের দাসসুলভ মনোভাব ও ভয়-ভীতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ছাড়াই নিজের প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী ঐ সমস্ত ভাণ্ডার হতে প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করতে লাগল। তারা যা উপযোগী মনে করেছে তা সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছে। আর যা অনুপযোগী মনে করেছে তাকে নিজের ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছে। অতঃপর তাকে যথার্থ জায়গায় ফিট করেছে। স্বাধীন ও প্রভাবশালী হওয়ার দরুন এই গ্রহণ তাদের সামাজিকতার প্রাণ এবং এর চারিত্রিক রীতি ও বৈশিষ্ট্যের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

---

১. বিস্তারিত লেখকের 'বিশ্ব কি হারালো' দেখা যেতে পারে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা এই ইসলামী সামাজিকতার ওপর হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে এসেছিল, যখন তাতারীরা মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় অংশের ওপর অধিকার স্থাপন করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান তাদের কাছে পরাজিত হয় এবং তাদের অধীনস্থ হয়। কিন্তু এই বিজেতা জাতির ব্যাপার ছিল এই যে, তারা সভ্যতা ও সামাজিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আইন ও সংবিধানের ক্ষেত্রে অতি নিম্ন পর্যায়ে ছিল। তাদের কোন সভ্যতা ছিল না। জীবনের কোন দর্শন ছিল না, সভ্যতা, সামাজিকতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে তারা প্রাথমিক স্তরে ছিল না, যা মরুবাসী ও যুদ্ধপ্রিয় জাতির হয়। এর ফলে বিজেতা জাতির সভ্যতা, সামাজিকতা, জীবনদর্শন ও চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার বা উপকৃত হওয়ার প্রকৃতপক্ষে কোন সম্ভাবনা ছিল না। এর বিপরীত বিজেতা জাতি ধীরে ধীরে পরাজিত জাতির সভ্যতা, সামাজিকতা, জীবনদর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, উন্নত জীবন পদ্ধতি, শ্রেষ্ঠ দীনী আকীদা ও দীনী ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত জাতির দীন ও সভ্যতাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নেয় এবং তাদের ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় অর্থাৎ মুসলমান হয়ে হারাম শরীফের রক্ষক ও ইসলামের উৎসাহী পতাকাধারী ও পাহারাদার সেজে যায়।

কিন্তু খ্রীস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় তুরস্কের উছমানী খেলাফতের যে অবস্থার সাথে মুকাবিলা করতে হয়েছিল, তা পূর্বের ওই দু' অবস্থা থেকে ভিন্নতর ছিল। তারা যদিও একটি স্বাধীন ও এর রাজত্বের মালিক ছিলেন, কিন্তু কালের গতির সঙ্গে তাদের আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের মৌলিক গুণ বহু পরিমাণে হারিয়ে ফেলেছিল। তাদের মধ্যে প্রথম যুগের উৎস ছিল না এবং ঈমান ও বিশ্বাসের ঐ শক্তিও ছিল না। এর বিপরীত পাশ্চাত্য সভ্যতা নতুন জীবন, নতুন শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং নতুন উদ্যম ও উচ্ছ্বাস দ্বারা মত্ত ছিল। ঐ সভ্যতা নিজের দেশে শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তায় এমন একটি পরিবর্তন এনেছিল যার সীমা দিন দিন অতিশয় প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছিল এবং যা হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা তুরস্কের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তুর্কী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ইউরোপের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল।

এই পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এবং তা হতে জয়যুক্ত হয়ে বের হওয়ার জন্য তাদের পথ প্রদর্শনের উপায় পূর্বের ইসলামী ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। আবার বর্তমান মুসলিম বিশ্বেও ছিল না। কারণ তুর্কিতেই এর প্রথম পরীক্ষা শুরু হয়, বরং এ ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্ব তুরস্কের দিকে তাকিয়ে ছিল যে,

তারা এই সম্পর্কে কোন্ পন্থা অবলম্বন করছে এবং মুসলিম দেশসমূহকে কি পথ প্রদর্শন করে? এ সঙ্কটময় ও কঠিন পরীক্ষা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার গভীর অভিজ্ঞতা ও বহু বড় সাহসিকতার প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা এক মুজতাহিদের কাজ ছিল যা তুরস্ককে বাধ্য হয়ে সম্পন্ন করতে হয়েছিল। যে ব্যাপারে সমস্ত মুসলিম বিশ্ব তার অনুসরণ করতে প্রস্তুত ছিল। এই কাজের সম্পূর্ণতার ওপর মুসলিম বিশ্বের সভ্যতা ও চিন্তা এবং কিয়ৎ পরিমাণ দীনী ও রাজনৈতিক ভবিষ্যতও নির্ভর করছিল। এই প্রয়োজনকে মুলতবিও রাখা যায় না, সহজভাবে ওখান হতে অতিক্রমও করা যায় না। এর জন্য কোন অবকাশও নেয়া যেতে পারে না। এটা একটা বাধ্যতামূলক দায়-দায়িত্ব ছিল, যা যত সত্বর সম্ভব আদায় হওয়া উচিত ছিল এবং প্রতিটি বিষয়ের ওপর এটাকে প্রাধান্য দেয়ার প্রয়োজন ছিল।

নতুন ও পুরানো দল

এই ফরযিয়াতকে (অবশ্য করণীয় কর্তব্য) সম্পূর্ণ করার জন্য তুরস্কের দুই দলের দিকে দৃষ্টি পড়ে। একদল পুরাতন আলিমদের দল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই দল নতুন চাহিদা, নতুন পরিবর্তন ও এই বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, যা ইউরোপের প্রসারিত শক্তি তুর্কীদের জন্য সৃষ্টি করেছিল। এই দলটি বাদশাহ তৃতীয় সলীম (১৭৮৯-১৮০৭ খৃ.) ও তার স্থলাভিষিক্ত সুলতান মাহমুদ (১৮০৮-১৮৩৯ খৃ.)-এর নতুন সামরিক ব্যবস্থা ও নতুন সংস্কারেরও বিরুদ্ধাচরণ করেছিল যা তাঁরা তুরস্ককে সামরিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপের অর্জিত শক্তিসমূহের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবার জন্য চালু করেছিল।

নতুন প্রজন্মের অবস্থা সম্বন্ধে বলা যায় যে, (যারা প্যারিস, বার্লিন ও লন্ডন অথবা নিজ দেশের কোন আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছিল), তাদের ক্রমবিকাশ হয়েছিল দীনের প্রতি অকল্পনীয় উদাসীনতা ও দীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্য, দীনদার লোকের প্রতি অবজ্ঞা, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সীমাহীন পবিত্র মনে করা, একে ভক্তি করা, বস্তুর প্রতি অধিক মনোযোগ পোষণ করা এবং পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার সম্মুখে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যম। এই প্রজন্মের কাছে ভাবনার প্রবণতা ছিল কিন্তু চিন্তাধারার মাঝে গভীরতা, স্বচ্ছতার অভাব ছিল, যা দ্বারা পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের ওপর সমালোচনা করতে পারত এবং অনুভব করতে পারত যে, তাদের মধ্যে দুর্বল অংশ কোন্‌টি, আর কোন্ স্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণের চাইতেও কম কাজ করা হয়েছে।

কোন জিনিস তুরস্কের জন্য কল্যাণকর এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া, তা গ্রহণ শুধু বৈধ নয়, বরং দরকারী। কোন জিনিস তাদের স্বভাব ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জগতে তাদের স্থান ও কর্মের মিল রাখে না এবং তাদের উচ্চ মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়।

এই প্রজন্মের নেতৃত্ব অধিকভাবে ঐ সমস্ত শিক্ষক অথবা সামরিক বাহিনীর হস্তে ন্যস্ত ছিল, যাদের সাংস্কৃতিক চেতনা প্রশস্ত ছিল না, গভীরও ছিল না, স্বাধীনও ছিল না। অথবা ঐ সমস্ত লোকের হস্তে ছিল এবং তারা ছিল যাদের নিকট জীবনের কতক বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল এবং তারা আলিম ও প্রাচীনপন্থীদের অমনোযোগিতা, জড়তা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, পুরাতন বংশধর ও তাদের পরিচালকদের মধ্যে কপটতা, কথা ও কর্মের মধ্যে বৈপরীত্যের অভিজ্ঞতা, দেশের অধঃপতন, পশ্চাদ্গতির সাধারণ দৃশ্যের পর্যবেক্ষণ, প্রতিটি পুরাতন বস্তু ও তৎকালীন সকল রীতিনীতি হতে বিরাগভাজন ও বিদ্রোহী বানিয়েছিল এবং তুরস্ককে অতি শীঘ্র পাশ্চাত্য বানিয়ে দেবার কাজে প্রস্তুত করেছিল।[১]

অনুবাদ প্রচারিত

জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া, দিল্লী।

---

১. তুরস্কের প্রসিদ্ধ জ্ঞানী খালেদা আদীব খানম তার তুরস্কে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব' নামক গ্রন্থে আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ ও তরক্কির সদস্যবৃন্দের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন :

ইত্তেহাদ ও তরক্কির পথে অগ্রসর যুবকগণ ছোট পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী ছিল অথবা সেনাবাহিনীর অফিসার ছিল। তাদের একজনও এমন ছিল না, যে উচ্চ জ্ঞানের যোগ্যতা রাখে এবং মিশ্রণ ও সমালোচনার সঙ্গে কাজ করে অতীত ও বর্তমান যুগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। কিন্তু এই সব মানুষ জনসাধারণের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল এবং খাঁটি দেশী সন্তান ছিল। তাদের অধিকাংশ মকদোনিয়ার অধিবাসী ছিল যারা বাস্তববাদী ও নির্দয় হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল এবং নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সব কিছু করত; এই কারণে যদিও তারা মহৎ উদ্দেশ্য রাখত কিন্তু সর্ব প্রকারের উপায় উপকরণ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করত।

যিয়াগোক আলপ ও তার মতবাদ

চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তুরস্ক যিয়াগোক আলপের মত একজন লোক পেয়েছিল, যিনি উচ্চ অভিপ্রায় ও উৎসাহের সঙ্গে তুরস্ককে নিজ অতীত হতে পৃথক করে এবং খাঁটি জাতীয়তা ও বস্তুবাদী ভিত্তির ওপর নতুন আকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করার দাওয়াত দিয়েছিলেন।

যিয়াগোক আলপ বকর প্রদেশে ১৮৭৫ বা ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশাবলী রাষ্ট্রের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামরিক ও মাধ্যমিক স্কুলের পরে তিনি দিয়ার বকর প্রদেশের মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন। সাহিত্য ও গণিতশাস্ত্রে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইতিহাসেও বিশেষ অভিজ্ঞতা রাখতেন। তিনি স্কুল জীবন থেকেই ফরাসী ভাষা ও প্রাচ্যের বিষয়সমূহ শিক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। তার পণ্ডিত চাচার কাছ থেকে ইসলামের চিন্তাবিদ, যথা: ইমাম গায্যালী, মাওলানা রুমি, ইবন আরাবী, ইবন রুশদ, ইবন সীনা ও ফারাবীর পুস্তকাদি পাঠ করতে লাগলেন। তিনি ইমাম গাযযালীর লিখিত (المنقذ من الضلال) কিতাব দ্বারা বেশি প্রভাবিত হোন। কারণ তিনিও মানসিক দ্বন্দ্বে পড়েছিলেন। এটা সে কালের ঘটনা যেকালে ফরাসী বিপ্লবের চিন্তা ও কল্পনা তুরস্কের নতুন বংশের রক্তের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করছিল। যিয়ার স্কুলের হেড মাস্টার স্বাধীন মনোভাব পোষণকারী ও মুক্তিপ্রিয় ছিলেন।

সে সময়ে দিয়ার বকর প্রদেশে তুরস্কের নেতা ও মুক্তিপ্রিয়দের একটি দল ছিল। তাদেরকে তুরস্ক হতে বহিষ্কার করা হয়েছিল। যিয়া ঐ দলের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। যিয়া ঐ উপলক্ষে নামিক কামাল, যিয়াপাশা, আহমদ মিদহাত আফিন্দি প্রমুখের প্রবন্ধসমূহ পাঠ করলেন। আব্দুল্লাহ যাওদাতের আগমনের পর তার গোপনীয় আন্দোলনের সাথে সম্বন্ধ বেড়ে গেল। এই কুরদী ডাক্তার নাস্তিক ছিল এবং হিকল (Haeckel), বুচনর (Buchner), স্পেনসর (Spencer), লিবন (Le Bon) দ্বারা বহুভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ঐ সময় জনৈক গ্রীসিয় শিক্ষকের প্রভাবে তার মধ্যে দীনী আকীদা ও যুক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি ইসলামী দর্শন ও সূফীবাদ দ্বারা শান্তি অর্জন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার কথামত এর মধ্যে তিনি সফল হননি, বরং তিনি সন্দেহের জালে (Agnosticism) গ্রেফতার হয়ে গেলেন।

১৮৯৬ সালে তিনি কুস্তুন্তুনিয়া গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি কেবল পশু চিকিৎসা কলেজে বৃত্তি পাবার সুযোগ পান। কিন্তু তার শিক্ষার চেয়ে রাজনীতির প্রতি বেশি

আগ্রহ ছিল। এ কারণে তাকে ইত্তেহাদ ও তরক্কির সদস্য নির্বাচিত করা হলো যা ফ্রি মিশনের মত গোপনীয় কাজ করত। তার বিদ্রোহপূর্ণ কোন কোন লেখার দরুন তাকে কলেজ হতে বহিষ্কার করা হয় এবং গ্রেফতার করা হয়। জেল হতে মুক্তির পর তাকে দিয়ার বকর প্রদেশে নযরবন্দি করা হয়। এ সময় তিনি গভীরভাবে বিভিন্ন ধরনের বই-পুস্তক পাঠ করতে লাগলেন। তার মনোযোগ ও বিশেষ আকর্ষণ ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে ফ্রান্সের দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান ছিল। ফলে তিনি সত্বর দিয়ার বকর প্রদেশের মুক্তিপ্রিয় দলের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে গেলেন। ১৯০৬-৭ সালে এই দল যিয়ার নেতৃত্বে স্বেচ্ছাচারী প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ১৯০৯ সালে সুলতান আব্দুল হামিদ খানের পদচ্যুতির পর যিয়া ও তার সহকর্মিগণ স্বাধীনভাবে কাজ করবার উপযোগী হলেন। তিনি দু'টি পত্রিকা বের করলেন, পয়াম ও The Decle .

সালুনিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করার পর যিয়া তুরস্কের একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হয়ে গেলেন। ফলে এখান থেকে তার আধুনিক ধারণা পোষণকারী তুরস্ক ও পাশ্চাত্য বিষয়ক অনেক জ্ঞানীদের নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ হলো এবং তার মধ্যে তুরস্কের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ঐক্য সুসংগঠিত হবার চিন্তার ক্রমবিকাশ লাভ ঘটল, যেখানে ইসলামের জন্য মৌলিক কার্যকর নীতি বা বিষয় হওয়ার (Factor) মর্যাদা ছিল না। ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধের ফলে তুরস্কের অধীনস্থ কয়েকটি ইসলামী দেশ (যথা: আলবেনিয়া ১৯১২ সালে ও হিজাজ ১৯১৬ সালে) তুরস্কের অধীন হতে বের হয়ে পড়ে যা দ্বারা জাতীয়তাবাদী ও তুরানী আন্দোলন সাময়িকভাবে বেশি গ্রহণীয় ও বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হলো। তুরস্কের নতুন বংশধরদের ওপর আলপের চিন্তাধারার প্রভাব তখন খুব মজবুত ও গভীর ছিল। ফলে তিনি ১৯১৫ সালে কেবল ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও নিজ প্রবন্ধের সমুদয় ভিত্তির ওপর ভর করে এবং কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সনদপত্র ছাড়াই ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানে প্রফেসর নিযুক্ত হলেন।

১৯১৮ সালে অন্যান্য দেশপ্রেমিক তুর্কীর মত তাকে ইস্তাম্বুল ত্যাগ করতে হলো। ১৯২১ সালে যখন মোস্তফা কামাল গ্রীসদের ওপর জয়যুক্ত হলেন, তখন তিনি মুক্তি লাভ করলেন। ১৯২১ সালে তিনি সংকলন ও অনুবাদ সংস্থার প্রধান নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মোস্তফা কামালের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং মোস্তফা কামালের নির্বাচনের সময় বহু কাজ করেছিলেন। কিন্তু মোস্তফা কামালের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনও গভীর হয়নি। ১৯২২ সালে যখন আইন সভার

নির্বাচন হয়, তখন তিনি দিয়ার বকর প্রদেশ হতে সদস্য হন। ১৯২৪ সালে তিনি রোগগ্রস্ত হলে কামাল আতাতুর্ক ইউরোপে তার চিকিৎসার যাবতীয় খরচের দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলেন। গোক আলপ কেবল এই অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন যে, তার পরিবারবর্গের প্রতি যেন লক্ষ্য রাখা হয় এবং তার রচনাসমূহের প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় যা তুরস্কের সভ্যতার উপর লেখা হয়েছে। ১৯২৪ সালের ২৫ শে অক্টোবর ৪৮ বা ৪৯ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। সুলতান মাহমুদ কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।[১]

যিয়াগোক আলপ পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণের কারণ জানিয়েছেন যে, তা প্রকৃতপক্ষে ক্রমবর্ধমান পুরাতন সভ্যতার একটি নিদর্শন যার ক্রমবিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণে (তার কথামত) তুরস্কের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তিনি এক প্রবন্ধে লিখেছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে ভূমধ্যসাগরের প্রবর্ধন (Continuation)। এই সভ্যতা (যাকে আমরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করি) তার প্রতিষ্ঠাতা ছুমরী, ছিলী, ফিনিকী, রোসতে তারা সকলেই তুরস্কের সাথে বংশগত সম্পর্ক রাখত। ইতিহাসে প্রাচীনকালের অনেক পূর্বে এক তুরানী যুগের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কারণ মধ্য-এশিয়ার বাসিন্দা আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। এর কিছুকাল পর মুসলমান তুর্কীগণ এই সভ্যতাকে উন্নত করলেন এবং একে রোম পর্যন্ত পৌছে দিলেন। তৎপর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য রোমান রাজত্ব পতনের পর তুর্কীরা ইউরোপের ইতিহাসে বিপ্লব সৃষ্টি করল। এ কারণেই আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি অংশ এবং এতে রয়েছে আমাদের অংশ।[২]

পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করা কেন প্রয়োজন, এটা গ্রহণ করার ফলে কি পরিবর্তন সাধিত হবে এবং তুরস্কের মৃতদেহে কিভাবে নতুন শক্তি ও নতুন প্রাণ সৃষ্টি হবে? এর উত্তর প্রদান করে তিনি লিখেছেন :

যখন কোন জাতি নিজের বিকাশ ও উন্নতির এক বড় দূরত্ব অতিক্রম করে তখন নিজ সভ্যতার পরিবর্তনও দরকার মনে করে। যখন তুর্কীরা যাযাবর গোত্র হিসেবে মধ্যএশিয়াতে ছিল, তখন তারা দূর-প্রাচ্যের সভ্যতার প্রভাবে ছিল। যখন উসমানী রাজত্বের আমল আসে, তখন তারা বাজেন্টেইন প্রভাবের অধীনে প্রবেশ

---

১. Foundations of Turkish Nationalism

২. Berkes Niyozi Turkish natio o nalism and western civilization (ZIA Gok alip), p. 267.

করে। যখন এটা জনসাধারণের শাসনের দিকে পরিবর্তিত হচ্ছিল, তখন তারা পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করার দৃঢ় সংকল্প করল।[১]

তিনি প্রমাণ করছেন যে, এই গ্রহণের ফলে তুরস্কের ইসলাম হতে ভিন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। সামাজিকতা, ধর্ম ও সভ্যতায় অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও একটি মিলিত সভ্যতা গ্রহণ করা যায়। যথা : জাপানি, ইয়াহুদি ধর্ম বিশ্বাসে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য নাগরিকদের সাথে তাদের সভ্যতায় সমানভাবে অংশীদার হচ্ছে।[২]

তিনি প্রমাণ করতে চান, "ধর্ম ও সভ্যতা দু'টি ভিন্ন বস্তু। ইসলামী সভ্যতা অথবা খ্রীস্টীয় সভ্যতা তা এক প্রকার ভ্রান্ত ধারণা। ধর্মীয় আকীদা ও কোন কোন ইবাদত ও রীতি অনুষ্ঠানসর্বস্ব যার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।"

কোন প্রতিষ্ঠান কি এমন হতে পারে না, যেখানে সমস্ত শ্রেণীর লোক একই ধরনের হবে অথচ তার বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন ধর্মের সাথে সম্পর্ক রাখে। ব্যাপার এই যে, ধর্ম কেবল কতিপয় পবিত্র আকীদা বিশ্বাস ও রীতি-রেওয়াজের সংমিশ্রণের নাম। এমন হলে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান যা ধর্মীয় পবিত্রতা রাখে না (যেমন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা কারিগরি যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, সৌন্দর্যের বিষয়) তা এক ভিন্ন জীবন পদ্ধতি তৈরি করে যা ধর্মের সীমার বাইরে। প্রয়োজনীয় জ্ঞানসমূহ– যেমন গণিতশাস্ত্র, পদার্থ, বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ভাল শিল্প-পদ্ধতি, চারুকলা এই সবের ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অতএব, এ ধরনের সভ্যতার ধর্মের সাথে সংযোগ ঠিক নয়। খ্রীস্টীয় সভ্যতার যেমন কোন অস্তিত্ব নেই তদ্রূপ ইসলামী সভ্যতারও কোন অস্তিত্ব নেই। রীতিমত যেভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে খ্রীস্টীয় সভ্যতা বলা শুদ্ধ নয়, তদ্রূপ প্রাচ্য সভ্যতাকেও ইসলামী সভ্যতা বলা ঠিক নয়।[৩]

এই বিপ্লবী পদক্ষেপের জন্য তিনি রাশিয়ার দৃষ্টান্ত পেশ করেন। কারণ রাশিয়া পুরাতন গোড়া খৃস্টীয় গির্জার অনুসরণ ও প্রাচ্য ধরনের সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সত্ত্বেও উন্নত পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতিদের শ্রেণীতে দাঁড়িয়েছে। তিনি লিখেছেন, যখন পাশ্চাত্য নাগরিকগণ তাদেরকে মধ্যযুগের প্রভাব হতে মুক্ত করল তখন রাশিয়ার গোড়া খ্রীস্টানগণ নিজকে অর্থডক্স চার্চ-এর দাস মনে করতেন। অতএব, রুশ জাতিকে বায়জেন্টীয়

---

১. TBerkes Niyozi Turkish natio o nalism and western civilization (Gok alipzia.), p. 271.

২. ঐ, ২৬৯-২৭০।

৩. ঐ, ২৭১-২৭২।

সভ্যতা হতে মুক্ত করতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত করতে মহান পিটারকেও বহু জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কোন দেশকে ইউরোপের নমুনা বানাতে ও পাশ্চাত্যের রঙে রঙিন করতে কি কি উপায় ও কি কি উপকরণ গ্রহণ করা যেতে পারে তা জানার জন্য পিটারের সংস্কারের ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন। ঐ সময় লোকের ধারণা ছিল যে, রাশিয়া উন্নতির যোগ্য নয়। কিন্তু এই বিপ্লবের পর রাশিয়া খুব দ্রুত উন্নতির মঞ্জিল অতিক্রম করেছে। এই ঐতিহাসিক সভ্যতা এ কথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাই উন্নতির একমাত্র রাজপথ।[১]

আবার তিনি এ কথা প্রমানিত করেন যে, স্বাধীনতা ও জাতীয় পদ মর্যাদা রক্ষা করার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর ক্ষমতা স্থাপন করা প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন : আমাদেরকে দুই পথের একটি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। হয়ত আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করব অথবা পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের দাস থাকা পছন্দ করতে হবে। আমাদের একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা প্রয়োজন। আমাদের জন্য অপরিহার্য যে, আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব স্থাপন করা।[২]

যিয়াগোক আলপ আধুনিক তুরস্কের চিন্তার উদ্ভাবকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদ মর্যাদা রাখেন। তিনি এমন চিন্তার ভিত্তি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন যে, বুদ্ধিমত্তা ও মতাদর্শের ওপর এই আধুনিক রাষ্ট্র ও আধুনিক সামাজিকতার ভিত্তি রাখা হয়েছে। প্রফেসর নেয়াযী ব্রকস তার রচিত প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেছেন। এর ভূমিকায় এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, তুরস্কের নতুন সংস্কারের মৌলিক সূক্ষ্ম বিষয়ের ওপর তার চিন্তাধারা এখন পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি বলেন :

যদিও যিয়াগোক আলপের ইন্তিকাল আতাতুর্কের বিপ্লবী সংস্কারের প্রাথমিক সময়ে হয়েছে কিন্তু তার লেখায় যে সমস্ত কল্পনা ও ধারণা পাওয়া যায়, তাকে ঐ সমস্ত সংস্কারের ভিত্তি বলা যেতে পারে। ইসলামী সংস্কারের ব্যাপারে তার চিন্তা-ভাবনা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গোড়া ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের আমলে, যা তার মৃত্যুর পরই আরম্ভ হয়। তবে যেভাবেই হোক, আমার মনে হয়, যদি তিনি জীবিত থাকতেন আতাতুর্কের রাজনৈতিক নীতির সাথে মিলে একমত পোষণ করতে কৃতকার্য হতেন। কেননা খিলাফতের বিষয়ে তার চিন্তা-ভাবনা, তার পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তিগত ফলাফল থেকে পৃথক ছিল। যেমন,

---

১. Berkes Niyozi Turkish natio o nalism and western civilization (ZIA Gok alip), p. 276.

২. ঐ, ২৬৬।

খিলাফতের বিষয়ে তার চিন্তাধারা অধিকতর তুর্কী জাতীয়তাবাদকে দেশব্যাপী ও আন্তর্জাতিকভাবে ভিত্তি দেবার চেষ্টা কল্পনা রাজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

এ ছাড়া আমার জানা আছে যে, সংবিধানের মধ্যে যে সেকুলারিজম, মতের ও চিন্তার স্বাধীনতার মত যে সমস্ত ধারা রয়েছে ঐ সমস্ত তিনি রচনা করেছেন। কেননা ১৯২৪ সালে যে মৌলিক সংবিধান গঠনের জন্য যে কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল ঐ কমিটির তিনি একজন সদস্য ছিলেন। আতাতুর্ক যে একটি আদর্শগত সংস্কারের বিপ্লবী নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার সঙ্গে হয়ত তিনি একমত হতে পারতেন না। যদিও বাস্তবে তার কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গি হতে সরে যাওয়া হয়েছে, তবুও তুরস্কের আধুনিক সংস্কারের সূক্ষ্ম মৌলিক বিষয়ের ওপর তার চিন্তার প্রভাব বিস্তার করেছে।[১]

তিনি যিয়াগোক আলপের চিন্তা ও শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন চিন্তাবিদ নেতা ও একজন মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার গুরুত্বকে এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন :

যদিও বর্তমান সময়ের তুরস্ক ও বহির্বিশ্বের আলিমগণের রচনার মুকাবিলায় ইতিহাসে সাধারণ সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তার গবেষণাসমূহ বিশেষ কোন মূল্য রাখে না, কিন্তু এর দ্বারা এ পথের ইমাম ও প্রতিষ্ঠাতা হওয়া হিসেবে তার পদ ও মর্যাদার মধ্যে মোটেও কোন পার্থক্য আসে না যদিও তার কোন কোন চিন্তাধারা নতুন তুরস্কে এখন কার্যকর নয় অথবা তা বর্তমানে অতি সাধারণ মনে করা হচ্ছে এবং সেগুলোতে পূর্ণ আধুনিকতা দেখা যাচ্ছে না। অথচ তার সময় সেটা নতুন ও অতুলনীয় মনে করা হতো। এর কারণ এই যে, এই দৃষ্টিভঙ্গিই বর্তমানে এ বাস্তবতা নিয়ে এসেছে। এ কারণে তার প্রভাবের গভীরতা ও তার অন্তর্দৃষ্টির প্রশস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২]

তুরস্কের অনুসরণপ্রিয়তা

পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর নেতৃত্ব স্থাপন করার দাওয়াতের বাহক ও পরিচালক হিসেবে (যার নেতৃত্ব যিয়াগোক আলপ করছিল) মুসলিম বিশ্বের স্বাধীন চিন্তাবিদ ও ন্যায়বান ঐতিহাসিকের কাছে তুরস্ক খুবই সম্মানের যোগ্য ছিল। বিশ্বের রাজনৈতিক সভ্যতা ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে তুরস্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সমাপ্ত করতে পারত।

---

১. Berkes Niyozi Turkish natio o nalism and western civilization (ZIA Gok alip.), p. 13-14.

২. ঐ, পৃ. ৩০-৩১।

যদি তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর প্রকৃত নেতৃত্ব স্থাপন করে নিত এবং এর ওপর ক্ষমতা পাবার পর তাকে শ্রেষ্ঠ মানবীয় ও ইসলামী উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করত এবং ঐ স্বাধীন ধারণার নেতার মত তাতে সংশোধন ও সংস্কার করত যে নিজের ইচ্ছার মালিক ও অধিবাসী অথবা ঐ মুজতাহিদ আলিম (ইসলামী ধর্ম-জ্ঞানে সুপণ্ডিত)-এর মত যে আল্লাহ্‌প্রদত্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করে। তারা প্রাচ্যের ঐ মুসলিম জাতিসমূহের জন্য অনুসরণযোগ্য আদর্শ, শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য পরিচালক বলে গণ্য হতো। যারা পাশ্চাত্যের শক্তিশালী দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে গিয়েছে এবং নতুন সভ্যতার প্রকাশ্য মুকাবিলার সম্মুখীন হয়েছে, যাদের কাছে তুরস্কই সর্বপ্রথম ঐ মুসলমান দেশ যে দেশকে পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধুনিক জীবনদর্শনের প্রসারিত স্রোতের প্রকাশ্যে মুকাবিলা করতে হয়েছে।

কিন্তু দুঃখ যে, এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি অর্থাৎ তারা এই পথে চলে নি। যা কিছু হয়েছে তা কেবল তুরস্ক পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করতে আরম্ভ করল। অর্থাৎ একে অবিকল গ্রহণ করে নিল। তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐ সমস্ত অসার ও অগভীর প্রোগামের মধ্যে জড়িত হয়ে গেল, যা দ্বারা জাতিসমূহ ও সভ্যতার জীবনের কোন বিশেষ পার্থক্য ঘটেনি অথবা এ দ্বারা প্রকৃত শক্তি ও রাজনৈতিক মহত্ত্বের ক্ষেত্রে কোন মৌলিক সম্পর্ক ছিল না।

এই পদক্ষেপ দ্বারা তুরস্ককে নিজের নিকটতম অতীত ও ঐ জাঁকজমকপূর্ণ জ্ঞানের সম্পত্তি হতে সংস্রবহীন ও বঞ্চিত করে দিল যার গঠন ও উন্নতিতে প্রচুর পরিমাণ তুর্কী বংশধর ও গুণী ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। এটা ঐ তুরস্ককে যার মজবুত হাতে সেদিন পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বে ও অভিভাবকত্ব ছিল তার জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজানা বানিয়েছিল এবং দেশের নেতাগণ ও জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করছিল, যারা ঈমান, বন্ধুত্ব ও দীনী উৎসাহ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

যাদের উদ্যম, শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মুখে জগত বারবার মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল এবং যারা (দেশের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও সামরিক নেতাদের অসাধুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও) ইউরোপের ক্রমাগত আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করেছিল। এই জ্ঞানবিহীন অনুকরণীয় পদক্ষেপ দ্বারা জাতির কাছ থেকে বিশ্বাস ও আবেগ-উদ্যমের ঐ অমূল্য সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে যা এই বৃহৎ মুসলিম জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। ফলে তুরস্কের সমাজে অস্থিরতা, বিশৃংখলা, উদাসীনতা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়েছে।

নতুন সামাজিকতা স্থাপনের জন্য, তুর্কীদের দীনী অনুভূতি ও ইসলামী আবেগকে পিষ্ট করার জন্য, জাতির দৃষ্টিকে বস্তুবাদ, জাতীয়তাবাদ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুকরণের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার এবং একে একটি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ করার জন্য এমন কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছিল, যার দৃষ্টান্ত খুবই কম পাওয়া যায়। এর শিকার অধিক পরিমাণে ঐ সমস্ত লোক, যাদের দ্বারা দেশের ও জাতির সীমাহীন উপকার হতে পারত। তুরস্কের শাসকবৃন্দ ও অসহায় দুর্বল জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধিগত ও চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতির এই দ্বন্দ্ব আজও বিদ্যমান রয়েছে। ঈমানের স্ফুলিঙ্গ অন্তরে এখনও লুকায়িত আছে। সামান্য ইঙ্গিত ও সাধারণ উৎসাহে তা অন্তরে প্রজ্বলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে তুরস্কের ভূমিকা ছিল খাঁটি অনুকরণপ্রিয়তা যা প্রতি প্রকারের সৃষ্টিকারী শক্তি, চিন্তার নতুনত্ব, স্বীয় দায়িত্ব গ্রহণে শ্রেষ্ঠ ধারণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা হতে খালি ছিল। তারা এই সভ্যতার ওপর নেতৃত্ব (Supremacy) স্থাপন করার জন্য, যা জড়বাদী পাশ্চাত্য হতে এসেছিল এবং যার স্বপ্ন যিয়াগোক আলপ নিজের পূর্বের রচনায় দেখেছিলেন, এজন্য তিনি সুচিন্তিত ও পরিপক্ব চেষ্টা করেননি। ফলে তারা এর নেতৃত্বের অধিকারী হতে এবং এর ওপর ক্ষমতা অর্জন করতে সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হয়েছিলেন। তাদের কাজ ছিল কেবল আমদানী করা (Import), নেয়া অথবা অনুকরণ করা। এর চাইতে বেশিও নয়, কমও নয়।

ফলে ঐ যুগে তুরস্কের মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জন্মেনি, অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও কোন গুরুত্বপূর্ণ লোক দেখা যায় না। চিন্তা ও দর্শনেও কোন নতুন মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাব হয়নি। এমন কোন ব্যক্তিও জন্মগ্রহণ করেনি যে ব্যক্তি এই সভ্যতায় এমন কোন বস্তু সংযোজন করতে পারে যার কোন শিক্ষাগত মূল্য ও উপকারিতা আছে। এ কারণে আজ এই জাতি এক তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি হিসেবে পাশ্চাত্য দেশসমূহের আশ্রয়ে পালিত হচ্ছে। তুরস্কের বর্তমান বিপ্লব এই রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠতা, আন্তর্জাতিক পদ মর্যাদা, দীনী চেতনা ও আবেগ, চারিত্রিক মূল্যবোধ ও উৎসাহ এবং মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব ও পরিচালনার মূল্য কোনমতেই হতে পারে না। ফলে কুরবানী তুরস্ককেই দিতে হয়েছে।

নামিক কামাল

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিক সুষম দাওয়াত এবং তুরস্ক ও আধুনিক পাশ্চাত্যের সম্পর্কের ধরনের সুন্দর ব্যাখ্যা তুরস্কের জনৈক প্রধান

চিন্তাবিদ নামিক কামালের চিন্তাধারা ও রচনায় পাওয়া যায়। তিনি পাশ্চাত্যের ঐ সকল শাখা হতে উপকৃত হওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন যার কারণে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ উন্নত হয়েছে এবং আর্থিক সচ্ছলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।[১]

নামিক কামাল ১৮৪০ সালে (Rhobosto)-তে এক ভাগ্যবান সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়িতেই তিনি আরবী ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। সতের বছর বয়সে তিনি সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করেন। তিনি যৌবনে তুরস্কের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও দেশপ্রেমিক নেতা ইব্রাহিম শীনাসী (১৮২৬-১৮৭১ খ্রী.) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'তছভীরে আফকার'-এর সম্পাদনা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হলেন।

প্রফেসর নেয়াযী বার্কস যিয়াগোক আলপের প্রবন্ধ সংকলনের জ্ঞানগর্ভ ভূমিকায় লিখেছেন :

যে ব্যক্তি আধুনিক অবস্থার অসুস্থতা নিরূপণ করেছেন এবং তাকে একটি নতুন রাষ্ট্র স্থাপনের রাস্তায় সর্ববৃহৎ বাধা বলে স্বীকার করেছেন, তিনি হলেন নামিক কামাল

১. ১৮৬৫ সালে যখন শীনাসী ফ্রান্সে আশ্রয় নিলেন, তখন তিনিই এ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একজন রাজনীতিবিদ, বিশ্লেষক, সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। নিজের নির্ভীক চিন্তাধারা ও প্রবন্ধের কারণে ১৮৬৭ সালে তাকে দেশ ত্যাগ করতে হলো। তিনি দেশ ত্যাগের পর তিন বছরকাল লন্ডন, প্যারিস ও ভিয়েনাতে কাটালেন। সেখানে তিনি আধুনিক আইন ও অর্থনীতি অধ্যয়ন করেন। ১৮৭১ সালে তিনি তুরস্কে ফিরে আসলেন এবং তার প্রসিদ্ধ নাটক "ওয়াতনের" জন্য (যাতে স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের সর্বজনীন চেতনা ছিল) তাকে সাইপ্রাসে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল। ১৮৭৬ সালে সুলতান আব্দুল আযীযের অপসারণের পর তিনি ফিরে আসলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে আবার সরকারের কোপানলে পতিত হন এবং নিজের জীবনের শেষ বছর পর্যন্ত নজরবন্দী অথবা দেশ ত্যাগের মধ্যে কাটিয়ে ১৮৮৮ সালে ইন্তিকাল করলেন। বার্নার্ড লুইস (Bernard Luis) তার পুস্তিকা The Emergence of Modern Turkey-তে লিখেছেন :

নিজের আবেগপূর্ণ দেশপ্রেম ও স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা সত্ত্বেও নামিক কামাল একজন প্রকৃত উৎসাহী মুসলমান ছিলেন, তার প্রবন্ধসমূহে যে মাতৃভূমির (তুরস্কের) উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তার ভিত্তি সম্প্রদায়ের স্থলে এলাকার ওপর হয় তথাপি তা তার কল্পনার মধ্যে এমন খাঁটি ইসলামী ছিল, যেমন উসমানী শাসনের কল্পনা ছিল। তিনি আজীবন মুসলমানদের প্রাচীন মর্যাদা ও আকীদার সঙ্গে শক্তভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি অনেক সময় তানজীমাতের পরিচালকদের তীব্র সমালোচনা করেছেন যে, তারা পুরাতন ইসলামী ঐতিহ্য রক্ষা করতে অকৃতকার্য হয়েছেন এবং তারা ইউরোপ হতে আধুনিক চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠান আমদানী করেছেন।

নামিক কামাল ইসলামী মূল্যবোধের পতাকাধারী ছিলেন এবং যেই ইউরোপীয় লেখকগণ ইসলামকে খাটো করে পেশ করা নিজের পেশা বানিয়েছেন তাদের মুকাবিলায় তার কীর্তিতে সুস্পষ্ট করেছেন, এমন কি উসমানী নেতৃত্বের আন্তর্জাতিক ইসলামী ঐক্যের কল্পনাও পেশ করেছেন। এই আন্দোলন এশিয়া ও আফ্রিকায় গ্রহণ করে। তা প্রচার করে তিনি ইউরোপের মুকাবিলায় একটি শক্তিশালী ও ভারসাম্য প্রাচ্য করতে চেয়েছেন। (পৃ. ১৩৩-১৩৮)

(১৮৪০-১৮৮৮ খৃ.)। তিনি ঐ সমস্ত দীনী চারিত্রিক আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃত অথবা দৃষ্টান্তমূলক আকৃতি পেশ করতে চেষ্টা করেন যা ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় এবং পুরাতন উসমানী ঐতিহ্যের উদাহরণমূলক ধারণা পেশ করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐ সমস্ত দিক তুলে ধরেন যা দ্বারা পাশ্চাত্য জাতিসমূহের উন্নতি, সচ্ছলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছিল। এই তিন উপাদানের ওপর আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। তার কাছে ইসলাম সমাজের চারিত্রিক ও আইনসঙ্গত ভিত্তিসমূহ সরবরাহ করে। তার মতে শাসন কাজে উসমানী ঐতিহ্য, তার বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেশব্যাপী উদারতার নীতিকে উসমানী ঐতিহ্যের রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি বানানো যেত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐ বস্তুবাদী কার্যকর পন্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করা যেত যা দ্বারা ঐ নীতির শক্তি পার্থিব উন্নতির ক্ষেত্রে সমসাময়িক জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতো।

এভাবে নামিক কামাল উনবিংশ শতাব্দীর তুরস্কের তিনটি উপাদানকে পৃথক করেছেন এবং এর সীমা চিহ্নিত করেছেন। তার ধারণায় তানজীমাতের অকৃতকার্যতার বড় কারণ হলো, এই তিন উপাদান সম্পর্কে মানসিক অস্থিরতা। যেমন– শরীয়ত অর্থাৎ ইসলামী আইনকে ফ্রান্স হতে ধার করা আইন গ্রহণের ফলে ত্যাগ করা হয়। যেমন শিক্ষা, রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক ও কৃষি বিষয়ক ব্যবস্থা পাশ্চাত্য রীতিনীতি অনুসারে প্রচলিত করা হয়নি।

তুর্কী রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক রাষ্ট্র বানাবার শিশুসুলভ ইচ্ছায় তানযীমাতের সংস্কারকগণ কোন কারণ ছাড়া ইউরোপীয় শক্তিবর্গের অনুগ্রহকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে গ্রহণ করে নেয়। এর ফলে উসমানী রাষ্ট্র নিজের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা হারিয়ে বসে। তারা রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে আধুনিক গণতান্ত্রিক নীতির একটি মূল বিষয়ও প্রচলিত করতে সক্ষম হয়নি। যখন পুরাতন উসমানী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে ও ইসলামী আইনে এমন কোন কথা ছিল না যা গণতন্ত্র অথবা উন্নতি অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় করা যেত না।[১]

কিন্তু নামিক কামালের জনপ্রিয়তা ও এমন গভীর প্রভাব সত্ত্বেও যা তিনি তুরস্কের নতুন বংশধর ও যিয়াগোক আলপ ও তার সমসাময়িক লোকের ওপর

---

১. Berkes, Niyazi, Turkish, Nationalism And Western Civilization. (Gokalp, ziya) p.17-18.

বিস্তার করেছিলেন এবং যার স্বীকারোক্তি খালিদা আদীব খানম নিম্নের বর্ণনা দ্বারা করেছেন : নামিক কামাল নতুন তুরস্কের প্রিয়তম ব্যক্তি ছিলেন, তুরস্কের চিন্তার রাজনৈতিক ইতিহাসে তার চেয়ে অধিক অপর কোন ব্যক্তিত্বকে মান্য করা হয়নি।[১]

তার মূল্যবান চিন্তা ও তুলনামূলকভাবে সুষম দাওয়াত আধুনিক তুর্কি গঠনকার্যে এত কার্যকর সাব্যস্ত হয়নি যা যিয়াগোক আলপের পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রাজনৈতিক মূলনীতি গ্রহণ করার আবেগপূর্ণ দাওয়াত করেছে। যিয়ার দর্শন চিন্তাধারাকে কার্যকর করার জন্য তুরস্কের একজন অসীম শক্তিশালী ও কর্মক্ষম লোক পাওয়া গিয়েছে যিনি যিয়ার চিন্তা ও অভিপ্রায় থেকেও অগ্রবর্তী হয়ে তুরস্ককে পাশ্চাত্যের কাঠামোতে ঢালাই করার দৃঢ় সংকল্প করেছেন। তিনি ছিলেন কামাল আতাতুর্কের ব্যক্তিত্ব।

কামাল আতাতুর্কের চিন্তার ক্রমবিকাশ, মনোভাব, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য

মোস্তফা কামালের পিতার নাম ছিল আলী রেযা বে। ১২৯৮ হি. মোতাবেক ১৮৮১ খ্রী. সালোনিকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার আদি বংশ আনাতোলিয়ার এক গ্রামে বসবাস করত। প্রথমে তিনি এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। অতঃপর এক হাই স্কুলে এক বছর কাল শিক্ষা লাভ করলেন। এক বছর পর ঐ হাই স্কুল ছেড়ে ইস্তাম্বুলের সামরিক কলেজে ভর্তি হলেন এবং সামরিক অফিসার হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। এটা ছিল সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ-এর আমল। মোস্তফা কামাল সুলতানের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে জড়িত হওয়ায় গ্রেফতার হন এবং দামিস্কে নির্বাসিত হন। সেখান থেকে পালিয়ে সালোনিকায় আসলেন এবং আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ ও তরক্কির সদস্য হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং মাকদুনিয়ার রেলওয়ে লাইনের নির্মাণের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৩২৭ হি. মোতাবেক ১৯০৯ খ্রী. সুলতান আব্দুল হামীদ অপসারিত হলেন।

১৯১০ সালে তিনি সামরিক মিশনের এটাচী হয়ে ফ্রান্সে চলে গেলেন। এই ভ্রমণ তাকে তুরস্কের উন্নতি ও পরিচালনার ব্যাপারে অশান্ত করে এবং জার্মানীর বর্ধিত প্রভাবের কারণে অস্থির করে। তখন তুরস্কে কার্যত চার ব্যক্তির শাসন ছিল। আনোয়ার, তলসাত, জাভেদ ও জামাল। মোস্তফা কামালের চারজনের সঙ্গেই

১. Khalide Edib : Turkey Faces West., p. 84.

ভীষণ মতবিরোধ ছিল। মোস্তফা কামালের আন্তর্জাতিক উদ্দেশে অথবা তুরস্কের বাইরে উসমানী রাজত্বের বিস্তারে কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি এই নীতিকে দেশের জন্য ধ্বংসকারী ও অনিষ্টকারী মনে করতেন। এদিকে আনওয়ার তাকে পছন্দ করতেন না। ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হলো। বলকান শহরসমূহ হতে দেশত্যাগী ও আশ্রয়প্রার্থীঁদের ভিড় ও তাদের অবর্ণনীয় অসহায় অবস্থা দর্শনে তিনি ভীষণভাবে বিচলিত হলেন।

বলকান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ার দরুন তুর্কীরা আড্রিয়া নৌপথের ওপর দ্বিতীয়বার অধিকার স্থাপন করলেন। আনওয়ার যুদ্ধমন্ত্রী হলেন এবং তিনি নিজের উন্নতি ও সম্মানের শেষ পর্যায়ে পৌঁছলেন। আনওয়ারের চেষ্টা ছিল যে, সমস্ত মুসলমানকে মুসলমানদের খলীফার পতাকার নিচে নিয়ে আসবেন। আনওয়ার জার্মানদেরকে তুরস্কের সেনাবাহিনীর সুসংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন, মোস্তফা কামালের এটা খুবই অপছন্দ ছিল। ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলো এবং আনওয়ার ও তার বন্ধুদের চাপে তুর্কী জাতি জার্মানীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিয়মিত মহাযুদ্ধে শরীক হয়ে গেল। মোস্তফা কামালের মত ছিল নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা, যে দল জয়ী হয় ঐ দল দ্বারা উপকৃত হওয়া দরকার। মোস্তফা কামাল নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে খুব বীরত্বের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করলেন এবং ১৯১৫ সালে গেটলি পোলীর যুদ্ধে বিরাট অবদান রাখলেন। এতে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

১৯১৬ সালে তাকে কাফকাযের যুদ্ধ ফ্রন্টে পাঠানো হলো। ১৯১৭ সালের প্রারম্ভে তাকে হিজাযের সেনাপতি করা হলো। কিন্তু এই দায়িত্ব সামলাবার পূর্বেই হিজায হাতছাড়া হয়ে গেল। ঐ বছর হতে তিনি জেনারেলের পদে উন্নীত হলেন এবং তাকে দিয়ার বকর অঞ্চলের অস্থায়ী কমান্ডার করে পাঠান হলো। ১৯১৮ সালে জার্মানী ও তুরস্কের পরাজয়ের সঙ্গে এই মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হলো। ভূতপূর্ব মন্ত্রী ও নেতাগণ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন এবং মোস্তফা কামালের জন্য রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। বৃটিশ ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলো ইস্তাম্বুল দখল করে নিল। আনাতোনিয়াতে ভীষণ অশান্তি সৃষ্টি হয়ে গেল। তখন শান্তি স্থাপনের জন্য মোস্তফা কামাল নির্বাচিত হলেন। তিনি গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন যারা আযমীরের উপর অধিকার স্থাপন করেছিল ১৯১৯ সালে সাকারিয়ার যুদ্ধে তাদেরকে তিনি ভীষণভাবে পরাজিত করলেন এবং গাযী উপাধি লাভ করেন। অতঃপর আংগোরাতে এক স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করলেন। খিলাফত ও উসমানী রাজত্বের

অবসানের ঘোষণা করলেন এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯২৪ সালে তিনি প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন এবং ঐ অবস্থায় ১৯৩৪ সালে ইন্তিকাল করেন।[১]

কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্ক ধর্মনিরপেক্ষতা (সেকুলারিজম) গ্রহণ করে এবং অতীত কাল হতে সম্পর্ক ছিন্ন করে। বরং অতীতের ভীষণ বিদ্রোহী হয় এবং আবেগময় পাশ্চাত্যবাদী সামরিক শাসন পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হয়। তুরস্কের যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার কারণ বোঝার জন্য এই আন্দোলন প্রবক্তার চিন্তাধারা, রাজনৈতিক নেতা ও আধুনিক তুরস্কের প্রধান স্থপতি কামাল আতাতুর্কের মনোভাবের ক্রমোন্নতি ও চিন্তাধারা, ক্রমবিকাশ ও তার মেজাযের অবস্থা বোঝার প্রয়োজন। কারণ গণতান্ত্রিক ও জনসাধারণের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি সত্ত্বেও যে দেশ কোন সামরিক শাসকের অধিকারে আসে সে দেশ অধিক পরিমাণে তার ব্যক্তিত্বের ও স্বভাবের প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয় এবং এর নতুন রূপ বোঝাবার জন্য একনায়ক শাসকবর্গ ও তাদের মিলিত মৌলিক বিষয়সমূহ বোঝার প্রয়োজন আছে। এই সুযোগে আমি কামাল আতাতুর্কের সহানুভূতিশীল তুর্কী জীবনী লেখক ইরফান ওরগার প্রামাণ্য গ্রন্থ আতাতুর্ক (Ataturk)-এর ঐ সমস্ত উদ্ধৃতি পেশ করাই যথেষ্ট মনে করি যা কামালের চরিত্র ও স্বভাবের ওপর আলোকপাত করে।

তিনি কলেজ জীবনে ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা কম করতেন। তিনি বন্ধু-বান্ধবের নিকট অপ্রিয় ছিলেন। তার নিকটতম বন্ধু অনেক কম ছিল। তিনি সত্বর উত্তেজিত হয়ে যেতেন। তিনি একজন আদর্শবান, বিনয়ী, মেহনতী ও শৌখিন ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কামাচারের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল। তিনি মদ্যপান করে শান্তি লাভ করতেন। কারণ আত্মার শান্তির জন্য তার মধ্যে আল্লাহর বিশ্বাসও ছিল না, আখিরাতের জীবনে বিশ্বাস করতেন না।[২] অন্যের ওপর অবিচার করে আনন্দ লাভ করার যে তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ছিল তাও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি অন্যের আবেগ ও অনুভূতিকে কখনও মেনে নিতেন না। কারণ কাউকেও নিজের সমকক্ষ মনে করতেন না। তার মধ্যে অন্যদেরকে পরাভূত ও অধীনস্থ করা এবং তাদেরকে তার নিজ ইচ্ছার সম্মুখে মাথা নত করাবার স্বাভাবিক অভিলাষ ছিল। তিনি সব সময় সর্বোচ্চ স্থানে থাকা পছন্দ করতেন।

---

১. Irfan Orga Margarete : (Ataturk, Michael Jesph Ltd., London 1982.)

২. প্রাগুক্ত, p. 251.

মানাসটরে থাকাকালীন তিনি ওয়ালটিয়ার ও রুসুর রচনার সঙ্গে পরিচিত হন, যারা তাকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন এবং তার ঘুমন্ত বিদ্রোহের আবেগকে জাগ্রত করেছিলেন।[১]

যৌবনকালে তিনি নিজের বিপ্লবী চিন্তার সঙ্গে যিয়াগোক আলপের শিক্ষাকে ভালমত আত্মস্থ করেছিলেন। যিয়াগোক আলপ আধুনিক চিন্তাধারা ও ধর্মীয় মতামতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য আধুনিক ধারণার প্রবক্তা ও চিন্তানায়ক ছিলেন। তিনি ১৯০০ সালে এ কথা প্রকাশ করেছিলেন যে, উসমানিয়া রাজত্বের ভাগ্যে পতন ও বিশৃঙ্খলা অবধারিত হয়েছে। কেননা তিনি ব্যক্তিগত শাসন নীতিকে চোখ বন্ধ করে ধরে রেখেছেন। তিনি প্রায় বলতেন, ধর্মীয় শাসন ব্যক্তিগত শাসনের বিশ্বাসী বন্ধু। তিনি ধর্মীয় কর্তৃত্ব হতে মুক্তি অর্জন করার জন্য জোর চেষ্টা করেন। তিনি আলিমদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার পক্ষে ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব ও ধর্মের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষকদের যারা তার মতে শয়তানের মন্ত্রবলে জিহাদের চিৎকার করতে থাকে তাদের বন্দী ও শৃঙ্খলিত করা দরকার। তিনি শরীয়তের সমাপ্তি ও কাযীদের দীনী আদালত রহিত করার জোর ওকালতি করেছেন। যারা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাকারী ও মুখপাত্র ছিলেন, তার নিকট ঐ সমস্ত আদালতের স্থলে নতুন আইনের আদালত ও সিভিল কোর্টের প্রবর্তন করা উচিত।[২]

ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে তার আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার মূল ধারণা ও অনুভূতির উল্লেখ করে লিখেছেন : তিনি এ সত্যকে খুব ভালভাবে বুঝেছিলেন যে, তার প্রকৃত যুদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে। বাল্যকাল হতে তার আকীদা ছিল যে, আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ কেবল এক গোপন তথ্য ও প্রতারণা-মিশ্রিত (নাউজুবিল্লাহ্) একটি নামমাত্র, যার কোন বাস্তবতা নেই। তিনি কেবল ঐ জিনিসের প্রতি বিশ্বাস রাখতেন, যা চক্ষু দ্বারা দেখা যেতে পারে। উক্ত গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেন যে, কামাল শেষ দিকে আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হস্ত উত্তোলন করতেন।

তার ধারণা ছিল অতীতকালে ইসলাম কেবল একটি ধ্বংসকারী শক্তি ছিল এবং তা তুরস্ককে বহু ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তিনি এই সত্যকে উপেক্ষা করেছেন যে,

---

১. Irfan Orga Margarete : (Ataturk, Michael Jesph Ltd., London 1982.), p. 237-239)

২. ঐ, p. 246.

ইসলামের দানকৃত সাম্য দ্বারাই বিস্তৃত উসমানী রাজত্ব গঠন করা হয়েছিল। তার ধারণা ছিল ইসলামের কারণে মানুষ জড়তা ও কুসংস্কারে পতিত হয়। তিনি ঐ সমস্ত লোককে বেশি বেশি ঘৃণা করতেন যারা তকদীর বা অদৃষ্টের প্রতি আস্থা রাখে এবং বলে, এটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অদৃষ্টের ব্যাপার। তার এই আকীদা বা বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্‌র কোথাও অস্তিত্ব নেই। মানুষই স্বীয় নিয়তিকে বানায়। তিনি অনেক সময় বলতেন, মস্তিষ্কের শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ্‌র অনুভূতিহীনতা ও সহানুভূতিহীনতার ওপর জয়ী হয়। কিন্তু ধর্মীয় লোকদের কথা হলো আল্লাহ্‌র কাজ দেরিতে হয়। কিন্তু তার নিকট ভুলে যাওয়া নেই। ধর্মীয় লোকদের কি এখনও বৈদ্যুতিক শক্তির জ্ঞান নেই, যে বিদ্যুৎ শক্তি অনেক দ্রুত কাজ করে। তার দৃঢ় ইচ্ছা ছিল যে, ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, তার জন্য শক্তি ব্যবহার করতে হলেও অথবা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা করতে হলেও করতে হবে।[১]

অন্য এক স্থানে লিখেছেন :

তার নিকট নফসের নীতি-চিন্তা, অন্তর্দৃষ্টি ও দার্শনিক পরিভাষার কোন অর্থ ছিল না। এ কারণে স্বাভাবিকভাবে তুর্কী জাতির জন্য ধর্মকে অপ্রয়োজনীয় ও অকেজো ঘোষণা করায় তার কোন দ্বিধা ছিল না। কিন্তু ধর্মের স্থলে যদি তুর্কী জাতিকে তিনি কিছু দিয়ে থাকেন, তা আধুনিক দেবতা ছিল অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতা। এতে আশ্চর্যের কোন কথা ছিল না যে, জাতি নিজের আত্মার জন্যই যুদ্ধ করেছে। অন্যান্য সভ্যতার অতীত ইতিহাস দ্বারা তিনি এই শিক্ষা অর্জন করেছেন যে, পুরাতন দেবতার মৃত্যু সহজে হয় না। এ কারণে তুর্কী জাতির মন হতে আল্লাহ্‌র বিশ্বাস দেরিতে বের হবে।[২]

অন্য এক স্থানে লিখেছেন :

ইসলাম ও মজবুত আকীদার ধর্মীয় ব্যক্তির প্রতি তার ভীষণ ঘৃণা ছিল। তিনি যে আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী ছিলেন ঐ আল্লাহ্ তার মতে কোন নিয়ম-শৃঙ্খলার ধার ধারত না। সে আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসে ছিল। তিনি বলতেন, আমাদেরকে সব দিক দিয়ে বীর পুরুষ হতে হবে। আমরা বড় বড় বিপদ-আপদ সহ্য করেছি। আমাদের বিপদ ও দুর্ভাগ্যের কারণ এই ছিল যে, আমরা বোঝার চেষ্টা করিনি দুনিয়া কোন্ পথে যাচ্ছে। আমাদের এ ব্যাপারে কোন উৎকণ্ঠার প্রয়োজন নেই যে, কে কি বলেছে।

---

১. Irfan Orga Margarete : (Ataturk, Michael Jesph Ltd., London 1982.), p. 237-238)

২. ঐ, p. 2467.

কারণ আমরা সভ্য ভদ্র হচ্ছি। আমাদের এজন্য গৌরব করা দরকার, মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুসলমানদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখ, তারা কত দুঃসহ অবস্থা, কত বিপদ, কত আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে? কেন? এই কারণে যে, তারা নিজের মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে নিজেকে এ আলোকিত ও শ্রেষ্ঠ সভ্যতায় সজ্জিত করতে পারো নি এটাই কারণ যে, আমরাও এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পশ্চাদ্‌গতি ও পতনের শিকার হয়ে রয়েছি এবং বর্তমানে শেষ গর্তে পড়ে গিয়েছি।

এই অতীত বছরসমূহের মধ্যে যদি আমরা নিজেদের বাঁচাতে কিছুটা সফলতা অর্জন করেছি, তা এজন্য যে, আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আমরা এখন কোন স্থানে থামতে পারি না। আমরা এগিয়ে যাওয়ার জন্য উঠেছি, আমরা সর্বদাই এগিয়ে যেতে থাকব যতই অঘটন ঘটতে থাকুক। বর্তমানে আমাদের জন্য অন্য কোন রাস্তা নেই। জাতির এ কথা বুঝে নেয়া উচিত যে, সভ্যতা এক জ্বলন্ত আগুন যে আগুন ঐ সমস্তকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয় যারা এ সভ্যতার বিশ্বাসী নয়।[১]

অপর এক স্থানে তার ঘৃণার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন :

এটা কোন গোপন তথ্য ছিল না যে, মোস্তফা কামাল একজন ধর্মহীন লোক ছিলেন। এ কারণে জনশ্রুতি ছিল যে, খেলাফতের বিলুপ্তি অতি সত্বর কার্যকর হবে। এ কথার গুজব রটেছিল যে, মোস্তফা কামাল শায়খুল ইসলামের মাথার ওপর (যিনি ইসলামের একজন বড় আলিম এবং একজন সম্মানিত বুযুর্গ ছিলেন) কুরআন মজীদ নিক্ষেপ করেছিলেন। এর ফলে মোস্তফা কামালের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না। কিন্তু তা হয়নি এবং তা এ কথার প্রমাণ যে, সময়ের বহু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।[২]

পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে যে তার প্রেম-ভালবাসা ছিল এবং তার দৃষ্টিতে এর যে পবিত্রতা ও সম্মান ছিল এবং যেভাবে ঐ সভ্যতা তার শারীরিক ও মানসিক অনুভূতির ওপর প্রাধান্য লাভ করেছিল তার উল্লেখ করে উক্ত গ্রন্থকার লিখেছেন :

মোস্তফা কামাল যে জিনিসের শিক্ষা দিতেন তিনি নিজেও তার ওপর আমল করতেন। তিনি ঐ আধুনিক আল্লাহ্‌র (আধুনিক সভ্যতা) উৎসাহী পূজারী ও একজন

---

১. Irfan Orga Margarete : (Ataturk, Michael Jesph Ltd., London 1982.), p. 237.

২. ঐ, p. 239.

ওফাদার বন্ধু ছিলেন। তিনি এই পাশ্চাত্য সভ্যতা দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে প্রচার করেছিলেন। তিনি যখন এই সভ্যতা সম্পর্কে কোন আলাপ-আলোচনা করতেন, তখন তার চক্ষুতে দীপ্তি সৃষ্টি হতো এবং তার মুখমণ্ডলের মধ্যে এমন আত্মোৎসর্গকারী অবস্থা প্রকাশ পেত যে, যেমন সূফী-সাধকের বেহেশ্তের মুরাকাবার (ধ্যানস্থ) সময় তার মুখমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয়।[১]

সভ্যতা সম্পর্কে তার কি ধারণা ছিল এবং তুর্কী জাতিকে তিনি কি দেখতে চাইতেন, তার ধারণা নিম্নের বর্ণনাসমূহ দ্বারা হবে। গ্রন্থকার লিখেছেন :

মোস্তফা কামাল তার জাতিকে বলতেন, আমাদেরকে এক সভ্য ও ভদ্র, জাতির পোশাক-পরিধান করতে হবে। দুনিয়াতে আমাদের দেখাতে হবে আমরা এক বড় জাতি। অপর জাতির অজ্ঞ লোকদেরকে আমাদের পুরাতন পদ্ধতির পোশাক পরিধান করে হাসবার সুযোগ দেয়া আমাদের উচিত হবে না। আমাদেরকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলতে হবে।[২]

এরপর তার মনে এক নতুন ঢালাইকৃত তুরস্কের কল্পনা ছিল, কিন্তু তার ভাগ্য মানুষ নামক যে কাঁচামাল (জাতি) ছিল তা একটি অসন্তুষ্ট, উদাস অগঠিত মানবসমষ্টি ছিল, যেমন যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে নতুন ভর্তি হওয়া লোকের অবস্থা হয়। তিনি এমন এক ব্যক্তি হিসেবে একাকী কাজ করতে আরম্ভ করলেন যিনি শক্তির উৎস, যার নিজের ছাড়া অপর কারো সিদ্ধান্তের ওপর বিশ্বাস ছিল না, যার অপরের কাজে হস্তক্ষেপ করার উন্মাদনা ছিল এবং যার প্রচুর পরিমাণে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার শক্তি ছিল।[৩]

তুর্কী জাতিকে অতি শীঘ্র এমনভাবে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের রঙে রঙিন ও পূর্ণভাবে তাদের অনুরূপ করে দেয়া যাতে উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ না থাকে।

تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری -

অর্থাৎ কেউ যেন এই কথা না বলে বসে আমি ভিন্ন আর তুমি ভিন্ন। তিনি হ্যাটের ব্যবহার অপরিহার্য করেছিলেন এবং তুর্কী টুপি ও মাথা আবৃতকারী সব ধরনের পোশাককে আইনবিরোধী বলে ঘোষণা করেছিলেন। এ সম্পর্কে এত

১. Irfan Orga Margarete : (Ataturk, Michael Jesph Ltd., London 1982.), p. 273.

২. ঐ, p. 260.

৩. ঐ, p. 244.

কঠোরতা অবলম্বন করলেন যে, যেন তুর্কী জাতির জীবন ও সম্মানের জন্য এর চেয়ে বেশি কোন সংশোধনের প্রয়োজন ছিল না! এই হ্যাটের ব্যবহারের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল যা ক্রুসেডের যুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল। তুর্কী জীবন-চরিত লেখক এই যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন :

দাঙ্গা-ফাসাদ এত শক্ত ছিল এবং অবস্থা এত বিপজ্জনক ছিল যে, কৃষ্ণ সাগরের তীরে একটি রণতরীকে সব সময় সতর্ক থাকার আদেশ দেয়া হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত স্থাপিত হয়েছিল এবং তারা নিজ নিজ কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল। এ সমস্ত কাজ বিদ্রোহীদেরকে আরো উত্তেজিত করে দিয়েছিল। ধর্মীয় দলের লোক যারা জনসাধারণের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করেছিলেন, হয়ত ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানো হয়েছিল অথবা গোপনে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। কোথাও সহানুভূতি ও অনুগ্রহের সঙ্গে কাজ নেয়া হয়নি।

মোস্তফা কামাল নিজের পরিকল্পনাকে পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার কোন উৎকণ্ঠা ছিল না যে, তিনি কাজের জন্য কি উপায় ও কি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। লোকদের গ্রেফতার করা হতো কেবল এই অভিযোগে যে, হাসি-ঠাট্টা করেছে এবং এ কারণে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। দোষী ও নির্দোষী উভয়ে সমানভাবে তার লক্ষ্যস্থল হয়েছিল। তিনি তদন্তকারী আদালতসমূহকে দ্রুত গতিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিরস্কার করেননি এবং জাতির ইচ্ছাশক্তিকে ভঙ্গ করতে কোন দ্বিধাবোধ করেননি। ঐ সময় তিনি অহংকারের সঙ্গে প্রায় বলতেন, আমিই তুর্কী, আমাকে পরাজিত করা তুর্কীকেই পরাজিত করা। তার উন্মাদনা, আন্তরিকতা ঐ সমস্ত লোককেও উত্তেজিত করেছিল যারা তাকে তুরস্কের মুক্তিদাতা মনে করতেন।

হ্যাটের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তিনি জয়যুক্ত হলেন। আদালতসমূহ কৃতকার্য হলো এবং জনসাধারণ নিজের পরাজয়ের কথা স্বীকার করে নিল। মোস্তফা কামাল তার এই জয় লাভকে দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করার উদ্দেশে মক্কা শরীফের বিশ্ব ইসলামী সংগঠনের সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য সংসদের একজন সদস্য আদীব সরওয়াতকে তার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠালেন। আদীব সরওয়াত একমাত্র মুসলমান প্রতিনিধি ছিলেন, যিনি হ্যাট পরে ঐ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন এবং অন্যান্য মুসলমান প্রতিনিধি অপ্রসন্নভাবে তাকে অভ্যর্থনা করলেন।[১]

---

১. Irfan Orga Margarete : (Ataturk, Michael Jesph Ltd., London 1982.), p. 265.

যা হোক, আতাতুর্কের জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে তার স্বভাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ, তার কর্ম ও চরিত্রের কথা বর্ণনা করে গ্রন্থকার লিখেছেন :

তার জীবনে তিনি দুঃখ ও নৈরাশ্যের সম্মুখীন হয়েছেন। তার আনন্দের সুযোগ খুব কমই হয়েছে। তিনি দরিদ্রদেরকে ভালবাসতেন, ধনীদেরকে ঘৃণা করতেন। তিনি চিন্তাবিদ ও আলিমদেরকে খুব ভয় করতেন। কারণ তার চেয়ে চিন্তাবিদ ও আলিমদের শক্তি বেশি ছিল। তিনি মদ, মেয়েলোক ও সঙ্গীতকে ভালবাসতেন। তিনি ঐ সমস্ত লোককে ঘৃণা করতেন যারা তার মতের বিরোধী ছিল, যদিও তিনি তাদেরকে কোন কোন সময় নিজ উদ্দেশে কাজে লাগাতেন। তার শক্তিশালী সংকল্প, একগুঁয়েমি, পাষাণহৃদয় মনোভাব, বুদ্ধিমত্তার পরিচ্ছন্নতা তাকে শ্রেষ্ঠ স্থানে পৌছিয়েছে। তার স্বভাব ও প্রতিভা একে অপরের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে বেড়ে যায় এবং উন্নত হয়। তার শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য ছিল যে, তার উদ্দেশ্য ছিল নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ এবং যুগের একটি শাসনকে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্থাপন করা। এর সঙ্গে তার এই বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি পরাজিত হওয়া ও ধ্বংসের মুখে পৌছার পরও নিজ কল্পনার ওপর অটল থাকতেন এবং সেখান হতে সরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না।[১]

কামাল আতাতুর্কের সংস্কার ও তার বিপ্লবী পদক্ষেপ

কামাল আতাতুর্কের প্রসিদ্ধ ইংরেজ জীবনী লেখক H. C. Amestrong তার সংশোধনী ও বিপ্লবী কর্মতৎপরতার ওপর আলোকপাত করে বর্ণনা করেছেন :

কামাল আতাতুর্ক বড় পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং তিনি অসাধারণ ও সাধারণ কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে আরম্ভ করেছিলেন, যা তিনি ইতিপূর্বে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তুরস্ককে পুরাতন ও পঙ্কিল অতীত হতে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং যে সমস্ত আবর্জনা তাকে দূরে রেখেছে তা সরাতে হবে। তিনি পুরাতন রাজনৈতিক কাঠামোকেও ভেঙ্গে ফেললেন এবং রাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যকে সাধারণ গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করেছিলেন। ক্ষুদ্র পর্যায়ের এক ধর্মীয় রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক দেশ বানিয়েছিলেন। তিনি বাদশাহ (খলীফা)-কে পদচ্যুত করে পুরাতন উসমানী রাজত্ব হতে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দিলেন। এখন তিনি জাতির বুদ্ধিমত্তা, তাদের

---

১. Irfan Orga Margarete : (Ataturk, Michael Jesph Ltd., London 1982.), p. 296-297.

পুরাতন সিল্ক, কল্পনা, আচার-ব্যবহার ও অভ্যাস, পোশাক, কথার রীতিনীতি, সামাজিকতা ও পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ পর্যন্ত পরিবর্তন করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, যা তাদেরকে অতীত ও প্রাচ্যের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। সম্পূর্ণ বিপ্লব ও পরিবর্তনের এই কাজ নতুন রাজনৈতিক কাঠামো তৈরির চেয়ে বেশি কঠিন ছিল। এ কাজ দুরূহ হওয়ার বিষয়টি তার জানা ছিল। একবার তিনি বলেছিলেন, আমি শত্রুর ওপর জয়ী হয়েছি এবং দেশ জয় করেছি। কিন্তু আমি কি আমার জাতির ওপরও জয়ী হতে পারব?[১]

কামাল আতাতুর্ক প্রকৃতপক্ষে জাতির ওপর জয়যুক্ত হয়েছিলেন। দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন, যাতে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করেনি। দীন ও রাজনীতির মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল এবং সিদ্ধান্ত করা হলো যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রত্যেক মানুষ নিজের জন্য কোন একটি ধর্ম বেছে নিতে পারে কিন্তু রাজনীতিতে ধর্মের কোন অধিকার থাকবে না। খেলাফত ব্যবস্থাকে শেষ করে দেয়া হয়েছে। ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনা এবং ইসলামী আইনকে দেশ হতে বের করে সুইজারল্যান্ডের দেওয়ানী আইন, ইতালির ফৌজদারী আইন ও জার্মানীর ব্যবসা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন প্রচলিত করে দিলেন। ব্যক্তিগত আইনকে ইউরোপের দেওয়ানী আইনের অনুরূপ এবং তার অধীন করে দেয়া হলো। দীনী শিক্ষা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। পর্দাকে আইনবিরোধী সাব্যস্ত করা হলো। সহশিক্ষা প্রচলিত করা হলো। আরবী বর্ণের স্থলে ল্যাটিন বর্ণমালা প্রচলন করা হলো। আরবীতে আযান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। জাতির পোশাক পরিবর্তিত হলো। হ্যাটের ব্যবহার অপরিহার্য বলে গণ্য করা হলো। অর্থাৎ কামাল আতাতুর্ক সাবেক ইংরেজ ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে তুর্কী জাতি ও রাষ্ট্রের দীনী ভিত্তিকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে শেষ করে দিলেন এবং জাতির দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিলেন।[২]

রাষ্ট্রকে ধর্মহীন বানাবার বিল পাস করে কামাল আতাতুর্ক সংসদের অধিবেশনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার সারসংক্ষেপ পেশ করে ইরফান ওর্গা লিখেছেন : এ ভিত্তির ওপর নীরবে ও সুন্দরভাবে কাজ করে মোস্তফা কামাল ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ একটি বিল পাস করলেন। ঐ বিল তুরস্ক রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) রাষ্ট্রে পরিবর্তন করে এবং খলীফার পদ বিলুপ্ত করে দেয়া হলো। বিল পাস করতে গিয়ে

১. Grey Wolf, p. 287.

২. Ataturk, p. 290.

মোস্তফা কামাল এই বিষয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, উসমানী রাষ্ট্র ইসলামী ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়েছিল। ইসলাম নিজ গঠন, কল্পনা ও চিন্তা হিসেবে আরবী। ইসলাম জন্ম-মৃত্যু পর্যন্ত নিজের অনুসারীদের জীবন গঠন করে এবং তাদেরকে নিজের বিশেষ প্রকৃতিতে গড়ে তোলে। ইসলাম তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কমিয়ে দেয় এবং তাদের সাহস ও আগ্রহে বাধা সৃষ্টি করে। ইসলামী বিষয়গুলো বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে রাষ্ট্রের জন্য বিপদ আনয়ন করবে।[১]

নতুন সিদ্ধান্ত ও ঐ সমস্ত সংশোধনী যার প্রভাব ইসলামের ভবিষ্যতের ওপর পড়েছে এবং তা দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, তাকে চিহ্নিত করে লিখেছেন : সংসদ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে অথবা যার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় নি, প্রকৃতপক্ষে তা ইসলামের জন্য ভীষণ আঘাত ও মৃত্যু সংবাদের তুল্য ছিল। মূলত তা একমুখী শিক্ষা আইন ও শিক্ষানীতির গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে সমস্ত শিক্ষার পদ্ধতি যা এ গণতন্ত্রীয় রাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল, তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিকার ও আওতায় এসে যায়। এই পরিবর্তন দ্বারা শিক্ষকদের কর্মতৎপরতা ও ঐ সমস্ত আলিম ও শিক্ষকের স্বাধীনতা শেষ হয়ে গেল যারা ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দান করতেন। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ধর্মীয় কার্যসমূহের একটি দপ্তর স্থাপন করা যা একজন পরিচালকের অধীনে ছিল এবং যা শরীয়ত ও ওয়াকফসমূহের পুরাতন মন্ত্রণালয়ের স্থলবর্তী ছিল। এ মন্ত্রণালয়ের কাজ ছিল ধর্মীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যাবলী সম্পন্ন করা এবং মসজিদ ও এতীমখানাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা। কিন্তু এর পদ্ধতি ও কাজের নীতি ভীষণ ভুল ছিল এবং তা লজ্জাকরভাবে ব্যবহৃত হতো।[২]

কেবল আরবী বর্ণমালার স্থলে ল্যাটিন বর্ণমালা প্রচলন করায় তুর্কী জাতির জীবনে ভীষণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এমন এক নতুন বংশধর জন্মগ্রহণ করেছে যার সংস্রবে তারা পুরাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি হতে ছিন্ন হয়েছে। পুরাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ও সাহিত্যের ওপর যে বিপ্লবী প্রভাব পড়েছে তাকে আমাদের সময়ের সর্বজনগৃহীত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদ আরনল্ড টয়েনবী (Arnold Toynbee : A Study of History)-তে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

---

১. Ataturk, p. 241.

২. ঐ, p. 242.

একটি পুরাতন বর্ণনা মতে ইস্কান্দরিয়ার লাইব্রেরীর সমস্ত সম্পদ যা নয় শ' বছরের অধিক সময়ের কষ্টের ফল ছিল তা সর্বসাধারণের হাম্মামখানাকে গরম করার জন্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।[১]

আমাদের সময় কিতাবসমূহ জ্বালিয়ে ফেলা সম্পর্কে হিটলার ঐ সমস্ত কাজ করেছে যা তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল। কিন্তু ছাপাখানাসমূহ স্থাপিত হওয়ার কারণে বর্তমানে অত্যাচারী শাসকদের জন্য এদিকে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ জ্বালিয়ে ফেলার কাজে পূর্ণ সফলতা অর্জন করা বড় কঠিন।

হিটলারের সমসাময়িক মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক একটি উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করেছেন। তুর্কী ডিকটেটর (স্বাধীন লাগামবিহীন শাসক)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, নিজ দেশবাসীর মনোভাবকে ইরানী সভ্যতার পরিবেশ থেকে মুক্ত করে (যা তার ওয়ারিসীসূত্রে পেয়েছে) জোরপূর্বক পাশ্চাত্য সভ্যতার ছাঁচে রূপান্তর করা এবং তিনি কিতাবসমূহ জ্বালাবার স্থানে বর্ণমালা পরিবর্তন করে ক্ষান্ত হলেন। এই আইন প্রচলন করার পর তুর্কী গাযীর জন্য চীন সম্রাট অথবা আরব খলীফার নকল করা নিষ্প্রয়োজন হয়ে গিয়েছিল। ফার্সী, আরবী ও তুর্কী ভাষার সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল সম্পদসমূহ এখন নতুন বংশধরদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। এখন আর কিতাব ও গ্রন্থগুলো পুড়ে ফেলার প্রয়োজন রইল না। কেননা বর্ণমালা যা তাদের চাবিস্বরূপ ছিল তা বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে ঐ সম্পদগুলো নিরাপদে আলমারিসমূহে বাঁধা অবস্থায় থাকতে পারে। কতক বয়স্ক আলিম ছাড়া ঐ সমস্ত কিতাবে হাত লাগাবার আর কেউ ছিল না।[২]

আতাতুর্ক তুর্কী জীবন হতে ইসলামী ও আরবী মূল বিষয়গুলোকে সরিয়ে দেয়ার কাজে আশ্চর্যজনক ও নজিরবিহীন সফলতা লাভ করেছিলেন। তুর্কী জাতি ছাড়া যদি অপর কোন জাতি হতো তা হলে তাদের সম্পর্ক ইসলাম ও তার অতীত হতে সকল সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং ইসলামী দুনিয়াতে অন্য একটি অভিজ্ঞতা হতো, যেমন স্পেনে হয়েছে। অর্থাৎ স্পেনে যেমন মুসলমানের পতনের পর ইসলামের নাম ও চিহ্ন পর্যন্ত নেই, ঠিক তুরস্কের অবস্থাও তাই হতো।

---

১. ইস্কান্দরিয়া পুস্তকালয় জ্বালাবার প্রচলিত কিংবদন্তীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, হযরত উমর (রা)-এর আদেশক্রমে জ্ঞানের সম্পদে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। ঐতিহাসিক সূত্রে এখন এই প্রবাদ অমূলক সাব্যস্ত হয়েছে। মাওলানা শিবলী মরহুম তাঁর পুস্তক কুতুবখানা ইস্কান্দরিয়াতে এই ভ্রান্ত তথ্যের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মর্যাদাকে সম্পূর্ণভাবে খতম করে দিয়েছেন।

২. RNOLD TOYNBEE : A STUDY OF HISTORY ৫১৮-৫১৯ পৃ.।

কিন্তু তুর্কী জাতি উত্তরাধিকার ও বংশগতসূত্রে ইসলামের ভক্ত। ইসলামের সাথে, নবীয়ে আরবী (সা), হিজাযী দীন, তার কেন্দ্র ও তার রীতিনীতির সাথে তাদের আবেগপূর্ণ আত্মিক ও মানসিক সম্বন্ধ রয়েছে। ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্কের ভিত্তি এমন খাঁটি মানুষের পূর্ণ হাতে মোবারক সময় রাখা হয়েছে যে, তুর্কী জাতি সমষ্টিগতভাবে ও ধর্মীয় হিসেবে এখনও ইসলামের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। একজন পর্যটকের দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের উত্তাপ, ঈমানের যে শক্তি ও ইসলামের জন্য যে উষ্ণ আবেগ, উদ্যম ধরা পড়েছে তা অন্যান্য মুসলমান জাতির মধ্যে বহু কম দেখা যায়। এর ফলে কামাল আতাতুর্কের পর দীনী জাগরণের নিদর্শন বরাবর প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী সরকারসমূহও অনেক বাধ্যবাধকতাকে ঢিলা করে দেয়া সঙ্গত মনে করলেন। জনসাধারণ দ্বিতীয়বার ইসলামের সাথে তাদের গভীর সম্পর্কের কথা প্রকাশ করল এবং বার বার নির্বাচন ও ভোটের শক্তি দ্বারা নিজেদের জন্য উত্তম অবস্থা ও ভাল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। যদি কোন অসাধারণ অবস্থা সৃষ্টি না হয় তবে এখনও তার সম্ভাবনা আছে যে, তুর্কী জাতি ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য উপকারী খেদমত সমাধা করতে পারে এবং সেখানে ইসলামের আবারও ফুলে ফলে সজ্জিত হবার সুযোগ হতে পারে।

ইসলামী বিশ্বে কামাল আতাতুর্কের অসাধারণ স্বীকৃতি

এ সব কারণে তুর্কী জাতি শুধু নব আন্দোলন নয়, বরং আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য রীতিনীতির ইমাম এবং ইসলামী দেশ ও রাষ্ট্রের প্রগতিবাহী নেতাদের জন্য অনুসরণযোগ্য একটি নমুনা ও আদর্শস্বরূপ হলো। কামাল আতাতুর্ক মুসলিম বিশ্বের উন্নত সমাজসমূহ ও নতুন স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশসমূহের উন্নতি ও পরিবর্তনের দিশারী হলেন এবং রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদ উভয়ের জন্য একজন আদর্শ নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। স্বাধীন মুসলিম দেশসমূহের ক্ষমতাশালী শ্রেণী ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এমন কোন নেতা দেখা যাচ্ছে না যিনি এত সীমাবদ্ধ ও হালকা বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের অধিকারী হয়ে এবং চারিত্রিক নিকৃষ্টতা[১] সত্ত্বেও মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে মোহিত করতে পেরেছিল। সেই সঙ্গে নিজ ব্যক্তিত্ব ও কীর্তি দ্বারা এত অধিক প্রভাবিত করেছিল যে, মানুষের মনেও তার অনুকরণ করার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল যেমন কামাল আতাতুর্ক শেষ যুগে করেছিলেন।

---

১. ইরফান ওর্গা নিজ গ্রন্থ (Ataturk)-তে এ কথার ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছিলেন, বিশেষভাবে ২৫২ পৃষ্ঠা দেখুন।

এর সবচেয়ে বড় কারণ এই সুখ্যাতি ছিল যে, তিনি তুরস্ককে খুব সঙ্কটপূর্ণ সময়ে এমন এক বিপদ হতে রক্ষা করেছেন যে সময় তুরস্কের জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তিনি একটি শক্তিশালী সরকার গঠন করলেন এবং পাশ্চাত্য শাসকদের ও পাশ্চাত্য রাজনৈতিক নেতাদেরকে নিজের দৃঢ় সংকল্প ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মুখে নতশির করে দিয়েছিলেন। প্রাচ্যের মুসলমানগণ ঐ সময় রাজনৈতিক শক্তি, সম্মান ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। যে ব্যক্তির মধ্যে এই সমস্ত গুণ দেখা যেত ঐ ব্যক্তিকে তাদের প্রিয় নেতা মনে করতেন এবং তার সম্মুখে বিনীতভাবে মাথা নত করে দিতেন। কামাল আতাতুর্কের সাথে এই ঘটনা ঘটেছে। মুসলমানদের মনে তার প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল।

এর দ্বিতীয় কারণ এই ছিল যে, তার সংস্কারসমূহ ইসলামী দেশসমূহের জাতীয় নেতাদের উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ছিল এবং তিনি তাদের প্রকৃত কল্পনা ও আবেগের মুখপাত্র ছিলেন। তাদের মনে যে বিদ্রোহ, পরিবর্তন ও দীনের প্রতিবন্ধকতা হতে মুক্তির যে ভীষণ অভিলাষ ছিল এবং নিজ জাতিকে সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার কাঠামোতে ঢালাই করবার পুরাতন আবেগ আন্দোলিত হচ্ছিল, কামালের এ সমস্ত সংস্কার তাদের জন্য উচ্চ ও সফল অভিজ্ঞতা ও নমুনা সংগ্রহ করেছিল।

এর কারণ যা-ই হোক, এর ফল এই হলো যে, কামাল আতাতুর্ক ইসলামী প্রাচ্যে এমন স্থান ও পদ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন যা দীর্ঘ দিন হতে কোন প্রাচ্য নেতা অর্জন করতে পারেননি। মুসলিম জাতিসমূহের প্রবণতা, মনোযোগ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর তুরস্কের বিপ্লবের গভীর প্রভাব পড়েছে এবং এই প্রভাব পড়া স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ছিল।

ভারতবর্ষ, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দ্বন্দ্ব

দ্বিতীয় ক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষ। যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দ্বন্দ্ব বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সভ্যতার অজুহাতের ভিত্তিতে এভাবে সম্মুখে এসেছিল যে, তাদের সম্মুখে দু'টি রাস্তা ছাড়া অন্য কোন রাস্তাই ছিল না। প্রথম রাস্তা হলো আকীদা ও ঈমানের ভিত্তিতে ইসলামী জীবনকে প্রাধান্য দেয়া, দ্বিতীয় রাস্তা পাশ্চাত্য জীবনকে নির্বাচিত করা পার্থিব শক্তি ও উন্নতির ভিত্তিতে।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন (যা প্রাচ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিনিধি ও উকীল ছিল) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার নিজের সাথে আধুনিক জ্ঞান, আধুনিক শৃঙ্খলা,

এতদসম্পর্কীয় যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ এবং চিন্তাধারা ও কল্পনার এক বড় বাহিনী এসেছিল। ভারতীয় মুসলমান তখন ক্ষতিগ্রস্ত, বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত ছিল। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা বিপ্লব মুসলমানদের সম্মান ও আত্মমর্যাদার ওপর ভীষণ আঘাত ছিল। অন্যদিকে বিজেতা জাতির ভয়, নতুন অবস্থার ভীতি, অকৃতকার্যতার লজ্জা, বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ এবং মিথ্যা দুর্নাম ও অপবাদের সম্মুখীন, তারা হয়েছিল। তাদের সম্মুখে এমন এক বিজেতা ছিল, যারা শক্তি ও আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। এমন এক সভ্যতা ছিল যা আধুনিকতা, কর্ম ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এছাড়া জটিলতাপূর্ণ অনেক বিষয় এমন ছিল, যা শীঘ্র এক দূরদর্শিতাপূর্ণ সমাধান ও মীমাংসাকারী স্পষ্ট পন্থার আকাঙ্ক্ষী ছিল।

দীনী নেতৃত্ব ও দারুল উলুম দেওবন্দ

এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ও সঙ্কটময় মুহূর্তে দু'প্রকারের নেতৃত্ব পরিস্ফুট হলো। প্রথম নেতৃত্বে ছিল দীনী নেতৃত্ব যার পতাকাধারী ছিলেন দীনী আলিমগণ। দ্বিতীয় নেতৃত্বের পতাকাধারী ছিল স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং তাঁর অনুসারী ও আধুনিক চিন্তাধারার লোকেরা। আলিমগণকে তাদের ধর্মীয় দৃঢ়তা, পরহেযগারী, তাকওয়া, কুরবানী, আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাসের জন্য ও দীনের পথে কুরবানী করার ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তিশালী দীনী ব্যক্তিত্ব ও উৎস নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু এই অত্যাচার, বর্বরতা, অসাধারণ হৃদয়হীনতা, নির্দয় হওয়ার দরুন যা ইংরেজ শাসকগণ মুসলমানদের ব্যাপারে প্রকাশ করেছিল এবং যাদেরকে তারা ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের প্রধান পথ প্রদর্শক ও প্রকৃত নেতা গণ্য করেছিল।[১]

খৃস্ট ধর্মের প্রচার ও রেওয়াজ দেয়ার জন্য সরকারের জোর চেষ্টা, উদ্যম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা জনসাধারণের মধ্যে অসাধারণ দ্রুততার সাথে গ্রহণযোগ্য হওয়া, মুসলমানদের আকীদা, চরিত্র ও সমাজে তার প্রভাব বিস্তারের কারণে আলিমগণ আক্রমণাত্মক নীতির পরিবর্তে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। তারা এই চিন্তা করতে শুরু করলেন যে, দীনী আবেগ, ইসলামী প্রাণ, ইসলামী জীবনের নিদর্শন ও ইসলামী সভ্যতার যা কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট রয়েছে ঐ সবকে রক্ষা করা দরকার। তাই তারা ইসলামী সভ্যতা ও সামাজিকতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এভাবে এমন কিছু দুর্গ তৈরি করলেন যেখানে (যাকে আরবী মাদ্রাসা নামে অভিহিত করা হয়েছে) মোবাল্লিগ তথা দীনী প্রচারক তৈরি করা যায়।

১. বিস্তারিত জানার জন্য গ্রন্থকারের 'হিন্দুস্তানী মুসলমান' গ্রন্থখানি দেখুন।

এই বৃহৎ সংস্কার ও শিক্ষা আন্দোলনের (যার আরম্ভ ১২৮৩ হি. মোতাবেক ১৮৬৬ খ্রী.) নেতা ছিলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতভী (র)। তিনি হলেন দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা। মাওলানা সৈয়দ মানাযির আহসান গীলানী মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম সাহেবের জীবনচরিতে লিখেছেন :

১৮৫৭ সালের গণবিদ্রোহে অকৃতকার্য হওয়ায় তাঁর (মাওলানা কাসিম সাহেব) মস্তিষ্ক নতুন যুদ্ধক্ষেত্র তৈরির কাজে ব্যস্ত রইল। দারুল উলুম দেওবন্দ শিক্ষা পদ্ধতি ছিল এ কার্য প্রণালীর সবচেয়ে বেশি উদীয়মান কেন্দ্রীয় ও মৌলিক উৎস।

শামলী[১] ময়দান হতে ফিরে আসার পর চিন্তাবিদগণ নিরাশ হয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দেননি এবং হাত-পা গুটিয়ে বসেও থাকেননি, বরং ইসলামের স্থায়িত্বের ও দীনী ইলমের হিফাজতের মূল উদ্দেশ্যকে অগ্রসর করবার লক্ষ্যে তাদের মস্তিষ্ক চিন্তা-ভাবনায় ব্যস্ত ছিল এবং তাদের হৃদয়ও বিশ্বজগতের কেন্দ্রীয় শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে গায়বী রহমত প্রকাশের অপেক্ষা করেছিল।[২]

মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম সাহেবের যোগ্য ছাত্র ও তাঁর স্থলবর্তী মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব দেওবন্দী (শায়খুল হিন্দ) কাসিম জীবন-চরিতের গ্রন্থকারকে প্রশ্ন করে বলেছিলেন :

শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ এই মাদ্রাসাকে কি শুধু শিক্ষা নেয়া ও শিক্ষা দেয়ার জন্য স্থাপন করেছিলেন? মাদ্রাসা আমার সম্মুখে স্থাপিত হয়েছে। আমি যতদূর জানি, ১৮৫৭ সালের হাঙ্গামায় অকৃতকার্য হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় যে, এমন একটি কেন্দ্র স্থাপন করা যায় যেখানে মানুষ তৈরি করা যায় যেন ১৮৫৭ সালের অকৃতকার্যের ক্ষতি পূরণ করা যায়।[৩]

এই আন্দোলন ও তার নেতাগণ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে দীনের প্রেম, শরীয়তের সম্মান, ঐ রাস্তায় উৎসর্গ করবার শক্তি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মুকাবিলায় শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেন যা অপর কোন ইসলামী দেশে দেখা যায় না যাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ক্ষমতার সাথে সম্পর্ক হয়েছে। দেওবন্দ

---

১. শামলী মুযফফরনগর জেলাতে দিল্লী সাহারানপুরের ছোট লাইনের নিকট অবস্থিত। একটি আবাদ ছোট শহর খাদ্যশস্যের বড় বাজার। এখানে ১৮৫৭ সালে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কা (র), মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম (র) ও তাঁর বন্ধুগণ ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং হাফেজ যামিন (র) শহীদ হয়েছেন।

২. সাওয়ানেহে কাসেমী, ২য় খণ্ড, ২২৩-২২৪ পৃ.।

৩. ঐ, ২২৬ পৃ.।

মাদ্রাসা এই প্রবণতার পতাকাধারী এবং ভারতে পুরাতন ইসলামী কৃষ্টি, সভ্যতা ও তরবিয়তের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র।

নদওয়াতুল উলামার আন্দোলন

নদওয়াতুল উলামার সংগ্রামী চিন্তাধারা (১৩১১ হি. মোতাবেক ১৮৯৩ খ্রী.) এর প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী মোংগীরী ছিলেন।[১] যার পরিচালনা তাঁর পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত মাওলানা শিবলী[২] ও তাঁর বিখ্যাত বন্ধুগণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাকেন্দ্রের এই যোগ্যতা ছিল যে, তা ইসলামী ও পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও দীনী আলিম ও আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করতে পারে এবং এমন এক চিন্তাধারা যা ভারসাম্য রক্ষা করে পুরাতন ও নতুন উভয়ের সৌন্দর্যকে একত্র করে। এই বিশেষ চিন্তাধারার তত্ত্বাবধানকারিগণের মতে মূলনীতি ও উদ্দেশ্যাবলীর ব্যাপারে শক্ত ও অনমনীয় হতে হবে। উপকরণ, উপায়সমূহ ও শাখাগত বিষয়ে প্রসারতা ও নমনীয়তা থাকবে।

তাঁদের নিকট দীনী শিক্ষার পাঠ্য তালিকা পরিবর্তনশীল, উন্নয়নশীল ও প্রশিক্ষণের বাহক ছিল, যাকে যুগের পরিবর্তন ও চাহিদার অনুরূপ (নিজ মূল উদ্দেশে ও মৌলিক জ্ঞানসমূহ রক্ষার সঙ্গে) পরিবর্তন করা যায় এবং উন্নতি লাভ করতে প্রস্তুত রাখা যায়। তাদের মতে একটি প্রস্তরতুল্য, স্থীর ও অপরিবর্তনীয় (Fossilised) পাঠ্য তালিকার স্থলে এমন এক পাঠ্য তালিকা হওয়া চাই যা জীবিত ও বর্ধন উপযোগী, উন্নতি ও প্রশস্ততার যোগ্যতায় পরিপূর্ণ। অপর এক বর্ণনা মতে, দীন এক চিরস্থায়ী প্রকৃতি যার মধ্যে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জ্ঞান একটি ফলে ফুলে সজ্জিত বৃক্ষ, যার ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি সব সময় হতে থাকবে। ইসলাম তাদের নিকট চিরস্থায়ী ও জগৎজোড়া দীন ও জীবন। এই কারণে মানবীয় বুদ্ধিমত্তার উন্নতি, পতন ও পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের সাথে তার সম্মুখীন হতে হয় এবং সমস্ত পরিবর্তিত অবস্থা, কল্পনা ও চিন্তাসমূহের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং যে সমস্ত সন্দেহ-দ্বিধা সৃষ্টি হয় তাকে দূরীভূত করা তার একটি স্বাভাবিক কাজ। কারণ শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের প্রতিনিধি ও তার ব্যাখ্যাদাতাদেরকে প্রস্তুত করে নিজ সীমাকে সর্বদা প্রশস্ত করতে থাকা এবং নিজ যোগ্যতা ও জীবনের প্রমাণ দিতে থাকা দরকার।

---

১. তাঁর অবস্থা ও জীবনচরিতের ব্যাপারে নদওয়াতুল উলামার প্রচারিত মুহাম্মদ আল হাসানীর লিখিত মৌলানা মুহাম্মদ আলীর জীবন চরিত দেখুন।

২. মাওলানা সুলাইমান নদভীর লিখিত হায়াতে শিবলী দেখুন।

নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতাগণ সংস্কার ও পাঠ্যতালিকার প্রশস্ততার কথা উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন। ভারতে এই আওয়াজ (যারা পুরাতন পাঠ্যতালিকাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ছিল) অপরিচিত ছিল। অপর ইসলামী দেশসমূহেও এখনও এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, এমন কি আল-আযাহার বিশ্ববিদ্যালয় এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তার কিঞ্চিৎ ধারণা এই দুই উদ্ধৃতি দ্বারা করা যায়। তার মধ্যে একটি নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী মোংগীরী (র)-এর রচনা হতে গৃহীত হয়েছে। অপরটি মাওলানা শিবলী নুমানীর লেখা থেকে।

"এই সময় অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ঐ সমস্ত আপত্তি যা প্রথমে দর্শন সম্পর্কে করা হয়েছিল বর্তমানে তা কেউ জিজ্ঞাসা করে না এবং প্রশ্নকারী দলও বাকি নেই। বর্তমানে ঐ সমস্ত প্রশ্ন ও তার ওপর শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। এখন নতুন জগৎ, নতুন বীজ, নতুন পানি। আধুনিক দর্শনের ভিত্তির ওপর বর্তমান সময়ের ইসলামের শত্রুরা নতুন নতুন ধরনের প্রশ্ন করেছে যা পূর্বে ছিল না। এর উত্তর সন্তোষজনকভাবে দেয়া পুরাতন দর্শনের জ্ঞান দ্বারা সম্ভব নয় যদিও যে যতই দাবি করুক। তার কারণ সমালোচকের সন্তোষজনক উত্তর ঐ সময় হতে পারে যখন সমালোচনার শেষ সীমাকে ভাল মতে বুঝে নিতে পারে এবং এ কথাও জানা যায় যে, কোন্ ভিত্তির ওপর তিনি এ আপত্তি করেছেন।[১]

এই গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান নয় এবং আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান ও মারেফত ঐ সমস্তের ওপর নির্ভর করে না। ইমাম গাযযালী (র) নিজের সময় ঐ সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এ কারণেই আলিমদের পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যেন তারা ঐ সমস্ত গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে যা ঐ সময়ে বেশির ভাগ বাতেনী জ্ঞানের ধারক (বাতেনী সম্প্রদায়) প্রচার করেছিল, জ্ঞাত হয়ে ঐ সময়ের নাস্তিকতার মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বর্তমানে ঐ নাস্তিকও নেই। গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানও নেই এবং তাদের বিষয়ের সত্যতার প্রতি বর্তমান বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানের দাবিদারগণ বিশ্বাস করে না। এ কারণে তার প্রভাব আপনাআপনিই শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে ঐ স্থলে নতুন বিজ্ঞান, নতুন বিষয়, নতুন গবেষণাকর্ম এসেছে। বর্তমানে, এ কথা বলা যায় যে, আমাদের আলিমগণ এই নতুন জিনিসের জ্ঞান অর্জন করে ইসলামের দৃষ্টিতে নতুন জটিলতার সমাধান প্রদান করবেন এবং নতুন সন্দেহের প্রকৃত উত্তর দেবেন।[২]

---

১. মুহাম্মাদিয়া পত্রাবলী/ মাকাতীবে মুহাম্মদীয়া।

২. হায়াতে শিবলী, ২০ পৃ.।

এটা একটি মোবারক পদক্ষেপ ও একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। নদওয়াতুল উলামার আন্দোলন কেবল পাঠ্যতালিকার সংস্কারের আন্দোলন ছিল না, বরং তা একটি স্থায়ী চিন্তাধারার কেন্দ্র ছিল। তার অনুকরণ ঐ দেশসমূহের প্রত্যেকের করা উচিত ছিল যে সমস্ত দেশ পুরাতন ও আধুনিকতার যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং দ্বন্দ্বের শিকার ছিল।

কিন্তু এই আন্দোলনের পুরাতন ও আধুনিক দু'দলের মত পার্থক্যের জন্য কার্যকর ও উৎসাহব্যঞ্জক সাহায্য অর্জন করতে পারল না যা তার প্রয়োজন ছিল। তার বড় কারণ হলো ঐ সমস্ত চিন্তাবিদ ও দাওয়াতদাতার অভাব যারা এই দুই সংস্কৃতির বাহক ও উভয় সংস্কৃতির মিশ্রণে একটি পরিষ্কার, সংযত, সুন্দর ও উপকারী সুসমন্বিত দ্রব্য বানাতে পারে, যেমন মৌমাছি বিভিন্ন গাছের ফুল থেকে রস সংগ্রহ করে মধু প্রস্তুত করে।

অর্থাৎ জাতির এক বড় অংশ ঐ দু' দলের মধ্যে টানা-হেঁচড়ার মধ্যে পড়ে গেল যার একদল পুরাতন শিক্ষানীতি ও পুরাতন পথ হতে চুল পরিমাণ সরে যাওয়া এক প্রকার পরিবর্তন ও বিদআত মনে করে। দ্বিতীয় দল পাশ্চাত্য হতে আগত প্রতিটি বস্তুকে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র মনে করে এবং তাকে সব রকম দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত মনে করে, এমন কি পাশ্চাত্য নাগরিকদের চিন্তাসমূহ ও চিন্তার প্রবণতাকে অনুরূপ শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতার প্রতিচ্ছবি বলে মনে করে। তারা এটাকে মানবীয় চিন্তা-ভাবনার উন্নতির শেষ সীমা বলে ধারণা করে। এই দু' দলের চিন্তা ও মূল্যবোধের মধ্যে যে বৈপরীত্য ছিল এবং যেভাবে দু' দল শেষ সীমার উচ্চতম চূড়ায় ছিল তার ছবি আঁকবার ইলাহাবাদী এই শ্লোকে অঙ্কন করেছেন :

ادھر یہ ضدھے کہ لمنڈ بھي چھونہیں سکتے
ادھر یہ رٹ ھے کہ ساقی صراحی مے لا

অর্থাৎ এ দিকে এই হঠকারিতা যে, পানীয় পর্যন্ত স্পর্শ করা যাবে না, ঐ দিকে সর্বক্ষণ বলা হচ্ছে, হে সুরাবাহি! সুরার পাত্র নিয়ে এসো।

এসব সত্ত্বেও নদওয়াতুল উলামার চিন্তাধারা ও কল্পনা এমন ভারসাম্য রক্ষাকারী ও সংযত যে, যা এখনও এই যোগ্যতা রাখে যে, তা দীনী শিক্ষানীতিকে জীবনের একটি নতুন দিক দান করতে সক্ষম এবং তা দ্বারা জাতি পুরাতন ও আধুনিক রীতিনীতির এই দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধে লিপ্ত দু'দলের বিবাদ হতে মুক্তিও পেতে পারে। তাদের এই বিবাদ ইসলামী দেশসমূহে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছে যার কারণে কোন কোন দেশ ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

নদওয়াতুল উলামার আন্দোলনের পরিচালক ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি ইসলামী সংস্কৃতির প্রকাশ ও নবী করীম (সা)-এর চরিত রচনা ও সম্পাদনা করা, ইসলামী কার্যাবলী ও তার শিক্ষাসমূহকে আধুনিক জ্ঞান ও সাহিত্যের স্টাইলে পেশ করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আল্লামা শিবলী নুমানীর জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য ও রচনাসমূহ। বিশেষ করে তাঁর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব সীরাতুন্নবী, আল-ফারুক, আল-গাযালী, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী ও তাঁর দর্শন ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমূহ ভারতের নতুন বংশধরকে প্রভাবিত করেছে। তাদের হীনম্মন্যতার অনুভূতিকে দূরীভূত করতে মূল্যবান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। তদ্রূপ তাঁর যোগ্য ছাত্র ও তাঁর স্থলবর্তী মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভীর অবদান ও তাঁর জ্ঞানগর্ভ কীর্তিসমূহ হতে দৃষ্টি এড়িয়ে রাখা যায় না।

প্রকাণ্ড চার খণ্ড সীরাতুন্নবী কিতাব ও ইলমে কালামের এক মূল্যবান গ্রন্থাগার। সীরাত তাঁর খুতবাতে মাদ্রাজ নবী চরিতের প্রভাবশালী ও বহু উপকারী কিতাবের মধ্যে গণ্য করার যোগ্য। এভাবে তাঁর গবেষণামূলক জ্ঞানগর্ভ ও সাহিত্যিক প্রবন্ধসমূহ ইসলামী গ্রন্থাগারকে পরিপূর্ণ করেছে। তিনি ও তাঁর কোন কোন বন্ধু দেশের জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চায় এবং কোন কোন সময় রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতায়ও অংশ গ্রহণ করেছেন যা দ্বারা এই অভিযোগ দূরীভূত হয়েছে যে, আলিমগণ দেশের সাধারণ জীবন, নতুন আন্দোলন ও নতুন কর্ম তৎপরতা হতে সরে থাকেন । এবং তাদের নতুন প্রবণতাকে বোঝবার, দেশ গঠন ও দেশের উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করবার যোগ্যতা নেই। দারুল মুসান্নিফীন ও তার মাসিক পত্রিকা 'মাআরিফ' (যা অনেক দিন যাবত মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর সম্পাদনায় বের হয়েছে) ইসলামী বিশ্বে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও সম্মান লাভ করেছে।

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্ব ও তাঁর চিন্তাধারা

দ্বিতীয় নেতৃত্ব যার পতাকা মরহুম স্যার সৈয়দ আহমদ[১] খান ধারণ করেছিলেন, যিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার বস্তুবাদী মূলনীতির অনুকরণ, অনুসরণ ও নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এর যাবতীয় দোষ-ত্রুটির সঙ্গে এবং কোন সমালোচনা ও সংশোধন ছাড়া গ্রহণ করবার আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি ইসলাম ও কুরআন পাকের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এভাবে করতেন যা উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পাশ্চাত্য নাগরিকদের অভিরুচি ও মেজাযের

১. তাঁর অবস্থা ও জীবন চরিতের জন্য খাজা আলতাফ হোসেন হালীর হায়াতে জাভিদ গ্রন্থ ও আলীগড় ম্যাগাজিন দেখুন, স্যার সৈয়দ আহমদ।

অনুরূপ হয়। তিনি ঐ সমস্ত গায়বী মৌলিক বিষয়বস্তু ও গোপন তথ্যের অস্বীকার করতেন যা ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও অভিজ্ঞতার আয়ত্তের বহু দূরে ছিল এবং প্রাথমিক দৃষ্টিতে যা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরূপ মনে হয় না।[১]

স্যার সৈয়দ আহমদ খান শেষ মোগল রাজত্বের পতন (যা মুসলমানদের বৃহৎ রাজত্বের অস্পষ্ট ও মলিন চিত্র ছিল) ও ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অকৃতকার্যতাও স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি এই পরাজয়, ভারতীয়দের বিষণ্ণতা ও তাদের এত বড় দলের মুকাবিলায় স্বল্প সংখ্যক বিদেশী লোকের জয়যুক্ত হওয়া পর্যবেক্ষণ করেছেন। মুসলমানদের এ চেষ্টার জন্য যে বৃহৎ মূল্য দিতে হয়েছে তাও দেখেছেন। যে জাতি গতকাল পর্যন্ত এ দেশের শাসক ছিল তাদের অপমান, অধঃপতন, বড় বড় পরিবার ও বংশের দুঃখ-দুর্দশা, ইংরেজদের শানশৌকত মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তাদের শাসন ও যাদুকরী সভ্যতার দৃশ্য দেখেছেন।

এছাড়া চাকুরী, বন্ধুত্ব ও পরিচিতি দ্বারা ইংরেজদের সাথে তাঁর দীর্ঘ সম্বন্ধ ছিল এবং অনেক কাছ থেকে তাদের জীবনের অবস্থা জানার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ইংরেজদের বুদ্ধিমত্তা, কর্মশক্তি ও তাদের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তিনি উন্নত প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী কর্ম ক্ষমতাসম্পন্ন ও সহানুভূতিশীল লোক ছিলেন। তিনি মধ্যম রকমের দীনী শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং দীনের কিতাব ও সুন্নতের ওপর তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল না। তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত দান ও সাহসের সঙ্গে তাকে প্রকাশ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ইংরেজ দ্বারা এভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন, যেভাবে কোন বিজিত প্রভাবান্বিত হয় বিজয়ী দ্বারা অথবা কোন দুর্বল শক্তিশালী দ্বারা।

তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজ সভ্যতা ও তাদের জীবন যাপনের পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্যকে উদ্যম ও শক্তির সঙ্গে তার দিকে আহ্বান করতেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, শাসকগোষ্ঠীর রঙে রঙিন হলে, তাদের মত জীবন যাপন পদ্ধতি গ্রহণ করলে এবং লৌকিকতা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলামেশা করলে ভয়ভীতি, হীনমন্যতা ও গোলামির অনুভূতি দূরীভূত হয়ে যাবে। এর ফলে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হবে। শাসকদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সম্মান ও পদ মর্যাদা বেড়ে

১. সকলের জানা আছে, এই সময়টি সাধারণ বিজ্ঞানের শিশুকাল ছিল এবং ক্রমবিকাশ হচ্ছিল। এখনও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়নি।

যাবে এবং তারা সম্ভ্রমপূর্ণ সমান মর্যাদার জাতির ব্যক্তিবর্গ বলে গণ্য হবে। তাঁর এই ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কোন কোন প্রবন্ধে খুব পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়।

এক স্থানে তিনি লিখেছেন : ভারতের মুসলমানদেরকে পূর্ণভাবে সভ্যতা গ্রহণ করবার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তা হলে যে ঘৃণা ও অবজ্ঞার সঙ্গে সভ্য জাতিসমূহ তাদেরকে দেখে তা লোপ পাবে এবং তারাও জগতে সম্মানিত ও সভ্য বলে গণ্য হবে।[১]

তিনি নিজ পুস্তিকা 'আহকামে তাআমে আহলে কিতাব' (অর্থাৎ কিতাবপ্রাপ্ত ভিন্নধর্মীদের খাদ্য সম্পর্কে নির্দেশাবলী)-এর মধ্যে যা ১৮৬৮ সালের রচনা : খাওয়া, পান করা ও জীবন যাপনের মধ্যে ইংরেজদের পদ্ধতি গ্রহণ করার উৎসাহ দান করে আরবী ভাষায় লিখেছেন (যার অনুবাদ এই) :

সুতরাং হে মুসলমানগণ! তার ওপর তোমরা আমল কর, আত্মঅভিরুচি ও অহংকারের ইচ্ছায় নয়, বরং এই অভিপ্রায় নিয়ে যে, মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হোক! তা হলে যেই অপমান ও অসহায়তায় এদেশের মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে তা হতে তারা মুক্তি পাবে এবং কোন জাতি তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখবে না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের অন্তরের অবস্থা জানেন এবং আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের মন সম্পর্ক ঠিক মীমাংসা দেন।[২]

১৮৬৯ সালের এপ্রিল মাসে স্যার সৈয়দ আহমদ খান লন্ডন ভ্রমণ করেন। সেই সময়ে যারা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করেছেন তিনি তাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত মুসলমান ছিলেন। তখন সুয়েজ খাল খনন করা হচ্ছিল।[৩]

তিনি তাঁর ইঞ্জিনিয়ার ও প্রতিষ্ঠাতার (Ferdinand De Lesseps) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যিনি ঐ জাহাজে ভ্রমণ করেছিলেন।

লন্ডনে স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেয়া হয়েছিল। তিনি সেখানে ১৭ মাস অবস্থান করেন। একজন সম্মানিত অতিথি, পর্যটক ও প্রিয় বন্ধু হিসেবে তাঁকে বিশেষ সম্মান ও যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। তিনি বড় রাজকীয় পার্টিসমূহে, উচ্চ ও সম্মানিত সম্মেলন ও সভাসমূহে অংশ গ্রহণ করেন, যেখানে

---

১. তাহযীবুল আখলাক, স্যার সৈয়দ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত স্যার সৈয়দ, ২য় খণ্ড, ৫০ পৃ.।

৩. ১৭ নভেম্বর ১৮৬৯ সালে তা উন্মুক্ত হয়, নিয়মিতভাবে ঐ তারিখ হতে জাহাজসমূহের আসা-যাওয়া আরম্ভ হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণার্থে সভা করা হয়, ঐ সময় স্যার সৈয়দ আহমদ খান লন্ডনে ছিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতা, শাসকশ্রেণী ও শহরের সম্মানিত লোকদের চরিত্র ও কর্ম পদ্ধতি জাঁকজমকের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁকে সি.এম.আই.-এর সম্মানিত উপাধি ও রাজকীয় ক্রেস্ট দেয়া হলো। রাণী, যুবরাজ ও বড় বড় সভাসদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। তাঁকে সে দেশের বড় বড় ক্লাব ও সংস্থার সম্মানজনক সদস্যপদ প্রদান করা হয়। সোসাইটি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের আড়ম্বরপূর্ণ সভা ও ডিনারে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। সেখানে গত বছরের বিভিন্ন উন্নতি যা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে সাধিত হয়েছিল তার আলোচনা শুনলেন। যা সমাপ্ত হয়েছে বা হচ্ছে তাও পর্যবেক্ষণ করলেন। এ সকল কর্মকাণ্ড ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় একটি আমূল পরিবর্তন এনেছিল এবং দেশের পুনর্গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে যা দেশের সীমানার পরিধি প্রশস্ত করতে ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সফলতার রাস্তা সুগম করে দিয়েছিল।[১]

স্যার সৈয়দ ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডকে ঐ সময় দেখেছিলেন যে সময় ঐ দেশ দু'টি নিজ সভ্যতা ও উন্নতির যৌবনকালে ছিল এবং নতুন জ্ঞান ও নতুন শিল্পগত উন্নতির পথে ছিল। ঐ সময় পাশ্চাত্য জীবনধারা ও সমাজের মধ্যে পতন ও অধঃপতনের চিহ্ন প্রকাশ পায়নি, যা প্রথম মহাযুদ্ধের পর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের সম্মুখে পরিস্কারভাবে ধরা পড়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা তখন পর্যন্ত জীবন ও সৃষ্টির যোগ্যতায় পরিপূর্ণ ছিল। তার বক্ষ গোটা বিশ্ব জয় করতে ও বিশ্ব জগতের সমস্ত জাতিকে নিজের অধীনস্থ করার উদ্যমে উদ্বেলিত ছিল। অতএব, এই উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ দিক তাঁকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবনধারার অন্ধকার ও দুর্বল দিকের দিকে মনোযোগ দেয়া হতে ফিরিয়ে রেখেছিল। চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক অন্ধকার, সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশা, অহংকার ও অহমিকা, ইংরেজদেরকে যেভাবে এক আন্তর্জাতিক অপরাধপ্রবণ জাতিতে পরিণত করেছিল এবং ভারতেও যেভাবে তা প্রকাশ পেয়েছিল এই প্রকৃতি ও এই দিক তাঁর দৃষ্টির অগোচরে ছিল।

তিনি এই সভ্যতা ও জীবনধারা দ্বারা এভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে, তাঁর মন, মগজ, মাংসপেশী, স্নায়ু ও চিন্তার সমস্ত ক্ষমতা তার সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। ১২ অক্টোবর ১৮৭০ সালে এই সভ্যতার প্রতি আসক্ত হয়ে ভারতের মুসলিম সমাজে তার মূল্যবোধ ও মূলনীতিসমূহের ভিত্তির ওপর সংশোধন ও পরিবর্তনের আবেগপূর্ণ আহ্বায়ক ও প্রচারক সেজে নিজ দেশে তিনি ফিরে

---

১. লন্ডনে অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে ও স্যার সৈয়দ-এর কর্মব্যস্ততা জানতে হলে হায়াতে জাভিদ-এর ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ১৩০-১৪৪ পৃ. দেখুন।

আসলেন এবং পূর্ণ আন্তরিকতা, আবেগ ও উদ্যমের সঙ্গে তিনি এই আন্দোলন ও আমন্ত্রণের পতাকা উত্তোলন করলেন। নিজের যাবতীয় যোগ্যতা ও শক্তি এই কাজের জন্য ব্যয় করতে মনস্থ করলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খাঁটি বস্তুবাদী ছিল। তাঁকে জড় পদার্থের শক্তিসমূহ ও জাগতিক ক্ষমতার নিকট নতশির দেখা যেতে লাগল। তিনি নিজের আকীদা অনুযায়ী কুরআন পাকের ব্যাখ্যাও ঐ ভিত্তির ওপর করতে লাগলেন। তিনি তাতে এই সীমা অতিক্রম করেছিলেন যে, আরবী ভাষা ও অভিধানের সর্বস্বীকৃত নীতিগুলো ও ব্যাকরণ পদ্ধতি, ইজমা (যার ওপর দীনের সমস্ত ইমাম একমত হয়েছেন) ও তাওয়াতুর (যা প্রথম সময় হতে ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত)-এর বিপরীত কথা বলতেও তাঁর ভয়ভীতি রইল না। অতএব, তাঁর কুরআন পাকের ব্যাখ্যার কারণে দীনদার ও দীনের জ্ঞানধারী আলিমদের মধ্যে ভয়ানক প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। ড. মুহাম্মদ আল-বাহী তাঁর 'আল-ফিকরুল-ইসলামী আল-হাদীস' গ্রন্থে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের চিন্তাধারার সমালোচনা করতে গিয়ে ঠিকই বলেছেন :

সৈয়দ আহমদ খানের আন্দোলন প্রাকৃতিক জ্ঞান ও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার প্রেম ও ভালবাসার ওপর এভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেভাবে বর্তমান সময়ের কোন কোন চিন্তাবিদ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও কৃতকার্যতা দ্বারা প্রয়োজনের চেয়েও বেশি ভীত। কারণ এর ওপর বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা অবস্থিত। এভাবে প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে এই প্রকার জড়িত হওয়ায় আধ্যাত্মিক ও আদর্শগত মূল্যবোধের মান কমে গেল, অথচ এই মূল্যবোধের ওপর আসমানী দীনগুলোর ভিত্তি ও যার প্রতিনিধিত্ব সবচেয়ে বেশি সুষ্ঠুভাবে ইসলামই করেছে। প্রাকৃতিক জ্ঞানের এই অসাধারণ সম্পর্ক কোন কোন সময় এমন বস্তুর অস্বীকার করা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পর্যবেক্ষণে আসতে পারে না। এই কারণেই সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে নাস্তিক ন্যাচারীদের দলভুক্ত করেছিলেন, যদিও স্যার সৈয়দ বারংবার এ কথা বলেছিলেন যে, তিনি ইসলামের প্রতিরোধ করেছেন তথাপি তার প্রতি অযথা নাস্তিকতার অপবাদ দেয়া হয়েছে।[১]

স্যার সৈয়দ বলতেন : তাঁর চেষ্টা এই যে, বর্তমান সময়ের মুসলমানদের জন্য এমন একটি রাস্তা সৃষ্টি করা যে রাস্তায় চলে তারা ইসলামের ওপর স্থায়ী থেকে এই

১. আল ফিকরুল ইসলামী আল-হাদীস - পৃ. ১৫-১৬।

নতুন জীবনকে গ্রহণ করতে পারে যা সাধারণ বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে প্রকাশ পেয়েছে।[১]

তার সীমাহীন বস্তুবাদী প্রবণতা, মানবীয় জ্ঞানের পবিত্রতার ধারণা ও তার কর্মের সীমা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বিস্তৃতি লাভ, আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও ইচ্ছাকে প্রকৃতির প্রকাশ্যে নীতি ও কারণসমূহের অধীনস্থ বলে মনে করা এবং দুঃসাহসিকভাবে কুরআন পাকের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার কারণে তাঁর চিন্তাজগতে বিশৃঙ্খলা, বিপথগামিতা ও নির্ভীকতার দ্বার খুলে দিয়েছিল। ফলে ভবিষ্যতে মানুষ তা দ্বারা এমন প্রহসনাত্মক সুবিধা গ্রহণ করল যে, দীনের ব্যাখ্যা, কুরআন পাকের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা ছেলে খেলনায় পরিণত হলো।[২]

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বল দিক

স্যার সৈয়দের শিক্ষা ও সংস্কার পরিকল্পনার দু'টি দূর্বল দিক ছিল ফলে তা ইসলামী বিশ্বের জন্য কোন এমন বৈপ্লবিক আহ্বান, ইতিবাচক ও গঠনমূলক পদক্ষেপ প্রমাণিত হলো না যা আকীদা, ঈমান ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির চিন্তা-চেতনা মোতাবেক হয় এবং ইসলামী বিশ্বের ঐ শূন্যতাকে পূর্ণ করতে সক্ষম হয় যা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও প্রাকৃতিক জ্ঞানের উন্নতির দরুন মানুষের মন-মগজে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম দিক এই : তাঁর ঐ শিক্ষা পদ্ধতিকে (যাকে ইউরোপে চূড়ান্ত রূপে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল) ভারতের মুসলিম জীবনধারার অবস্থা ও চাহিদা মোতাবেক করা হয়নি। যা ভারতের মুসলিম সমাজে বাস্তবায়িত হওয়া দরকার ছিল। তিনি তাকে নতুনভাবে গঠন করার ও ইসলামী রূপ দেবার ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করেননি এবং তাকে পাশ্চাত্য সামাজিকতা ও ঐ জড়বাদী মেজায থেকে পরিষ্কার করার দিকে মোটেও দৃষ্টিপাত করেননি যা প্রাচ্যের মুসলিম দেশের কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি ঐ শিক্ষা পদ্ধতিকে পাশ্চাত্য হতে তার সমস্ত পুংখানুপুংখ রূপ ও বৈশিষ্ট্য, তার আত্মা ও মেজায এবং তার পরিবেশ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যেভাবে ছিল সেভাবে আমদানী করেছেন।

---

১. আলউরওতুল উস্কার (সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানীর তত্ত্বাবধানে বের হতো) প্রবন্ধসমূহের মধ্যে যা স্যার সৈয়দ এর প্রতিবাদে লেখা হয়েছে তাতে কতক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে এবং অতিরঞ্জিত হয়েছে যার কারণ সম্ভবত ভাষার জ্ঞান না থাকা এবং স্যার সৈয়দের প্রচুর প্রসিদ্ধি (নদভী)।

২. নমুনাস্বরূপ মৌলভী মুহাম্মদ আলী লাহোরীর তফসীর বয়ানুল কুরআন দেখুন এবং ইংরেজী অনুবাদ কুরআনের টীকা দেখুন।

তিনি কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতির ওপর জোর দেননি বরং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও মেজাযকে গ্রহণ করবার ওপরও ভীষণ জোর দেন। কলেজের অন্যতম নীতি ছিল যে, কলেজে কমপক্ষে একজন প্রিন্সিপাল, দু'জন প্রফেসর ও স্কুলের একজন হেড মাস্টার সব সময় ইউরোপিয়ান হতে হবে এবং কলেজের আর্থিক সঙ্গতির সাথে হয় এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে।[১]

অতএব, বড় বড় শিক্ষকের মধ্যে কম পক্ষে চার-পাঁচজন নিশ্চিতভাবে ইংরেজ হতেন যারা বিভিন্ন বিভাগে প্রশাসন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন, কলেজের নীতি ও ছাত্রদের চরিত্রের ওপর এর গভীর প্রভাব ছিল। ঐ সমস্ত প্রভাবকে ব্যবহার করে তারা দেশীয় রাজনীতিতে বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কলেজের প্রিন্সিপাল মিস্টার বেক প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ ও ভারতের ইসলামী রাজনীতির প্রথম ইংরেজ পথ প্রদর্শক ছিলেন। ঐ নির্দেশনার রাজনৈতিক ফলাফল মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রবণতার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর সাব্যস্ত হয়েছে।[২]

সুতরাং স্যার সৈয়দ আহমদ খানের শিক্ষানীতি পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে পরস্পর দেহ আত্মার মত হয়ে গিয়েছে। এ কারণে তার সম্পর্কে জনগণের মনে অনেক সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। দীনদার লোকদের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির তরঙ্গও উত্থিত হয়েছে। এই আন্দোলনের সাথে সাথে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন ও সম্পর্ক পরিত্যাগের আন্দোলনও আরম্ভ হয়েছিল। ফলে তার পথে অসংখ্য অহেতুক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আলিমগণ যারা ইংরেজী শিক্ষা ও উপকারী জ্ঞান অর্জনের প্রথমে বিরোধী ছিলেন না।[৩]

তারা যখন দেখেন যে, এ আন্দোলন প্রথম হতে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে এবং এতে বহু অপ্রয়োজনীয় ও ভুল উপকরণ সংযোজিত হয়েছে, যথা: এতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রকাশ্য আমন্ত্রণ রয়েছে এবং চরিত্র ও আকীদার ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। ইংরেজ প্রফেসর ও প্রিন্সিপালদের অসীম প্রভাব ও অনুপ্রবেশের কারণে ইসলামী সমাজের বাছাইকৃত প্রতিভাবান যুবকগণ যারা ঐ কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করেছে ইংরেজ জীবন পদ্ধতি এবং সংস্কৃতি ও বৃটিশ রাজনীতি

---

১. হায়াতে জাভিদ, ৮৩ পৃ. (২য় খণ্ড), আঞ্জুমানে তরক্কি-উর্দূ এডিশন।

২. বিস্তারিত জানার জন্য গ্রন্থকারের 'ভারতীয় মুসলমান' দেখুন।

৩. ইংরেজী শিক্ষা করা বৈধ হওয়া সম্পর্কে হযরত শাহ আব্দুল আযীয সাহেবের ফতোয়া দেখুন (ফতোয়া আযিযিয়া)।

দ্বারা প্রভাবান্বিত ও মুগ্ধ হচ্ছে তখন ঐ সকল আলিমগণ তাঁর বিরুদ্ধে পূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে আন্দোলন করলেন। অন্যদিকে এই সমস্ত প্রভাব ও পাশ্চাত্য পরিবেশের কারণে যা কলেজের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এমন একটি ইসলামী বংশধর সৃষ্টি হয় যা নামেমাত্র মুসলমান, কিন্তু বুদ্ধি ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে খাঁটি পাশ্চাত্য ধারার। জীবন পদ্ধতি ও সামাজিকতায় ইংরেজের নীতি ও পদ্ধতির অনুসারী ও সহায়ক ছিল। আকীদায় অনেক সময় দুর্বল ও অস্থিরচিত্ত ছিল।

দ্বিতীয় দুর্বল দিক এই ছিল যে, তার সম্পূর্ণ শক্তি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যকে অর্জন করার ও উচ্চ শিক্ষার প্রতি ছিল। কার্যকর জ্ঞানের দিকে (যা উন্নতির সিঁড়ি ও পাশ্চাত্য জাতিসমূহের উন্নতির ও সফলকাম হওয়ার মূল রহস্য এবং যার বৈপ্লবিক প্রভাব ও ফলাফল তিনি ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে দেখেছিলেন) তিনি মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি দেননি। যদি পাশ্চাত্য হতে গ্রহণ করবার ও এতে পূর্ণতা অর্জন করবার কোন জিনিস থাকে তা ছিল এই জ্ঞান-বিজ্ঞান, বরং তিনি কারিগরি শিক্ষার আন্দোলন ও প্রস্তাবের ভীষণভাবে বিরুদ্ধাচরণ করেন। এই বিষয়ে তিনি শক্ত ও তিক্ত প্রবন্ধও রচনা করেন। এই বিষয়ের শেষ প্রবন্ধ ছিল যা তিনি ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ সালে আলীগড় গেজেট প্রকাশ করেছিলেন যার উদ্দেশ্য (মাওলানা হালীর কথা মত) এই ছিল যে, ভারতে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এমন কারিগরি শিক্ষার অত বেশি প্রয়োজন নেই, বরং সর্বাগ্রে উচ্চ স্তরের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে যা এখনও সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হয়নি।[১]

কারিগরি শিক্ষার বিরুদ্ধে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের উদ্যম, আবেগ ও চেষ্টার বিষয়ে উল্লেখ করে মাওলানা হালী লিখেছেন :

কয়েক বছর হচ্ছে উচ্চ পদস্থ শাসকগণ তাদের বক্তৃতায় কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করতেন। এ দ্বারা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আশংকা ছিল যে, সরকারের উদ্দেশ্য উচ্চ শিক্ষা অথবা সাহিত্য শিক্ষা বন্ধ করে দেয়া, এ কারণেই যখন কোন এরূপ রচনা তাঁর দৃষ্টিগোচর হতো তার বিরুদ্ধে তিনি কিছু না কিছু নিশ্চয়ই লিখতেন। এই ভিত্তির ওপর আলীগড়ের মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স-এর পঞ্চম[২] অধিবেশনে কারিগরি শিক্ষার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এবং ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে খুব দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলেন যা কনফারেন্সের কার্য বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৩]

---

১. হায়াতে জাভিদ, ১০৬ পৃ. (২য় খণ্ড). আঞ্জুমানে তরক্কিয়ে উর্দূ এডিশন।

২. মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স, আলীগড়।

৩. হায়াতে জাভিদ, ১০৬ পৃ. (২য় খণ্ড)।

এর ফলে এ ইসলামী প্রতিষ্ঠান কিতাবী জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রবণতার সঙ্গে অগ্রগামী হলো এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ, অনুসরণের আগ্রহ ও ইংরেজী সাহিত্য পূর্ণতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিভাশালী ও উৎসাহী ছাত্রদের মধ্যে প্রবল হলো। ঐ প্রতিষ্ঠান ইংরেজীর কিছু ভাল বক্তা, লেখক, সরকারী কর্মকর্তা ও পরিচালক সৃষ্টি করেছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে গণিতশাস্ত্রে, পদার্থ বিজ্ঞানে, রসায়ন, কারিগরিবিদ্যা ও শিল্প সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন ও অসাধারণ ব্যক্তি তৈরি করতে পারেনি, অথচ মুসলিম ভারতে তাদের খুব বেশি প্রয়োজন ছিল। এ কারণে এর প্রভাবের সীমা সরকারী চাকুরি ও সাধারণ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

এ আন্দোলনের ফলাফল ও অবদান

এ সমস্ত সমালোচনা ও ব্যাখ্যা সত্ত্বেও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, স্যার সৈয়দ আহমদ খান এমন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী ব্যক্তি ঐ সময়ের নেতাদের মধ্যে আর কাকেও দেখা যায় নি। তিনি এক বড় ও প্রশস্ত ক্ষেত্রে তাঁর আন্দোলন চালিয়েছিলেন। যে আন্দোলনের তিনি নেতৃত্বে দিয়েছেন সে আন্দোলন এমন সফলতা লাভ করছে এবং এই আন্দোলন মুসলমানদের নতুন বংশধরকে এতই প্রভাবিত করেছে যা অন্য কোন আন্দোলন করেনি। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রভাব ভারতের ইসলামী সমাজে খুবই প্রশস্ত হয়। তিনি সাহিত্য, ভাষা, চিন্তার নীতি, বর্ণনা, ব্যাখ্যার পদ্ধতি সব কিছুকে অল্প-বিস্তর প্রভাবান্বিত করেছেন এবং এমন এক সাহিত্য ও বুদ্ধিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেছেন যে প্রতিষ্ঠানে বড় বড় ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

এত বড় শিক্ষা আন্দোলন যার নেতৃত্বে স্যার সৈয়দ খান পূর্ণ অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত আন্তরিকতা ও যোগ্যতার সঙ্গে করেছেন, যাতে কিছু উত্তম ফলাফল এমনও সৃষ্টি হয়েছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই। তা ভারতের ইসলামী সংগঠনে ঐ সমস্ত শিক্ষা ও অর্থনৈতিক শূন্যতাকে বহু পরিমাণে পূর্ণ করেছে যা ইংরেজের ক্ষমতায় আগমন ও রাজত্বের পরিবর্তনের পর হয়েছিল। তা কতক মুসলমানের মন হতে নৈরাশ্য, দুর্বলতা ও অনিষ্টকর মনোভাবকে কমিয়ে দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে এমন যোগ্য যুবক, চিন্তাবিদ, সাংবাদিক, লেখক ও এমন নেতা তৈরি হয়েছে যারা পরে খেলাফত আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পূর্ণোদ্যমে পরিচালনা করেছেন।

পরবর্তীকালে যখন পাকিস্তান আন্দোলন আরম্ভ হলো এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামী পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হলো তখন তার জন্য ঐ শিক্ষাগারের শিক্ষিত ব্যক্তি হতে বহু পরিচালক ও যোগ্য কার্যনির্বাহক পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের নতুন বিপদসংকুল সভ্যতা ও চিন্তার চাহিদাকে পূর্ণ করার জন্য ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন কর্ম করেনি যা তার কাছে আশা করা হয়েছিল। এটা পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও কাজের অভিজ্ঞতা ও সম্পদকে মুসলিম জীবন ধারা ও ইসলামী মিল্লাতের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তার উপযোগী করে গঠন করার বৃহৎ ও জটিল কর্ম ছিল। এটা এমন একটি নতুন ইসলামী বংশধর সৃষ্টি করার কাজ ছিল যারা আকীদা ও রীতিনীতিতে দৃঢ় ও অটল থাকবে এবং ঐ গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবে যা বিশ্ব জগতে সভ্যতার নেতৃত্ব দিতে আবশ্যক। তাদের দৃষ্টি হবে প্রশস্ত, চিন্তা হবে স্থিতিশীল, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও পাশ্চাত্য সভ্যতা হতে তারা এর ভাল দিক ও তার মূল বস্তু গ্রহণ করবে এবং এর দুর্বল ও অপ্রয়োজনীয় অংশ হতে বিরত থাকবে, যার চিন্তা ও অনুসন্ধানের ফলাফল নিজ মস্তিষ্কের ফল হবে। তাদের মধ্যে ইসলামী বুদ্ধিমত্তা ও আত্মবিশ্বাস স্থান পাবে এবং যাদের চিন্তা, কর্মে, কল্পনায় সাহস ও নির্ভীকতা একই সঙ্গে থাকবে।

এটা ঐ নতুন বংশধর ছিল যার জন্য ইসলামী বিশ্ব অস্থির ও আকাঙ্ক্ষার সাথে বহু দিন হতে অপেক্ষা করেছিল এবং যাদের পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল। এই বংশধর (যদি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হতো) ইসলামী বিশ্বকে এই অস্থিরতা ও দুর্ভাবনা হতে মুক্তি দিতে পারত যাতে ইসলামী বিশ্ব বহু দিন পতিত ছিল এবং একে বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্বে ও বর্তমান সভ্যতা পরিচালনায় কেন্দ্রীয় স্থান দিতে পারত।

আকবর ইলাহাবাদী

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অনুকরণশীল বুদ্ধিমত্তা ও প্রবণতার মুকাবিলা করার দায়িত্ব এমন এক সমসাময়িক ব্যক্তির ভাগে পড়েছে যিনি পুরাতন রীতি ও ধারার ওপর শিক্ষাপ্রাপ্ত ও আধুনিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব ছাড়া এর ওপর অস্ত্র চালিয়েছেন। তিনি হলেন "আকবর ইলাহাবাদী"।[১] তিনি নিজের বিশেষ রসিকতা ও কৌতুক পদ্ধতি এবং ভাষাশৈলী ও শক্তিশালী

---

১. আকবর ইলাহাবাদীর কবিতা ও পয়গম জানার জন্য মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবী রচিত আকবারনামা বা আকবর মেরী মেঁ নযর দেখা যেতে পারে।

বাচনভঙ্গিতে নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের সম্পর্কে (যা নিজেদের সন্তান ছিল) সমালোচনার অপ্রিয় কিন্তু দরকারী খড়গ উত্তোলন করেন। তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত একে নিজের কবিতা, আলোচনার বিষয়বস্তু বানিয়েছিলেন।

তিনি স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আন্তরিকতার স্বীকারোক্তির সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক দর্শণ ও শিক্ষায় পাশ্চাত্যের অনুকরণের আবেগপূর্ণ আমন্ত্রণ এবং কলেজের পাশ্চাত্য জীবন ও পরিবেশের ওপর বিনা ভয়ভীতিতে কিন্তু সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে সমালোচনা করেছেন যাতে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ, আকীদার দুর্বলতা, দীনের মধ্যে শিথিলতা, যুবকদের বিলাসিতা, তাদের জীবনের উচ্চ মান ও ফ্যাশন উপাসক হওয়া, দীনদার লোক হতে আতংকগ্রস্ত হওয়া, চাকুরীর ওপর নির্ভরশীলতা, পুরাতন প্রাচ্য সভ্যতা, তার ঐতিহ্য ও এর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিদ্রোহ, পাশ্চাত্য জীবনধারায় বিলীন হওয়া ও খাঁটি জড়বাদী চিন্তাধারাকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি নিজের যাদুকরী কবিত্ব, শিল্প, কৌশলী লেখনি দ্বারা নতুন বংশধরের স্বভাব চিত্রাংকন করেছিলেন যাতে তার আকৃতি ও নকশা পুংখানু-পুংখরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বাণী ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন চিন্তাধারার লোকের মধ্যে সমাদৃত হয়েছিল। সুধী সমাজ ও যুবকরা একে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে এবং তা কতবার শ্রুত হয়েছে ও পড়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন।

কিন্তু এত প্রভাবশালী ও সমাদৃত হওয়া সত্ত্বেও ঐ অনুকরণ ও অনুসরণের তীব্র স্রোতকে বাধা দিতে পারেনি এবং নতুন বর্ধিষ্ণু জীবনধারার জন্য কোন একটি শক্ত নেতিবাচক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এর কারণ এই যে, যে সাহিত্য ও সংশোধনের ভিত্তি কৌতুক ও বিদ্রূপাত্মক প্রতিবাদস্বরূপ হয় তার জীবনকাল ও প্রভাব সীমাবদ্ধ হয় এবং তা কোন গঠনমূলক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে না। তবুও যে প্রকারেই হোক, তা উপকারিতা হতে খালি ছিল না এবং ভারতের নতুন সমাজ ব্যবস্থা, সাহিত্য পরিকল্পনা ও প্রবণতার আকৃতি দানে তারও অবদান রয়েছে।

স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী আসবাবপত্র বর্জন

এই অনুকরণপ্রিয়তা (যার নেতৃত্বে মুসলমানদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান করেছিলেন এবং ইংরেজ রাজত্ব ও শিক্ষা পদ্ধতি যার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল) শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে প্রতিপালিত ও অগ্রসর হতে থাকে। সে রাস্তায় কোন বস্তু বাধা সৃষ্টি করতে পারল না। অবশ্য ভারতীয় মেজাযের

রক্ষণশীলতা নতুন পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে সংযত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে তাদের পুরাতনের প্রতি আগ্রহ এবং জীবন যাপনেও, সামাজিক সরলতা ও অনাড়ম্বরের কারণে এতে ঐ তীব্রতা আসতে পারেনি যা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য ইসলামী ও প্রাচ্য দেশসমূহে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে তা দেশের সম্পূর্ণ গ্রাসকারী ও সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী প্রবণতা হওয়া উচিত ছিল এবং তার প্রভাবে ভারতীয় সামাজিকতা, চিন্তাধারা, জীবন যাপনের রীতিনীতি, সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থায় খাঁটি পাশ্চাত্য প্রভাব জোরদার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হলো যা এই স্বাভাবিক কার্যের মধ্যে বাধা হয়ে পড়ল এবং যা ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিল।

এই ঘটনা ইংরেজ শাসনের প্রভাব ও ক্ষমতাকে (যা ভারতে নতুন সভ্যতার পতাকাবাহক ছিল) মানুষের মন থেকে হ্রাস করে দিয়েছিল এবং এই সভ্যতার বিশ্ব নেতৃত্বের যোগ্যতা, সুবিচার ও অপক্ষপাত ইনসাফের যোগ্যতা ও উৎকর্ষ (Merit) সম্পর্কে সবিশেষ সন্দেহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এই সভ্যতার নেতাদের ও পরিচালকদের প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তি এসেছিল এবং এই শাসক ও শাসনের সাথে সম্পর্ক রাখা প্রতিটি জিনিসকে বর্জন করার আন্দোলন সৃষ্টি হলো। এ সভ্যতা ও জীবন যাপনের উপকরণ অথবা তার তৈরী জিনিস ও আমদানীকৃত মাল সর্বত্রই বর্জন করার আন্দোলন চলল। এটা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল (১৯১৪-১৯১৮ খ্রী.)। এ যুদ্ধে বৃটিশ তার মিত্রদের সাথে 'উসমানী রাজত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো, যা মুসলমানদের কাছে ইসলামী মর্যাদার শেষ চিহ্ন ও খেলাফতের রক্ষক, ইসলামের পৃষ্ঠপোষকের মর্যাদায় আসীন ছিল।

১৯১৮ সালে যখন তুরস্কের পরাজয় হলো, ইংরেজগণ কনস্টান্টিনোপল দখল করে নিল এবং উসমানী রাষ্ট্রের অধিকৃত দেশকে তাদের মধ্যে বণ্টন করে নিল তখন ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। হিন্দু-মুসলিম– দুই জাতি একত্র হয়ে খেলাফত আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ গ্রহণ করল। এই আন্দোলনে মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে গান্ধীজীকেও দেখা গিয়েছিল। ১৯২০ সালে তারা বৃটিশ রাষ্ট্রের সঙ্গে অসহযোগিতা, আইন অমান্য ও জীবনের প্রতিটি স্তরে ইংরেজদের সাথে অসহযোগ ও বিদেশী আসবাবপত্র বর্জনের আমন্ত্রণ জানাল। এটা স্বদেশী আন্দোলনের সবচেয়ে বেশি প্রভাবকারী ও শান্তিপূর্ণ অস্ত্র ছিল। এর ফল এই হলো যে, দেশে অসন্তোষ ও ঘৃণা সৃষ্টি হলো। এ আন্দোলনের স্লোগান ছিল : বিদেশী মালামাল বর্জন কর। তারা জাতীয় ও সাধারণ জীবনধারার অনাড়ম্বর ও ব্যয়

সংকোচনের অভ্যাসের দিকে আগ্রহান্বিত হয়ে দেশী তৈরী জিনিসের ওপর সন্তুষ্ট থাকতে আহ্বান জানাল।

দেখতে দেখতে দেশব্যাপী এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চল পর্যন্ত আগুন লেগে গেল। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় লোকের মনে পাশ্চাত্য সভ্যতার যাদু অকেজো ও বিনষ্ট হয়ে গেল। জনগণ বড় বড় সভায় সমাবেশে ইংরেজী পোশাক ও বিদেশী কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিত এবং বড় বড় ধনবান, শিক্ষিত লোক ও বিলাসী পরিবার অমিতব্যয়িতা ও পাশ্চাত্য জীবনের রীতিনীতি ছেড়ে দিয়ে সরল ও ব্যয় সংকোচনের অভ্যাস গ্রহণ করল। হাজার হাজার মানুষের জীবনে, যাদের মধ্যে বহু উকীল, ধনী ও সওদাগর ছিলেন, পরিবর্তন আসল। তাদের দ্বারা ইংরেজ কারাগার ভরে গেল এবং তারা বিভিন্ন রকমের দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভোগ ও বিপদ সহ্য করলেন। তারা এমন ত্যাগ, ধৈর্য, দীনের আবেগ, দেশপ্রেম, সাধারণ সহানুভূতি এবং দীনের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ দিয়েছেন, যা এই আন্দোলনের পূর্বে কোন আশাই করা যায়নি।

এই আন্দোলনের সংগে (যা ধর্মীয় রূপ নিয়েছিল) ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হলো যার উদ্দেশ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদের মুকাবিলা ও স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করা। প্রাচ্যের বহু রাজনৈতিক আন্দোলনের বিপরীত এটা আধা রাজনৈতিক, আধা সামাজিক আন্দোলন ছিল যা এক বিশেষ চিন্তাধারা ও অর্থনৈতিক দর্শন রাখত। এটা নতুন সভ্যতার বন্ধন ও শক্তি শিথিল করা এবং জাতীয়, দেশীয় ও ধর্মীয় অনুভূতি শক্ত করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই উভয় ধরনের গণআন্দোলন দেশ হতে হীনতার অনুভূতি শেষ করে আত্মসম্মান, আত্মরক্ষার অনুভূতি জাগ্রত করতে এবং চিন্তা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী (বিদেশী) রাজত্ব হতে মুক্তি অর্জন করার অভিলাষ সৃষ্টি করতে এমন অবদান রেখেছে যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড় বড় দর্শনও করতে পারেনি এবং এটাই সকল গণআন্দোলন ও বাস্তবধর্মী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য যা প্রতিটি দেশের সমাজে প্রবেশ করে নিজের কাজ সম্পাদন করে এবং তা মন ও মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিতে সক্ষম হয়।

ড. ইকবাল ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের মুসলিম যুবকগণ পাশ্চাত্য বিষয় অধ্যয়ন ও গবেষণা আরম্ভ করেছিল। তারা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাশ্চাত্য

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছিল। বিজয়ী সভ্যতা ও তার পতাকাধারী হতে ভয়-ভীতি তখন দিন দিন কমে যাচ্ছিল। ভারতীয় মুসলমানগণ উচ্চ শিক্ষার জন্য তখন ইউরোপে আসা-যাওয়া করছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইউরোপের বড় বড় শিক্ষা কেন্দ্রে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করে তথাকার জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করতে লাগল এবং নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ ও মুক্ত চিন্তাবিদ শিক্ষকদের পরিচালনায় অর্জন করতে লাগল।

তারা পাশ্চাত্য সভ্যতা হতে কেবল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নয়, বরং অধিকতর ভাল প্রতিনিধি ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরিচয় অর্জন করতে লাগল এবং তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার শেষ সীমায় পৌছে তা সম্পর্কে এভাবে জ্ঞাত হতে চেষ্টা করতে লাগল, যেভাবে কোন শিক্ষিত ইউরোপীয় করতে পারে। সেখানের দর্শন-রীতিনীতি ও বিভিন্ন চিন্তাধারা বিচার-বিবেচনা করতে লাগল এবং গোপন রহস্য ও মূল তত্ত্ব পর্যন্ত পৌছতে চেষ্টা করল। তাদের পাশ্চাত্য মনোভাব, স্বভাব, জাতীয় অহংকারবোধ ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি ইউরোপীয় জনসাধারণের আত্মঅহমিকা ও আমিত্ববোধ কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। ফলে সমাজে নিম্নগামিতা, পতন ও বুদ্ধিমত্তার অভাবের প্রাথমিক চিহ্ন ও পরিচয় তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ঐ সমস্ত ভাল ও গঠনমূলক অংশ তাদের সম্মুখে এলো যা মানবতার জন্য কল্যাণকর হতে পারে। এভাবে ঐ সমস্ত ক্ষতিকর ও মানবতার অকল্যাণকর অংশসমূহ (যা ঐ সভ্যতার ভিত্তিমূলে প্রথম হতে অবস্থিত ছিল) তাদের দৃষ্টি হতে গোপন থাকতে পারল না। এ সমস্ত পর্যবেক্ষণ তাদের মন ও মস্তিষ্কে এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুভূতি সৃষ্টি করল যে, যার অর্জন এক দীর্ঘ সময় অবস্থান ছাড়া সম্ভব ছিল না।

ইউরোপীয় মতবাদ ও চিন্তাধারার তুলনামূলক অধ্যয়ন সাহসিকতার সঙ্গে তারা সম্পন্ন করেন যা গভীর দৃষ্টি ছাড়া সম্ভব ছিল না। ফলে তার অনুসরণ ও অনুকরণের (পাশ্চাত্য) বন্ধন হতে নিষ্কৃতির জন্য তারা চেষ্টা করেছিল; তবে এই কাজ সম্ভব নয় ঈমানের স্ফুলিঙ্গ ছাড়া, মুমিন সমাজ থেকে যা তখনও নিভে যায় নি, বরং ছাইয়ের স্তূপের মধ্যে লুকায়িত ছিল এবং যে কোন সময় প্রচণ্ড শক্তিতে জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় ছিল। এই সমস্ত জিনিস স্বচক্ষে দেখার পর তাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি পাশ্চাত্য সভ্যতা হতে নিরাশ হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে বড় সাহসিকতার সাথে এর সমালোচনার ইচ্ছা নিয়ে দেশে ফিরে আসল। তাদের চিন্তা ও সমালোচনার মধ্যে সীমালঙ্ঘনের অথবা অতিশয়োক্তির ক্রটিও ছিল না, ঘটনার

অস্বীকৃতিও ছিল না এবং প্রকৃত অবস্থাকে ভেঙে-চুরে পেশ করবার আগ্রহও তেমন ছিল না।

এই বিপ্লবী সমালোচনার মধ্যে সবচেয়ে অধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ ইকবাল, যাঁর সম্পর্কে বলা যেতে পারে এই শতাব্দীতে তাঁর চেয়ে উত্তম আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিরল। তাঁকে নতুন প্রাচ্যের সবচেয়ে অধিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাবিদ বলা যেতে পারে। প্রাচ্যের গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে (তা সত্ত্বেও যে তাদের অনেকেই পাশ্চাত্য ভ্রমণ ও অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেছিল) এমন কেউ ছিলেন না, যিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারা তার চেয়ে গভীরতর দৃষ্টির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এত সাহসের সাথে তার সমালোচনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইকবাল এই সভ্যতা গঠনের মৌলিক উপকরণ ও এর দুর্বল দিকসমূহ ভালমত পাঠ করেছেন এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলোর শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন যা জড়বাদী প্রবণতাসহ ধর্মীয়, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সাথে পাশ্চাত্য নাগরিকদের বিদ্রোহের কারণে এর ভিত্তিমূলে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তিনি মন ও অন্তর্দৃষ্টির এই ক্ষতিকে যা এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, সভ্যতার প্রাণের অপবিত্রতা ও মলিনতা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

فساد قلب ونظر هے فرنگ کی تهذیب

که روح اس مدنیت کی ره سکی نه عفیف

অর্থাৎ ইউরোপের সভ্যতা মন ও অন্তর্দৃষ্টির বিনাশের মুল, ফলে এই সমাজের প্রাণ পবিত্র রাখতে পারেনি।

رهے روح میں پاکیز گی تو هے ناپید

ضمیر پاك وخیال بلند و ذوق لطیف

অর্থাৎ আত্মার পবিত্রতা না থাকলে পবিত্র মন, উচ্চ চিন্তাধারা ও সূক্ষ্ম অনুভূতিও বিদ্যমান থাকে না।[১]

এর ফলে মন আলোকবিহীন ও জীবন আনন্দবিহীন হয়ে পড়ে যা এই সভ্যতার ওপর সাংঘাতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাকে এক যান্ত্রিক ও কারিগরি রং দিয়ে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হতে এর সংযোগ ছিন্ন করে দিয়েছে এবং আল্লাহর রহমত হতে একে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

---

১. জরবে কলীম, পৃ. ৬৫।

তিনি বলছেন :

یہ عیش فر اواں یہ حکومت یہ تجارت
دل سینہ بے نور میں محروم تسلی
تاریك هے افرنگ مشینوں کے دھویں سے
یہ وادئ ایمن نہیں شایان تجلی

অর্থাৎ এই বিলাসবহুল জীবন, এই রাজত্ব, এই ব্যবসা, আলোবিহীন বক্ষে শান্তি হতে বঞ্চিত। ফিরিঙ্গীরা মেশিনের ধোঁয়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। (তূর পাহাড়ের) উপত্যকা (যেখানে মূসা আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ তা'আলার নূর উদ্ভাসিত হয়েছিল) অন্ধকার হয়ে গিয়েছে তা এখন আর তাজাল্লীর যোগ্য নেই।[১]

তিনি এই সভ্যতার দীনবর্জিত ভিত্তি ও দীনবিহীন উপকরণের কথা বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন যা ধর্ম ও নৈতিকতার সঙ্গে বৈরিতা রয়েছে এবং যা ইবরাহীম খলিলুল্লাহর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে জড় পদার্থের মিথ্যা উপাস্যদের উপাসক ও পূজারী বনে গেছে এবং এক নতুন শিবালয়ের রচয়িতা হয়েছে। তিনি "پس چہ بایدکرد" কাব্য গ্রন্থে বলেছেন :

لیکن ازتهذیب لادینی گریز!
زاں که اوبا اهل حق دار دستیز ۔

সাবধান! এই ধর্মহীন সভ্যতা হতে বাঁচতে হবে। কারণ ন্যায়-নীতির অনুসারীদের সাথে এর রয়েছে বৈরিতা।

فتنه ها ایں فتنه پر واز آورد
لات وعزی درحرم باز آورد

এ সকল ফিতনা-ফাসাদ আরো ফিতনা-ফাসাদের জন্ম দিচ্ছে, যেই লাত ও উযযাকে কা'বা শরীফ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, সেগুলোকে আবার সেখানে আনা হচ্ছে।

از فسو نش دیده دل نابصیر
روح از بے آبئ او تشنه میر

১. জরবে কলীম, পৃ.১৪১।

এর জাদু দ্বারা আত্মার চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রাণ পানির অভাবে পিপাসায় মৃত্যুবরণ করছে।

لذت بے تابی ازدل می برد!
بلکه دل زیں پیکر گل می برد!

শান্তির স্বাদ আত্মা হতে পালিয়ে যায়, বরং আত্মা এই মাটির মূর্তি হতে আলাদা হতে চায়।[১]

کهنه دزدے غارت اوبر ملاست
لاله می نالدکه داغ من کجاست !

এ এক পুরাতন চোর, প্রকাশ্যে লুণ্ঠন করে, লাল ফুল কাঁদছে হায়! আমার ব্যথিত মালী কোথায়?[২]

এই সভ্যতার রীতিনীতি হলো লুণ্ঠন করা ও মানুষ হত্যা করা এবং এর কাজ ও উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা ও সওদাগরী। জগতের নিরাপত্তা, শান্তি, নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও অকপট নিষ্ঠা তখনই ভাগ্যে জুটতে পারে, যখন এই নতুন সভ্যতার রীতিনীতি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।

তিনি আরো বলেছেন :

شیوه تهذیب نو آدم دری است
پرده آدم دری سود ا گری است

অর্থাৎ নতুন সভ্যতার রীতিনীতি হলো মানুষ হত্যা করা, সভ্যতা নয়, এটা ব্যবসা, উদ্দেশ্য– রক্ত শোষণ।

ایں بنوك ایں فکر چالاك یهود
نور حق ازسینه آدم ربود!

এই ব্যবসা তথা ব্যাংকগুলো ধূর্ত ইয়াহুদীর চালাকি যা মানব বক্ষের সত্যের আলো নির্বাপিত করে।

تا ته وبالانه گردد ایں نظام
دانش وتهذیب ودیں سودائے خام

---

১. যরবে কালীম, ১৪১ পৃ.।
২. ঐ, পৃ. ৪১।

যতদিন এই আধুনিক রীতিনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত না হবে। দীন, সৎ বুদ্ধি ও সঠিক সভ্যতার অবক্ষয় হতেই থাকবে।

এই সভ্যতা যদিও অতি আধুনিক, মাত্র সেই দিনের কিন্তু এর ভিত্তি মূল অতি দুর্বল এবং পদে পদে ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার। ফলে এর পতন আসন্ন। এই সভ্যতায় ইয়াহুদী ধূর্তরা যে ক্ষমতা অর্জন করেছে তার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, অনতিবিলম্বে ইয়াহুদীরাই এর মালিক হয়ে যাবে।

তিনি বলেছেন :

ھے نزع کی حالت میں یہ تھذیب جواں مرگ
شاید ھوں کلیسا کے یھودی متولي

অর্থাৎ এই আধুনিক সভ্যতা মৃত্যু যন্ত্রণায় উপনীত হয়েছে, সম্ভবত গির্জার রক্ষক হবে এই ইয়াহুদীরা।[১]

কিন্তু নিদর্শন দেখে মনে হচ্ছে মৃত্যুশয্যায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করার পরিবর্তে এই সভ্যতা আত্মহত্যা করবে এবং নিজের খঞ্জর দ্বারা নিজের গলা কেটে নিজেকে শেষ করবে। তিনি বলেছেন :

تمھاری تھذیب اپنے خنجر سے اپ ھی خود کشی کریگی
جو شاخ نازك پہ اشیانہ بنے گا ناپائدار ھوگا

অর্থাৎ তোমাদের সভ্যতা নিজের ছোরা দ্বারা নিজেই আত্মহত্যা করবে (যেমন) কোন নরম শাখার ওপর যদি বাসা বানানো হয় তবে তা অস্থায়ী হয়।[২]

এই সভ্যতা দীন ও নৈতিকতার কঠিন নেগরাণী এবং আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতির সহায়তা ছাড়াই প্রকৃতিকে জয় করার দুর্গম পথ অবলম্বন করেছে। ফলে এর কৃতকার্যতাই এর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। ভয় হচ্ছে যে, এটা নিজেই অচিরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেছেন :

وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیا ھے فطرت کی طاقتونکو
اسی کی بے تاب بجلیوں سے خطر میں ھے اس کا اشیانہ

অর্থাৎ সেই নির্লজ্জ চিন্তাবিদ যে প্রকৃতির শক্তিগুলোকে প্রকাশ করেছে তাদেরই তড়িতাঘাতে তার বাসস্থান বিপদগ্রস্ত।[৩]

---

১. বালে জিবরীল, ১৭৬ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, ১৭৬ পৃ.।

৩. প্রাগুক্ত, ১৭৬ পৃ.।

'সুদ ও লাভ এবং প্রতারণা ও কৌশল'-এর এই জগত যার রচয়িতা হলো ফিরিঙ্গীরা। এখন তা মৃত্যুমুখে পতিত এবং আর একটি নতুন জগত জন্মগ্রহণ করছে। তিনি বলেছেন :

جہان نو ہورہا ہے پیدا وہ عالم پیر مررہاہے
جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ

অর্থাৎ নতুন জগত সৃষ্টি হচ্ছে আর ঐ বৃদ্ধ জগত মরে যাচ্ছে, কারণ ফিরিঙ্গী জুয়াড়ীরা যাকে বানিয়েছে জুয়ার আড্ডাখানা।[১]

তিনি বলেন, এই সভ্যতা জ্ঞানের আলো দ্বারা আলোকিত এবং জীবনের উত্তাপে দীপ্ত বটে, তা বিজ্ঞান ও শিল্পের মাঝে প্রতিভা ও দক্ষতা প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বিপ্লবী আবিষ্কার ও নতুন ভাব প্রকাশ করার শক্তি হারিয়েছে। সেখানে বুদ্ধির উন্নতি আর আত্মার ক্ষতি। এর পরিচালক নিজেই অনুসরণ ও অনুকরণের গোলাম ও ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। এর কেন্দ্র এখন প্রেমিকের চিৎকার, সাধকের কর্ম, পয়গম্বরী সাহসিকতা হতে বঞ্চিত। তিনি বলছেন :

یاد ایام کہ بودم در خمستان فرنگ
جام او روشن تر از ائینہ اسکندر است

অর্থাৎ আমি সে কালের স্মরণ করি যে কালে আমি ছিলাম ফিরিঙ্গীদের শুঁড়ীখানায়। তাদের মদের পেয়ালা (বাদশা) সিকান্দারের আয়না হতে বেশি উজ্জ্বল ছিল।

وچشم مست مے فرو شش بادہ را پروردگار
بادہ خواراں رانگاہ ساقی اش پیغمبر است

মদ্য বিক্রেতার উন্মত্ত চক্ষু মদ্যের রক্ষক, মদ্য পানকারীদের জন্য পানপাত্র পরিবেশনকারীই পয়গাম্বর।

جلوۃ اوبے کلیم وشعلہ او بے خلیل
عقل ناپروا متاع عشق راغارت گراست

এর দীপ্তি কালীমবিহীন (অর্থাৎ মূসা কালীমুল্লাহ ছাড়া যার ওপর তূর পাহাড়ে দীপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল) এবং এর অগ্নির শিখা খলীলবিহীন (অর্থাৎ ইবরাহীম

১. বালে জিবরীল, ১৭৬ পৃ.।

খলীলের ওপর অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়েছিল) এখন অগ্নিশিখা থাকলেও খলীল নেই। ভয়হীন বুদ্ধি প্রেমসামগ্রীর লুণ্ঠনকারী।

در هوی ایش گریۂ یك اه بےتابانه نیست
رندایں میخانه رایك لغزش مستانه نیست

অর্থাৎ তার ভালবাসায় অশান্ত হৃদয়ের অস্থিরতা নেই, এই মদ্যগৃহের মদ্যপায়ীর নেই প্রেমাসক্তের পদচারণা।[১]

তিনি এই সভ্যতার আলোকিত চেহারা ও তৎসহ অন্ধকার অন্তরের ছবি এভাবে অঙ্কিত করেছেন :

یورپ میں بهت روشنی علم وهنر هے
حق یه هے که بے چشمه حیواں هے یه ظلمات

অর্থাৎ ইউরোপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলো আছে যথেষ্ট কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে নেই অমৃত ঝর্ণা, আছে শুধু গাঢ় অন্ধকার।

رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں
گر جوں سے کهیں بڑه کے هیں بنکوں کی عمارات

"গঠনের সৌন্দর্যে জাঁকজমক ও পরিচ্ছন্নতায় ব্যাংকসমূহের দালানগুলো গির্জা অপেক্ষা বহু উচ্চ।"

ظاهر میں تجارت هے حقیقت میں جوا هے
سودا ایك کا لاکهوں کے لئے مرگ مفاجات

"তা প্রকাশ্যে ব্যবসা, প্রকৃতপক্ষে ওটা জুয়া, একজনের লাভ কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের আকস্মিক মৃত্যু।"

یه علم یه حکمت یه تدبریه حکومت
پیتے هیں لهو دیتے هیں تعلیم مساوات

এই বিজ্ঞান, এই প্রজ্ঞা, এই চিন্তা ও এই শাসন রক্ত চুষে খায় (কিন্তু) সাম্যের কথা মুখে বলে।

بیکاری وعریانی ومے خواری وافلاس
کیا کم هیں فرنگی مدنیت کے فتوحات

১. পয়গাম মশরিক, ২৪৮ পৃ.।

বেকারত্ব, উলঙ্গপনা, মদ্য পান, দারিদ্র- এগুলোই হলো ফিরিঙ্গী শাসন ও সভ্যতার অসংখ্য কীর্তি।

وہ قوم کہ فیضان سماوی سے ہو محروم
حد اس کے کمالات کی ہے برق وبخارات

যে জাতি আসমানী ওহি হতে বঞ্চিত ঐ জাতির উন্নতির শেষ সীমা হলো বিদ্যুৎ ও বাষ্প।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভিত্তিসমূহের চিন্তা, গবেষণার পদ্ধতির ওপর এই ধরনের সমালোচনা ও পর্যালোচনা রয়েছে তাঁর মাদ্রাজে প্রদত্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে যা Reconstruction of Religious Thought in Islam নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভাবনা আরও গভীর ও বিস্তারিত। কারণ জ্ঞান ও দর্শনের ভাষা কবিতা ও সাহিত্যের ভাষার মোকাবিলায় জ্ঞানের কথা গভীরভাবে প্রকাশের অধিক শক্তি রাখে। তিনি পাশ্চাত্যের জড় সভ্যতার গঠন, স্বভাব ও বর্তমান মানুষ জাতির (যারা এর প্রতিনিধি ও পতাকাবাহক) ওপর এর কুপ্রভাবের বিশদ বর্ণনা দিয়ে বলেছেন :

বর্তমান যুগের সমালোচনামূলক দর্শন ও পদার্থ বিজ্ঞানের পারদর্শিতা মানুষের যে অবস্থা করেছে তা বড়ই জঘন্য ব্যাপার। এর প্রাকৃতিক দর্শন নিশ্চিতভাবে একে এই যোগ্যতা দিয়েছে যে, প্রকৃতির শক্তিসমূহকে কাজে লাগাতে পারে, কিন্তু তা করেছে তার ঈমান ও বিশ্বাসের ধনকে কেড়ে নিয়ে।[১]

বর্তমান সময়ে বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষ দ্বারা মানুষের আত্মা মৃত্যুবরণ করেছে অর্থাৎ মানুষ নিজের বিবেক ও অন্তর হতে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, তার অস্তিত্ব তার সত্তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। তার এমন ক্ষমতাও নেই যে, সে নিজের নির্দয় আত্মম্ভরিতা ও ধন-দৌলতের সীমাহীন ক্ষুধার ওপর জয়ী হতে পারে। এ সমস্ত কারণেই এই সভ্যতার প্রভাবাধীন জীবনের উচ্চ স্তরের জন্য চেষ্টা ও আগ্রহ ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে, বরং এই কথা বলা সঙ্গত, তারা প্রকৃতপক্ষে জীবন হতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের দৃষ্টি বাস্তব পদার্থের ওপর যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা চক্ষুর সম্মুখে। এ কারণে তাদের সম্বন্ধ অস্তিত্বের গভীরতা হতে কর্তিত হয়ে গিয়েছে। হাক্সলের (Huxley) এই সন্দেহ ছিল যা তিনি দুঃখের সঙ্গে

১. দ্র. তাশকীল জাদীদ ইলাহিয়াত ইসলামিয়া, ২৮৭ পৃ.।

প্রকাশও করেছিলেন। বস্তুবাদী মনোভাবের ক্রমোন্নতি তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে অবশ করে দিয়েছে।[১]

বর্তমান সময়ের ধর্মহীন সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই তুলনামূলকভাবে বেশি প্রশস্ত এবং তার আবেগ ও উদ্যমের অবস্থাও কোন নতুন ধর্মেরই অনুরূপ। কিন্তু তার ভিত্তি হেগেল (Hegel)-এর বিরোধী মতবাদ অনুসরণকারীদের ওপর স্থাপিত, তাই তিনি এর বিরুদ্ধাচরণ করেন যা এর জন্য জীবন ও শক্তির ঝর্ণা হতে পারে।[২]

আল্লামা ইকবাল পাশ্চাত্য সমাজকে এমন এক সংগঠন বলে গণ্য করেন যার পেছনে কেবল পশুসুলভ দড়ি টানাটানি কার্যকর রয়েছে। তিনি এটাকে এমন এক সভ্যতা বলেন যা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে নিজের আধ্যাত্মিক ঐক্য হারিয়ে ফেলেছে।

তিনি একজন অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র উভয়কে বস্তুবাদী বৃক্ষের দু'টি শাখা এবং এক বংশের দু'টি পরিবার বলে আখ্যায়িত করেন যার একটি প্রাচ্যের আর একটি পাশ্চাত্যের। কিন্তু বস্তুবাদী চিন্তা জীবনধারা ও মানুষ সম্পর্কে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে উভয়ে যেন এক প্রাণ দুই দেহ। কল্পনার রাজ্যে বিচরণকালে সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর ভাষায় তিনি এর বিশদ বর্ণনা দিচ্ছেন :

هر دو را جاں نا صبورونا شکیب
هردو یزداں نا شناس آدم فریب

অর্থাৎ দুই দলই অশান্ত, দুই দলই আল্লাহ্‌র পরিচয় রাখে না এবং মানুষকে প্রতারণাকারী।

زندگی ایں راخروج اں را خراج
درمیان ایں دو سنگ آدم زجاج

এক দলের জন্য জীবন স্বেচ্ছায় নির্গমন আর একদলের জন্য বাধ্যতামুলক, এই দুই প্রস্তর খণ্ডের মাঝে মানুষ কাচসম।

---

১. ইসলামী ইলাহিয়াতের নতুন আকার, ২৮৯-২৯০ পৃ.।

২. ঐ, ২৯১-২৯২ পৃ. দেখুন।

این به علم ودین وفن آرد شکست
اں بردجاں رازتن ناں رازدست

একদল জ্ঞান, ধর্ম ও প্রযুক্তিতে ভঙ্গুরতা নিয়ে আসে। আর অন্য দল শরীর হতে প্রাণ ও হাত হতে খাদ্য ছিনিয়ে নেয়।

غرق دیدم هر دو رادر اب وگل
هر دو را تن روشن وتاريك دل

দু' দলকে দেখলাম পানি ও কাদার মধ্যে ডুবে গেছে। দু' দলের শরীর আলোকিত, অন্তর অন্ধকার।

زندگانی سوختن باسا ختن
درگل تخم دلے اند اختن

জীবন (হয়) দগ্ধ হওয়া অথবা গঠন করা, কাদার মধ্যে আত্মার বীজ ঢেলে দেয়া।[১]

غریباں گم کرده اند افلاك را
درشکم جو بیندجان پاك را

দরিদ্ররা আকাশকে হারিয়ে ফেলেছে তারা পেটের মধ্যেই পবিত্র প্রাণের সন্ধান করে।

رنگ وبوازتن نگیرد جان پاك
جزبه تن کارهے ندارد اشتراك

পবিত্র প্রাণ শরীর হতে রঙ ও গন্ধ গ্রহণ করে না, সমাজতন্ত্র শরীর ছাড়া অন্য কিছুর ধার ধারে না।

دین آں پیغمبر حق ناشناس
بر مساوات شکم وارد اساس

যার ধর্ম নবীর পরিচয়বিহীন তার দীন পেটের সাম্যের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যমান।

تااخوت رامقام اندر دل است
بیخ اودردل نه در آب وگل است

ভ্রাতৃত্বের স্থান অন্তরে, এর বীজ অন্তরেই থাকতে হবে। পানি ও কাদায় নয়।[২]

১. জাভিদনামা, ৭০ পৃ.।
২. ঐ, ৬৯ পৃ.।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী দেশসমূহ

ইকবালের ধারণা ছিল যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজেই মরণাপন্ন অবস্থায় আছে, তা ইসলামী দেশসমূহের কোন উপকার করতে সক্ষম নয় এবং পুনরায় জীবন দানের ক্ষমতাও তার নেই। এই বিষয়ে তিনি বলেন :

نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو
آنکہ جن کی ہوئی محکومی وتقلید سے کور

অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকের স্পষ্টভাবে সত্য দৃষ্টিগোচর হয় না যাদের চক্ষু পরানুগত্য ও অনুসরণের দরুন অন্ধ হয়ে গেছে।

زندہ کر سکتی ہے ایران وعرب کو کیونکر
یہ فرنگی مدنیت کہ جوھے خودلب گور

ইরান ও আরবকে কি করে জীবিত করতে পারবে এই ফিরিঙ্গী সভ্যতা যা নিজেই কবরের কিনারে পৌঁছে গেছে।[১]

পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে উপকারের যে প্রতিদান দিয়েছে তার উল্লেখ করে বলেন :

فرنگیوں کو عطا خاك سوریا نے کیا
نبی عفت وغم خواری وکم ازاری

অর্থাৎ ফিরিঙ্গীদেরকে সিরিয়ার মাটি দান করেছে পবিত্রতার প্রতীক এক নবী যিনি সহানুভূতি ও কল্যাণেরও নবী (হযরত ঈসা আ.)।

صله فرنگ سے آیاھے سوریا کی لئے
مے وقمارو ھجوم زنان بازاری

ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে সিরিয়ার জন্য পুরস্কার এসেছে–মদ, জুয়া ও দেহপসারিণী মেয়েদের কোলাহল।[২]

প্রাচ্যের আধুনিকতাবাদীদের সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা

তাঁর মতে ইসলামী দেশসমূহে আধুনিকতার সমর্থকরা প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের ধ্বজাধারী। তিনি তাদের প্রতি সন্দেহভাজন ছিলেন। এই সন্দেহ প্রকাশ করতেন

---

১. জাভেদনামা, ৬৮ পৃ.।
২. যরবে কালীম, ১৫ পৃ.।

যে, এই আধুনিকতার আহ্বান ফিরিঙ্গী অনুকরণে পর্যবসিত যেন না হয়! তিনি বলেন :

لیکن مجھے ڈرھے کہ یہ آوازہ تجدید
مشرق میں ھے تقلید فرنگی کا بھانہ

অর্থাৎ কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, প্রাচ্যের এই আধুনিকতার চিৎকার যেন ফিরিঙ্গীদের অনুসরণ ও অনুকরণের রূপ না গ্রহণ করে![১]

তিনি এই সংশোধন ও নতুনত্বের (পাশ্চাত্য) আন্দোলনকারীদের পুঁজিহীনতা ও শূন্যতার কথা উল্লেখ করে বলেন :

میں ھوں نومید تیرے ساقیان سامری فن سے
کہ بزم خاوراں میں لے کے آئے ساتگیں خالی

অর্থাৎ আমি নিরাশ হয়েছি যাদুকর সুরাবাহিগণ হতে। কারণ প্রাচ্যের সভায় খালি সুরা পাত্র নিয়ে তারা আগমন করেছে।

نئی بجلی کھاں ان بادلوں کے جیب ودامن میں
پرانی بجلیوں سے بھی ھے جن کی آمنین خالی

ঐ সমস্ত মেঘের অভ্যন্তরে নতুন বিদ্যুৎ কোথায়? তাদের থলে পুরনো বিদ্যুৎ হতেও খালি।[২]

তিনি অন্যদের সভ্যতা ও চিন্তাধারার অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণের তিরস্কার করে বলেন, এটা প্রতিটি জাতির জন্য লজ্জার কথা, কিন্তু তা ঐ জাতির জন্য ক্ষমার অযোগ্য পাপ ও ক্রুটি, যে জাতিকে অন্যান্য জাতির নেতৃত্ব ও বিশ্ব বিপ্লবের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বলেন :

جو عالم ایجاد میں ھے صاحب ایجاد
ھر دور میں کرتاھے طواف اس کا زمانہ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৃষ্টি ও আবিষ্কারের জগতের একজন আবিষ্কারক, সর্বকালের মানুষ তার চতুর্দিকে শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে প্রদক্ষিণ করে।

---

১. যরবে কালীম, ১৭০ পৃ.।
২. ঐ, ৬৯ পৃ.।

تقلید سے نا کارہ نہ کر اپنی خودی کو
کر اس کی حفاظت کہ یہ گوھر ھے یگانہ

অনুসরণ ও অনুকরণ দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্বকে অকর্মণ্য ও অকেজো করো না। এর রক্ষণাবেক্ষণ কর, কারণ তা অমূল্য রতন।

اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک
ھے جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ

ঐ জাতির জন্য নতুনত্বের সংবাদ মুবারক হয় যাদের কল্পনায় কেবল রাতের সভাই থাকে।

لیکن مجھے ڈر ھے کہ یہ آوازہ تجدید
مشرق میں ھے تقلید فرنگی کا بہانہ

কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, এই নতুনত্বের চিৎকার প্রাচ্যে ফিরিঙ্গীদের অনুসরণ ও অনুকরণের ভান (ছাড়া আর কিছুই নয়)।[১]

তিনি প্রাচ্যের মুসলিম জাতির তিরস্কার ও নিন্দা করেন। যাদের পদ নেতৃত্ব ও পরিচালনার পদ কিন্তু তারা নিচের ধাপের শিষ্যত্ব এবং হীন ও অপমানিত ধরনের অনুকরণে আকৃষ্ট হয়েছে। সম্ভবত তুরস্কের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন :

کرسکتے تھے جوا اپنے زمانہ کی امامت
وہ کھنہ دماغ اپنے زمانہ کی ھیں پرو

অর্থাৎ যারা সমসাময়িককালে ইমামতি করতে পারত, তারা হয়েছে অসার মস্তিষ্কের অধিকারী ও অন্যের অনুসরণকারী।

তিনি 'জাবিদনামা'য় যুবরাজ সাঈদ হালীম পাশার মুখে তুরস্কের মোস্তফা কামালের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে কামালের সংস্কার ও বিপ্লবে গভীরতা নেই, তাই তিনি তা ফাঁকা হওয়ার ও তার চিন্তাগত অসারতার কথা বলেছেন। এটা আসলে অনুকরণের হীন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই তা নিন্দনীয়।

مصطفے کو از تجدد می سرور
گفت نقش کھنہ را باید زدود

১. যরবে কালীম, ১৭০ পৃ.।

অর্থাৎ মোস্তফা কামাল আধুনিকতার গান করেন আর বলেন, পুরনোকে মিটিয়ে ফেলা দরকার।

نونگردد کعبه را رخت حیات
گرزا فرنگ آیدش لات ومنات

কাবাগৃহের জীবন সামগ্রী নতুন হয় না, যদিও ইউরোপ হতে লাত-মানাত চলে আসে।

ترك را آهنگ نودر چنگ نیست
تازه اش جزکهنه افرنگ نیست

তুরস্কের জন্য বাঁশিতে নতুন সুর নেই। কামালের নতুন সুরও সেই ফিরিঙ্গী পুরনো সুর বৈ আর কিছুই নয়!

سینه اور ا دمے دیگر نبود
درضمیرش عالمے دیگر نبود

তাদের বক্ষে অন্য কোন প্রাণবায়ু ছিল না, তাদের অন্তরে অন্য কোন জগত ছিল না।

لاجرم باعالم موجود ساخت
مثل موم ازسوزایں عالم گداخت

এ কারণে বর্তমান জগতের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মোমবাতির মত, এর দহনে জগত গলে যাচ্ছে।

ইসলামী সভ্যতা ও তার উজ্জীবনী শক্তির প্রতি বিশ্বাস

ইসলামী সভ্যতা ও ইসলামী শরীয়তের (ধর্মীয় বিধি-বিধান) চিরস্থায়ী শক্তি এবং একটি নতুন জগত ও নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপ দানের ব্যাপারে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন। তিনি ১৯৩২ খৃস্টাব্দে অল মুসলিম লীগের কনফারেন্সের সভাপতির ভাষণে মুসলিমদের সম্বোধন করে বলেন :

যে দীনের তোমরা পতাকাবাহক সে দীন প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মান ও মূল্যকে মেনে নেয় এবং প্রত্যেককে এভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দেয় যে, সে নিজের সর্বস্ব আল্লাহ ও আল্লাহর বান্দাদের জন্য ব্যয় করে, সে সত্য দীনের, অন্তর্নিহিত ও গোপনীয় বস্তুসমূহ এখনও শেষ হয়নি। এই দীন এখনও একটি নতুন জগত সৃষ্টি করতে

সক্ষম; এতে দরিদ্ররা ধনীদের হতে ট্যাক্স নিতে পারে। এতে মানব সমাজ পেটের সাম্যের ওপর স্থাপিত নয়, আত্মার সাম্যের ওপর স্থাপিত হয়।

নতুন ইসলামী গবেষণাগার

পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তার এই বিশ্বাস ও অনুভূতি ছিল যে, মুসলমানদের জন্য এমন একটি স্বাধীন দেশের বড় প্রয়োজন, যেখানে ইসলামী জীবনের কর্মতৎপরতা তার প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় ও প্রতিটি দিকে প্রচলিত থাকতে পারে এবং ইসলামী শরীয়ত ও জীবন সম্পর্কিত ইসলামী রীতিনীতি, স্বীয় আল্লাহ্‌প্রদত্ত যোগ্যতা ও শক্তিকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে; ভারতবর্ষ (যেভাবে তিনি ১৯৩০ খৃস্টাব্দে মুসলিম লীগের সভার সভাপতির ভাষণে বলেন) এমন এক দেশ যেখানে মুসলমানগণ বহু বড় সংখ্যায় বসবাস করেছে, এ কারণেই ভারতবর্ষ এই পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত স্থান।

এখানে একটি ইসলামী কেন্দ্র (আরো স্পষ্ট কথায় ঐ গবেষণাগার) স্থাপিত হতে পারে। যেখানে ভাল সমাজ স্থাপন, সম্মিলিত জীবন ব্যবস্থা কায়েম, অর্থনৈতিক বিষয়ের মীমাংসা ও সভ্যতার সঠিক বিকাশ সম্ভব। বিশ্বাস ও কর্মের বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকতার এবং ব্যক্তি ও দলে যেখানে এমন এক ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে যা মানুষকে হতবাক করবে। ইসলামের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য করবে। তদুপরি ইসলামী দেশসমূহের শাসকদেরকে এর অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং জগতের চিন্তাবিদগণকে নতুন পদ্ধতির চিন্তা করবার জন্য প্রস্তুত করবে। এই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও উচ্চ সাহসিকতা যার উদাহরণ এ সময় ইসলামী জগতে পাওয়া খুবই কঠিন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তিতে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে এবং পাকিস্তানের অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

পাকিস্তানের প্রথম দিককার পরিচালকগণও এই চিন্তাগত ভিত্তিকে মেনে নিয়েছিল। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র এই চিন্তাধারায় হওয়ার কথা ছিল। একে ইসলামী জীবন পদ্ধতির কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল।

কায়দে আজম মুহাম্মদ 'আলী জিন্নাহ তাঁর এক বক্তৃতায় ১১ অক্টোবর ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে পাকিস্তানের সৈনিকদের স্থল, নৌ, বিমান বাহিনী ও সাধারণ শাসকদের সম্মুখে প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তান যার জন্য আমরা দশ বছর যাবৎ চেষ্টা করে আসছি, আল্লাহ্‌র ফজলে এখন তা একটি জীবন্ত বাস্তবতা। কিন্তু

নিজস্ব রাজ্য স্থাপন আমাদের উদ্দেশ্যের কেবল একটি দিক ছিল। প্রকৃত উদ্দেশ্য তা ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি রাজ্য স্থাপিত হোক যেখানে আমরা স্বাধীন মানুষের মত বসবাস করব, আমরা আমাদের এই দেশকে আমাদের প্রকৃতি ও সভ্যতার দাবি অনুযায়ী গঠন করব যেখানে ইসলামী ন্যায় বিচারের বিধি-বিধান স্বাধীনভাবে কার্যকর হবে।[১]

লিয়াকত আলী খান ১৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে পেশওয়ারের এক সভায় বলেছেন : পাকিস্তান আমাদের জন্য এক গবেষণাগার। আমরা বিশ্বকে দেখিয়ে দেব তের শ' বছরের পুরনো ইসলামী বিধান যে কত উপকারী ও কার্যকর বস্তু!

তিনি ১৯৫০ খৃস্টাব্দে অন্য এক জায়গায় বক্তৃতায় বলেছেন :

আমরা পাকিস্তানের দাবি এই উদ্দেশে করেছিলাম যে, মুসলমান নিজের জীবনকে ইসলামী কাঠামোতে ঢালাই করবে। আমরা এমন এক কর্মস্থলের দাবি করেছিলাম যেখানে এমন এক রাষ্ট্র স্থাপন করা হবে যে রাষ্ট্র ইসলামী মূলনীতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে যার চেয়ে উত্তম নীতি জগত সৃষ্টি করতে পারেনি।[২]

কিন্তু এ পরীক্ষা তার গুরুত্ব, সূক্ষ্মতা ও সুদূরপ্রসারী ফলাফলের প্রেক্ষিতে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ সৃষ্টিকারী (Epoch-making) ঘটনা। এমন সব নেতা দ্বারা তা কৃতকার্য হতে পারত, যারা ইসলামী শরিয়তের স্থায়িত্ব ও ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস রাখেন। যাদের আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতা, স্বার্থসিদ্ধি, সুবিধা অর্জন ও ফায়দা লুণ্ঠন হতে মুক্ত হবে এবং সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকবে, তাদের মনোভাব পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও দাসসুলভ চিন্তা হতে মুক্ত থাকবে। তাদের ঈমান দৃঢ় হতে হবে এবং নৈতিক সাহস থাকবে। তারা আধুনিক শিক্ষাকে দেশ ও সমাজ গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করবে এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও শক্তিসমূহকে নিজের শ্রেষ্ঠ দীনের উদ্দেশে ব্যবহার করবার শক্তি রাখবে এবং স্বাধীন ও নতুন ইসলামী জীবনের চাহিদা মোতাবেক একে ঢালাই করবার যোগ্যতা রাখবে।

সংকটপূর্ণ পরীক্ষা

কিন্তু এই পরীক্ষাকে সফলকাম করা এবং ইতিহাসের এই বিরল ও সোনালী সুযোগ দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য (যা শত শত বছরে কোন এক সময়ে কোন

১. Speeches; Quaid-Azam Mohammad Ali Jinnah, p.22.

১. নওয়ায়ে ওয়াক্ত, ৮ই জানুয়ারি ১৯৫০।

জাতির পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয় এবং বিশেষ রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থাসমূহের প্রেক্ষিতে ভারতের মুসলিমদের ভাগ্যে হয়েছিল) যে সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল তাদেরকে নির্বাচন ও মনোনয়ন দান করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়া হয়নি। তাদের শিক্ষা ও প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও পাওয়া যায়নি এবং একে এত প্রয়োজনীয়ও মনে করা হয়নি।

প্রাচ্যের ইসলামী দেশসমূহে সেই পাশ্চাত্য শিক্ষা কেন্দ্রে গমন করে যে মুসলিম যুবকদল নব্য শিক্ষা লাভ করেছিল (যাদের ভাগ্যে এই নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন ও প্রয়োজনীয় পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ ভার এসেছিল) তাদের পক্ষে এর চেয়ে উত্তম আদর্শ পেশ করা সম্ভব ছিল না যা বর্তমানে পাকিস্তানে দেখা যাচ্ছে। তারা নীতি গঠনে এই পদ্ধতি ছাড়া জগতকে অন্য কিছু দিতে সক্ষম ছিল না। এটা অতি সত্য, এ ধরনের বৃক্ষের এই ফলই হবে। কাজেই বৃক্ষকে যেমন তিরস্কার ও নিন্দা করা যায় না, ঠিক তেমনি এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর পশ্চিমা নেতৃবর্গ ও এ মানসিকতায় বেড়ে ওঠা পরিবেশকে তিরস্কার করা অনর্থক।

কারণ তারা এই নবজাত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য এমন পরিচালক ও নেতা সরবরাহ করতে পারেননি, যারা দীনের পূর্ণাঙ্গ হওয়া এবং তার অবিনশ্বরতায় অটল বিশ্বাসী। এ দিনের দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে তাদের মধ্যে প্রথম যুগের মুসলমানের মত আবেগ ও উদ্যম পাওয়া যায়নি। তারা পাশ্চাত্যের চিন্তা ও মূল্যবোধের সম্মুখে নতি স্বীকার করেছেন এবং নিজের দেশের রীতিনীতি ও পদ্ধতিকে তাদের নিজস্ব অর্থাৎ দীনী ছাঁচে ঢালাই করার পরিবর্তে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করেছেন, অথচ তাদের উচিত ছিল নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের লৌহকে নিজের বিশ্বাসের তাপ দ্বারা গলিয়ে নিজের সভ্যতার ছাঁচে ঢালাই করা এবং নিজের প্রয়োজন ও মেজায অনুসারে ছাঁচে প্রস্তুত করা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, পাকিস্তান স্থাপিত হওয়ার পর মোটামুটি এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু শিক্ষা নীতিকে (যা কোন দেশকে কোন বিশেষ পন্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মেরুদণ্ডের হাড়ের মর্যাদা রাখে) ইসলামী রূহ ও ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর জন্য নতুন সূত্রে বিন্যস্ত করা হয়নি, পাকিস্তানী জীবনকে ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করা হয়নি। আইনকে ইসলামী করা হয়নি। বিশৃঙ্খল মনোভাব, চারিত্রিক দোষ-ত্রুটির প্রসিদ্ধ ছিদ্র ও উৎসকে বন্ধ করার জন্য সাহসিকতার সাথে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি এবং পাকিস্তানকে যে একটি ইসলামী গবেষণাগার করার কথা ছিল তা করার জন্য আন্তরিকতাপূর্ণ কোন প্রকার চেষ্টাও

করা হয়নি। পাকিস্তান তো এক নতুন ইসলামী কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষার স্থান, যেখানে ইসলামী জীবন পদ্ধতির উপকারিতা, ইসলামী রীতিনীতি, আইনের যোগ্যতা ও ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের কার্যকর প্রমাণ প্রদর্শিত হবে এবং অন্যান্য উন্নত দেশের জন্য বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করা হবে। এর পরিবর্তে পারিবারিক আইন (Muslim Family Law) ১৯৬১ সালে এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পাকিস্তানের আইন প্রণয়নকারিগণ ও নেতারা শুধু পাশ্চাত্য চিন্তা ও মূল্যবোধ দ্বারা পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত নন, বরং পাশ্চাত্য ধারাকেই তারা আইন প্রণয়নের জন্য মীমাংসিত ভিত্তি বলে মনে করেন এবং শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ ও চিরস্থায়ী হওয়ার প্রতি তাদের তেমন কোন বিশ্বাস নেই।

শেষ পর্যন্ত ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় সংসদের ঢাকা অধিবেশনে ঐ পারিবারিক আইনকে মঞ্জুর করে নেয়া হয়েছে এবং যে সমস্ত সংশোধনী এই আইনের ওপর আনা হয়েছিল যা ছিল কুরআন ও সুন্নাহের পরিষ্কার আদেশ, ইজমা (ইমামদের সর্বসম্মতিক্রম মত) ও প্রথা (অর্থাৎ প্রথম যুগের জনসাধারণের ব্যবহৃত কার্যক্রম) অনুযায়ী তা রদ করে দেয়া হয়েছে। জনসাধারণ অবাক চিত্তে পাকিস্তান ভারতের পত্রিকাসমূহে এই সংবাদ পাঠ করেছে :

"এখানে গতকল্য জাতীয় সংসদ ভবনে প্রচুর সংখ্যাগরিষ্ঠের মত পারিবারিক আইনের সংশোধনীয় চেষ্টাকে রদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার কোন কোন দফার সংশোধনের বিল সংসদে পেশ করা হইয়াছিল, সামরিক আইন বলবৎ রক্ষাকালীন এই পারিবারিক আইন জারি করা হইয়াছিল। উহাতে পুরুষের জন্য একের অধিক বিবাহ করার স্বাধীনতা ক্ষমতা রহিত করা হইয়াছে। সংশোধনী পক্ষের লোকের দাবি ছিল– এই আইন শরীয়ত ও কুরআন শরীফের বিরোধী। কেননা কুরআনে একাধিক বিবাহের প্রকাশ্যে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তানের নতুন চিন্তাবিদের কথা হইল ঐ অনুমতি সাময়িক ছিল এবং উহার উদ্দেশ্য ছিল সমাজে ক্রমশ উহা বিলোপ করা।"

ইসলামের কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত[১] বিষয়ের প্রতি যখন পাকিস্তানের এই নীতি তখন জীবন ধারা, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি ও বিধান সম্পর্কে তার কাছে কোন উচ্চাশা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে নতুন স্বাধীন অধিকাংশ ইসলামী দেশকে সকল পর্যায়ে তুরস্কের অনুসরণ ও অনুকরণের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা

---

১. যে সমস্ত কাজের জন্য কুরআন পাকে প্রকাশ্য আদেশ রয়েছে, যথা: উত্তরাধিকার আইন, পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহের অধিকার।

যাচ্ছে। ফলে এই সকল নেতা (তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে) কামাল আতাতুর্কের অনুকরণের প্রতি অল্প-বিস্তর উৎসাহী বলে প্রতীয়মান হয়।

পাকিস্তানে আধুনিকতা, পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও মূল্যবোধকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে আধুনিক সংশোধনী, আইন-কানুন, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও সাহিত্য দ্বারা মনোভাব ও চারিত্রিক ছাঁচকে বদলে দেয়ার এবং এমন একটি নতুন জাতি তৈরির কাজ বর্তমানে পরিকল্পনার মাধ্যমে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে শুরু হয়েছে যেন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই রাষ্ট্র খুব সহজে গ্রহণ করতে পারে! মাদ্রাসা ও মসজিদকে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আনা হলে দীনের আলিম ও মুসলিম জনসাধারণের বিরোধিতা করার অবকাশ আর থাকবে না, বরং তাদের কাছ থেকে প্রতিবন্ধকতার পরিবর্তে ক্রমে ক্রমে সহযোগিতা পাওয়ার আশা করা যেতে পারে। একজন প্রকৃত সত্যাদর্শী ব্যক্তি যিনি আধুনিক দেশসমূহে পূর্বের ইতিহাস জানেন, তিনি সহজে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবেন যে, এদেশের নেতাদের ইচ্ছা কি, আর এ দেশ ক্রমশ নীরবে কোন্ লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে।

যা-ই হোক, পাকিস্তানের নিজের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী হতে পশ্চাৎপসরণ ও বর্তমান যুগের অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) ও আধুনিক (Modernist) রাষ্ট্রসমূহের অনুকরণ ইতিহাসের এক বড় দুর্যোগপূর্ণ ঘটনা ও কোটি কোটি লোকের সাথে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার এক দৃষ্টান্ত যারা ইসলামী কর্মক্ষেত্র হিসেবে একটি স্বাধীন দেশ স্থাপনের জন্য বড় কঠিন দুর্গতি-দুর্দশা ভোগ করেছিল এবং বৃহৎ কুরবানী পেশ করেছিল। এর চেয়ে বড় ক্ষতি এই হবে যে, এই কার্যের পদ্ধতি সব সময়ের জন্য এই উচ্চাশা ও উদ্যমকে চিরতরে শীতল করে দেবে। শুধু তাই নয়, একটি ইসলামী গবেষণাগার হিসেবে পাকিস্তানের ভূমিকা প্রায় লোপ পাবে। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা এর অনুমতিও দেবে না যে, আবার এর নাম নেয়া যায়। পাকিস্তানের এই গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক দায়িত্বের কথা প্রফেসর স্মীথ (Wilfred Cantwell Smith) খুব ভালভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি Islam in Modern History গ্রন্থে লিখেছেন :

সম্ভবত পাকিস্তানীরা কোন সময় এই ধারণা করবে যে, ইসলামী জীবন গঠনের কাজ তাদের প্রাথমিক ধারণা হতে বহু বেশি কঠিন। কিন্তু এখন তাদের জন্য পালাবার কোন রাস্তা নেই। তাদের প্রতিশ্রুতি ও দাবি এত উচ্চ ও পরিষ্কার ছিল যে, তাকে সম্পন্ন করার কাজ হতে পলায়ন অসম্ভব। তাদের ইতিহাস বর্তমানে ইসলামী ইতিহাস হবে। তাদের স্কন্ধে বহু বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে। এখন তারা এটাকে

পছন্দ করুক অথবা এর জন্য লজ্জিত হোক, যে কোন অবস্থায় তারা ইসলামী রাষ্ট্রের কল্পনাকে বাদ দিতে পারে না এবং এটাকে বেশি দিন পর্যন্ত নীরবে ফেলেও রাখতে পারে না। কেননা এই সময় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা ও কল্পনাকে শেষ করার পক্ষে মীমাংসা করার অর্থ শুধু এই নয় যে, কর্ম পদ্ধতির পরিবর্তন। এর অর্থ হবে নিজের দীন ও জন্মভূমির ওপর আঘাত হানা ও পলায়নী মনোভাব দ্বারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের কল্পনা ও চিন্তা অমূলক এবং এর দাবি কেবল একটি ধোঁকাই ছিল। কারণ তা নতুন জীবনের চাহিদাসমূহকে মেটাবার কোন যোগ্যতা রাখে না অথবা পাকিস্তানীরা এক জাতি হিসেবে একে নিজেদের জাতীয় জীবনে চালু করতে অকৃতকার্য হয়েছে। এই অবস্থায় জগতের সম্মুখে মুসলমানদের ঈমানের বিষয়সমূহ সন্দেহজনক হয়ে যাবে এবং সমালোচনার যোগ্য হয়ে পড়বে।[১]

দীনের পরিচালনার কঠিন কাজ

এই দুঃখজনক অবস্থার প্রেক্ষিতে যা বর্তমানে পাকিস্তানে উপস্থিত হয়েছে তার অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারত অথবা কমপক্ষে এর প্রভাবকে হালকা করতে পারত অথবা নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও দাওয়াতের ব্যাপারে সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক বেশি সংখ্যায় পাওয়া যেত এবং নতুন ও পুরানের মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য গড়ে উঠেছে তাকেও ছোট করা যেতে পারত এবং দুই শ্রেণীর লোক একত্র হয়ে এই বড় অভিজ্ঞতাকে সফল করতে পারত যেজন্য পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল। যদি ইসলামী চিন্তার পতাকাধারিগণ নিজেদের যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত এবং দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের অধিকতর বিশ্বাস অর্জন করতে পারত এবং এ চিন্তাগত ও আধ্যাত্মিক শূন্যতাকে পূর্ণ করতে কৃতকার্য হতো, যার অভাব নতুন শ্রেণীর লোক বহুদিন হতে ভীষণভাবে অনুভব করেছিল।

এটা ঐ সময় হতে পারত যদি ইসলামী চিন্তার পতাকাধারীরা ও ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারিগণ কিছু দিন পূর্ণ ধৈর্য ও স্থিরতার সঙ্গে নিজেদের সমস্ত যোগ্যতা ও শক্তি ইসলামী পদ্ধতির জীবন গ্রহণ করার জন্য পুরোপুরি কাজে লাগাত, যুবকদের মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি প্রদানে সক্ষম হতো এবং একাগ্র চিত্তে একে নিজেদের সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতো। এটা সাধিত হলে পাকিস্তান এমন এক শক্তিশালী দীনী নেতৃত্ব লাভ করত যা ব্যথিত হৃদয়

১. Islam in Modern History, পৃ.২, অনুবাদে 'চেরাগে রাহ' হতে গৃহীত, নযরিয়ায়ে পাকিস্তান বিশেষ সংখ্যা)।

ও নিশি জাগরণের পাশাপাশি জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে আবির্ভাব হতো এবং সকল প্রকার সংশয় ও রাজনৈতিক মতপার্থক্যের উর্ধ্বে উঠতে পারত তাহলে আধ্যাত্মিক শক্তি হৃদয়ের উষ্ণতা, স্বার্থহীনতা সকলের প্রতি সমান ব্যবহার, নিষ্ঠা, সাহসিকতা, কর্ম পদ্ধতির উচ্চাদর্শে এক অনুপম মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতীকরূপে বিশ্বে হতো সমাদৃত। মোটকথা, পাকিস্তান এমন এক নেতৃত্ব পেয়ে ধন্য হতো যার পরিচয় কবি ইকবাল এভাবে দিয়েছেন :

نگاہ بلند سخن دلنواز جاں پر سوز × یہی ہے رخت سفر میر کار واں

অর্থাৎ দৃষ্টি উচ্চ, কথা মধুর মনোহর, প্রাণদগ্ধ, যাত্রীদলের দলপতির জন্য এটাই পাথেয়।[১]

পাকিস্তানের জামাআতে ইসলামী

পাকিস্তানের জামাআতে ইসলামী পাকিস্তানে ইসলামী নীতি ও ইসলামী আইন চালু করার জোর দাবি করেছিল। তারা এই আশার অনেক কিছু পূর্ণ করতে পারত এবং এই শূন্যতাকে পূর্ণ করতে সক্ষম হতো, জনসাধারণের এই ধারণা ছিল। এই জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সৈয়দ আবুল 'আলা মওদূদী,[২]-এর মাঝে অসংখ্য এমন গুণাবলী রয়েছে যা তাঁকে বুদ্ধিমত্তার উচ্চ আসনে পৌঁছাতে পেরেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এক বিশ্লেষণকারী মস্তিষ্ক, শক্তিশালী কলম ও শক্তিশালী প্রকাশ ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি পাশ্চাত্যের নতুন চিন্তাধারা ও দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন। অন্যদিকে তিনি ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী জীবনের যোগ্যতায় বিশ্বাসী। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সমালোচনা[৩] ও ইসলামী শিক্ষার বর্ণনা ও ব্যাখ্যায়

---

১. উল্লিখিত লেখা ১৯৭০ সালের শেষ সময়ের, যখন ছিল পাকিস্তানে জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খানের শাসনকাল। এরপর এ মসুলমান দেশে গুরুত্বপূর্ণ ও মীমাংসাকারী পরিবর্তন ঘটেছে। গণতন্ত্রের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খানকে সরে যেতে হয়েছে। এরপর পাকিস্তান দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে অভিহিত হয়, এর নেতা শেখ মুজিবুর রহমান হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসনামলে ব্যাপক জুলুম, অত্যাচার ও অনিয়ম শুরু হলে নির্বাচন হয়। নির্বাচনকে অনিয়মের দোষে দোষারোপ করে একটি জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট একটি নতুন আন্দোলন আরম্ভ করে। জনগণ বহু ত্যাগ স্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত জুলফিকার আলী ভুট্টোকে সরিয়ে জেনারেল মুহাম্মদ জিয়াউল হক ক্ষমতা দখল করেন। পাকিস্তানের নতুন যুগ আরম্ভ হয়। ইসলামী আইন জারি হয়। বিচার বিভাগকে স্বাধীন করে দেয়া হয় এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে সন্তোষজনক বহু পরিবর্তন আসে যার ফলে ইসলামপন্থীরা কিছুটা সন্তুষ্ট হয়েছে। আশার আলো দেখতে পেয়েছে।

২. মাওলানা ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ সালে ইন্তিকাল করেছেন।

৩. পাশ্চাত্য সভ্যতা ও এর ভিত্তি সম্বন্ধে এই অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে সমস্ত পুস্তিকা লেখা হয়েছে তার মধ্যে তাঁর প্রবন্ধ 'তানকীহাত'– এর স্থান সর্বাগ্রে।

তাঁর রচনাসমূহ বিশ্বাস ও শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ এবং তাঁর রচনা ক্ষমা প্রার্থনা ও প্রতিরক্ষা নীতিবিমুক্ত, যা ইতিপূর্বের মুসলমান লেখক ও গ্রন্থকারদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর প্রাথমিক জীবনে ইসলামী মাসআলা, কর্মনীতি, ইসলামী দর্শন ও রাজনীতি বিষয়ে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে শক্তিশালী প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লিখেছেন, তা ভারতের ইসলামপ্রিয় শ্রেণীর মধ্যে খুবই সমাদৃত হয়েছে। তাঁর লেখা ঐ সমস্ত লোককেও তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছে যাঁরা ইসলামের ক্ষমতা ও প্রভাবের প্রতি আগ্রহী ছিল এবং বর্তমান অবস্থায় অশান্ত ছিল।

এই প্রভাবের ফল এই হলো যে, জামাআতে ইসলামী সংগঠন গঠিত হলো। যাদেরকে তাঁর কলম ও চিন্তা প্রভাবান্বিত করেছিল তারা সকলে একত্র হলো। পাকিস্তান হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে জামাআতের নেতৃত্ব পাকিস্তানে চলে গেল। কারণ পাকিস্তান ইসলামী চিন্তা ও ইসলামের প্রচারের জন্য বেশি উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের এক বড় দীনী দলের কিছু ফিকহী মাসআলা ও আকীদার বিষয়ে মাওলানা সাহেবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রেক্ষিতে তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল। অন্য দিকে জামাআত কার্যকরভাবে রাজনীতিতে ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার কারণে এর বিরুদ্ধে ঐ সমস্ত ব্যক্তি একত্র হলেন, যাদের ইসলামী আইন ও ইসলামী সংবিধানের দাবির মাঝে নিজেদের স্বার্থের অসুবিধা দেখা দিল এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিপদে পড়বার আশংকা দেখা গেল।

এই সমস্ত কারণে জামাআতকে বাইরের শত্রুতা ও কোন সময় ভেতরের বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আবার কোন সময় জামাআতের প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। ফলে তাদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক যারা এর প্রতিষ্ঠাতা ও চিন্তানায়কদের মধ্যে গণ্য হতো, জামাআত হতে ভিন্ন হয়ে যায়। অন্যদিকে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে এমন বাধা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। এ সব কারণে তার প্রচারের কাজে বহু বাধা-বিঘ্ন এসে যায়।

এই সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও সংগঠনের কার্যে ব্যস্ত থাকার কারণে জামাআতের পক্ষে জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার কাজ চালু রাখার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর খ্যাতিও গ্রহণীয় হওয়ার কারণ ছিল। অনেক নতুন বিষয়, অনেক নতুন দর্শন ও নীতি আছে যার ওপর নতুন উচ্চ মানের গবেষণামূলক রচনার ভীষণভাবে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যাচ্ছে যার জন্য যুবকদের মধ্যে ভীষণভাবে আগ্রহ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থায়

জামাআতের পরিশ্রম ও তার জন্য সময় দিচ্ছে না। ফলে এ সমস্ত বিষয়ের ওপর কোন নতুন ও বড় উপহার তারা দিতে পারছেন না।

কারণ যা-ই হোক, ঘটনা এই যে, জামাআতে ইসলামীর জন্য পাকিস্তানে একটি নিখুঁত প্রচার কর্ম পরিচালনার বহু বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য এখন খাঁটি দীনী আমন্ত্রণ পেশ করা, নিঃস্বার্থ দীনী খেদমত করা, নাস্তিকতা, দীনহীনতা, আত্মউপাসনা ও খাহেশাত পূজার বিরুদ্ধে এক প্রভাবশালী ও সম্মানজনক ক্ষেত্র প্রস্তুত করা খুব কঠিন কাজ হয়ে পড়েছে। এই সমস্ত জটিলতা হতে মুক্তির জন্য, একটি দীনী প্রচারকারী ও সংস্কারকের স্থান অর্জন করার জন্য জামাআতের দৃঢ় সংকল্প, সাহস, ত্যাগ ও বড় বিপ্লবী মনোবলের প্রয়োজন হবে।

ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا .

অর্থাৎ এর পর আল্লাহ্ তা'আলা কোন পথ বের করতে পারেন।

মুসলিম বিশ্বে মিসরের ভূমিকার গুরুত্ব

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে (যখন মুহাম্মদ 'আলী পাশা ফরাসীদেরকে মিসর থেকে বের করে দিয়ে নিজের রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন) মিসর তখন তৃতীয় কেন্দ্রীয় স্থান ছিল, যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা, সভ্যতা ও সামাজকিতার দ্বন্দ্ব বড় আকারে উপস্থিত হয়েছিল। ফরাসী আক্রমণ ও শাসন (যদিও খুব অল্প সময় ছিল[১] কিন্তু প্রভাব ও ফলাফলের বিচারে বহু দীর্ঘ বলা যায়) মিসর ভূমি ও আরব ইসলামী মানসিকতার মধ্যে ভাল বীজ বপন করেছিল। মিসরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ সরাসরি হয়েছিল।

ছাত্র ও জ্ঞানীদের দল যাদেরকে মিসরীয় সরকার নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করা এবং অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশস্ততার জন্য পাশ্চাত্য দেশ, বিশেষ করে ফ্রান্সে পাঠিয়েছিল, তারা অতি দ্রুত পাশ্চাত্য চিন্তা, ধারণা ও নীতি-নৈতিকতা মিসরে আমদানী করেছিল। ইসমাঈল পাশার আমলে সুয়েজ খাল খনন সমাপ্ত হয়েছিল যে সুয়েজ খাল ভূমধ্যসাগরকে লোহিত সাগরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছে এবং রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায় একটি বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছে। এ দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবধান কমে গেছে এবং মেলামেশা ও সভ্যতার আদান-প্রদানের একটি নতুন রাস্তা খুলে গেছে!

মিসরের নিজস্ব কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, বিশেষত্বের ভিত্তিতে যার ক্ষেত্রে তার কোন অংশীদার ও সমতুল্য নেই। সেই কারণে মিসর এই যোগ্যতা রাখে যে, তা এমন এক দেশ হতো যেখানে একদিকে সাইন্টিফিক জ্ঞানসমূহের উপাদান সংগৃহীত হতো যা ইউরোপ দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা অর্জন করেছে, অন্য দিকে মিসর হতো এলম ও একীনে পরিপূর্ণ ও পবিত্র জীবনের ভাল উৎসসমূহ (যা ইসলামী প্রাচ্যের মূল্যবান পুঁজি) দ্বারা উজ্জীবিত। মিশর ঐ সমস্ত ভাল অভিলাষ ও ভাল প্রেরণা দ্বারা পূর্ণ হতে পারত যা দৃঢ় আকীদা, ঈমান ও প্রেম দ্বারা পরিপূর্ণ। মিসর এই প্রকার বহু উত্তম গুণের প্রচুর পরিমাণ অংশ পেয়েছিল। আরবী ভাষা, সাহিত্য ও দীনী জ্ঞানসমূহে মিসরের বিশেষ অবদান রয়েছে। প্রচার ও প্রকাশনার প্রচুর সুযোগ-সুবিধা সেখানে রয়েছে।

---

১. জুলাই ১৭৯৮ হতে ১৮০১ পর্যন্ত তিন বছর তিন মাস।

আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে (যা ইসলামী বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দীনী ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র) আছে এবং তারা সৃষ্টিগত কোমলতা ও সভ্যতা, কৃষ্টির আদান-প্রদান, অভিজ্ঞতার অধিকারী। ফলে তারা প্রাচীন কাল হতেই তাদের পারদর্শিতা ও যোগ্যতার কারণে এ সম্পদ বণ্টন ও এর প্রশস্ততা প্রদানেও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারত। মিসর ইসলামী বিশ্বের এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে স্বাধীনভাবে, ভদ্রতা সহকারে, আত্মমর্যাদা ও সমতা রক্ষা করে সে নিজেও উপকৃত হতে পারত, অন্যেরও উপকার করতে পারত। তারা আদান-প্রদান (Exchange)-এর ক্ষেত্রে সফল ও পবিত্র আদর্শ স্থাপন করতে পারত। আর এই আদান-প্রদান ও লেনদেনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন ক্ষতি হতো না।

একটি নতুন সুয়েজ খালের প্রয়োজন

মিসর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জন্য এমন একটি খাল প্রস্তুত করতে পারত, যা দ্বারা জগতের সমস্ত জাতি বহু গুণে উপকৃত হতো এবং তা মানব জাতির ভবিষ্যৎ ও জগতের ইতিহাসের জন্য বর্তমান সুয়েজের চেয়ে হাজার গুণে বেশি প্রভাবশালী বলে প্রমাণিত হতে পারত। এটা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে খাঁটি সাম্য, সম্মানিত পরিচয় ও মত বিনিময়ের একটি অনন্য পন্থা (Channel), জ্ঞানে ও শিল্পে পশ্চাৎপদ প্রাচ্যকে উন্নত পাশ্চাত্যের সঙ্গে মিলিত করতে সক্ষম হতো এবং হতবুদ্ধি ও পথভ্রষ্ট পাশ্চাত্য (যারা চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে শূন্য, নিরাশ ও আত্মহত্যার পথে ধাবমান) ঐ প্রাচ্যের সাথে একত্র করতে পারত যেখানে আল্লাহর দীন ও আল্লাহর শেষ পয়গাম ইসলাম এসেছে, যা শান্তির পথ, স্থিরতা ও আত্মিক সন্তুষ্টির পথ যা ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও ঈমানের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। কারণ পাশ্চাত্য আশ্চর্যজনক ও বিশাল উপায়-উপকরণের মালিক, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট।

অপর দিকে প্রাচ্যের রয়েছে সঠিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, কিন্তু উপায়-উপকরণ হতে বঞ্চিত। পাশ্চাত্য করতে পারে কিন্তু করার সঠিক উদ্যমতা ও উৎসাহ রাখে না আর প্রাচ্য যা করতে চায় করতে পারে না। মিসর এই উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটাতে পারত এবং যার কাছে যা আছে তা পারস্পরিক আদান-প্রদান হতো মানবতার উন্নতি সাধনে। জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তার এমন একটি সুয়েজ খাল যদি সৃষ্টি হতো তাহলে বিশ্ব লাভ করত এক নতুন দিক-নির্দেশনা। ফলে নতুন গতির সৃষ্টি হতো এবং নতুন ইতিহাসের ধারা সৃষ্টি হতো। মিসর এভাবে বিশ্ব-নেতৃত্বের উচ্চ পদে আসীন হতো।

আর এটা তখনই সম্ভবই ছিল যদি মিসরে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগমনের সময়েই সে নিজের দীনী দাওয়াতের কাজে ত্যাগের উদ্দীপনা রাখত এবং আধুনিক জ্ঞানসমূহকে ঠিকমত আত্মস্থ করে তাকে অতিরিক্ত সাহায্যের কারণ বানাত এবং এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মের জন্য তাকে ব্যবহার করত। কারণ তার ছিল অন্যাদের চেয়ে অধিক সুযোগ।

অনুসরণের ক্ষেত্রে মিসরের দুর্বল দিক

কার্যত বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শিক্ষা ব্যবস্থা মিসরকে সুস্থ নেতৃত্ব পরিচালনা ও পাশ্চাত্যকে প্রভাবান্বিত করার গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হতে অমনোযোগী করে দিয়েছে এবং তাকে পাশ্চাত্যের একজন ছাত্র ও অনুসরণকারী অথবা ভিক্ষুকের পদে দাঁড় করিয়েছে। তারা এই খালের কার্যক্রমকে কেবল বাইরে থেকে মাল আমদানী করার (Import) কাজ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেছিল। এ কারণে মিসরবাসীদের অনন্য বৈশিষ্ট প্রস্ফুটিত হতে পারেনি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা মিসরকে, বরং আরব বিশ্বকে এমন দুর্বল ও অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তা হলো দুঃখজনক রাজনৈতিক অবস্থা যা উনবিংশ শতাব্দীতে মিসরে বিদ্যমান ছিল এবং এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছে গোটা মুসলিম বিশ্ব। পরিস্থিতি হলো বিদেশী আধিপত্য, বিশেষত বৃটিশ আধিপত্য যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সকল মুসলিম বিশ্বে স্থাপিত হয়েছিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণে মুসলিম বিশ্বের চিন্তাবিদ ও নেতাগণ কোন সুযোগ পাননি যে, তারা অন্য বিষয়ের দিকে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিতে পারেন। তাদের সমস্ত শক্তি ও যোগ্যতা একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়, তা পরাধীনতা হতে মুক্তি লাভ। এ ছাড়া অন্য বিষয়ে ভাবার কোন সুযোগ ছিল না।

সায়্যিদ জামালউদ্দীন আফগানী

জামালুদ্দীন আফগানী[১] মুসলিম বিশ্বের এক বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি ভ্রমণ ও অধ্যয়ন দ্বারা পাশ্চাত্যের সাথে গভীরভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এত বেশি প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর এমন একটি আবরণ পড়েছিল যাতে তাঁর ব্যক্তিত্ব কোন কোন ব্যাপারে অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রতি পরস্পরবিরোধী প্রবণতা ও পরস্পর

---

১ জামালউদ্দীন আফগানী সম্পর্কে জানার জন্য ড. আহমদ আমীনের যু'আমাউল-ইসলাহ ফিল'আসরিল

বিরোধী কথা আরোপিত হতে লাগল। তাঁর ভাষণ ও রচনার যত অংশ রক্ষিত হয়েছে এবং শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁর অবস্থা, চরিত্র ও জ্ঞান সম্পর্কে যে ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছেন তা দ্বারা বিস্তৃতভাবে তাঁর দিলের অবস্থা ও প্রকৃত মনোভাব ও ব্যক্তিমনোভাব ও জীবন সম্বন্ধে যথাযথ জানা যায় না এবং তার অনুমানও করা যায় না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তাদের চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ও চিন্তা-ভাবনা কি ছিল।[১]

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও এর জড় দর্শনের মুকাবিলা করা, তার সমালোচনা করা ও প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের চিন্তার বেষ্টনী ও প্রভাব হতে মুক্ত রাখার ব্যাপারে তাঁর কত দূর যোগ্যতা ছিল এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। তাঁর ছোট কিতাব الردّ على الدّهريين দ্বারা অনুমান করা শক্ত ব্যাপার। কিন্তু মহাকবি ইকবাল তাঁর সম্পর্কে বহু উচ্চ ধারণা রাখতেন, ইকবালের নিকট পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নতি, ইসলামী বিশ্বে যে মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল তাকে তিনি দূরীভূত করতে পারতেন। এদিকে ইসলামের সনাতন বিশ্বাস, ধারণা ও চারিত্রিক নীতিমালা ও আধুনিক কালের রীতিনীতির মধ্যে যে প্রশস্ত ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তাকে সংকুচিত করার কাজ সায়্যিদ জামালউদ্দীন আফগানীর ব্যক্তিত্ব বহু উপকারী ও প্রভাবশালী প্রমাণিত হতে পারত। তদুপরি তাঁর ছিল গভীর বোধশক্তি ও স্বভাবগত যোগ্যতা, কবি ইকবাল তাঁর এক ভাষণে সম্ভবত ঐ কথাকে লক্ষ্য করে বলেছেন :

মুসলমানদের সামনে অতি বড় কাজ রয়েছে। আমাদের ফরয (অবশ্য করণীয়) কাজ হচ্ছে, অতীত হতে সম্পর্ক কর্তন করা ছাড়া ইসলামের ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে নতুনভাবে গভীর চিন্তা করা। এই শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম ফরয কাজের প্রকৃত গুরুত্ব ও প্রশস্ততার পূর্ণ অনুমান জামালউদ্দীন আফগানীর ছিল। জামালউদ্দীন আফগানী ইসলামী জীবন ও চিন্তাধারার ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতেন এবং সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের মানুষ, তাদের অভ্যাস ও স্বভাবের বাস্তব অভিজ্ঞতাও রাখতেন। এটা নিশ্চিত যে, তাঁর দৃষ্টির সীমা খুবই প্রশস্ত ছিল। এ

---

১. গত কয়েক বছর হতে আরবী ভাষায় এমন প্রবন্ধ, ভাষণ ও পুস্তিকা বের হওয়া আরম্ভ হয়েছে যে, ঐ সমস্ত দ্বারা সায়্যিদ জামালউদ্দীন আফগানী ও তাঁর বিজ্ঞ শিষ্য শেখ মুহাম্মদ আবদুহু-এর ব্যক্তিত্ব, আকীদা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভীষণ সন্দেহ-দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে ড. মুহাম্মদ হুসাইন (ইসকান্দারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগীয় প্রধান)-এর ভাষণ যা তিনি কুয়েতে দিয়েছেন এবং গাযীআত তাওবার পুস্তিকা আলফিকরুল ইসলামী আল-মুআসির-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেখ মুহাম্মদ আবদুহুর চিঠিপত্রের সঞ্চয় যা বর্তমানে ইরানে প্রকাশিত হয়েছে, তা দ্বারা ঐ সন্দেহ আরো জোরালো হয়েছে।

কারণে এটা কোন কঠিন কাজ ছিল না যে, তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি জীবিত জাগ্রত সেতুবন্ধন হয়ে যেত।

তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম যদি কেবল ইসলাম মানব জাতিকে যে ধরনের কর্ম ও ঈমানের শিক্ষা দিয়েছে তার প্রকৃতি কি, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে লিপ্ত থাকত তাহলে আমরা মুসলমানরা আজ নিজেদের পায়ের ওপর খুব দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াতে পারতাম।[১]

কিন্তু সাধারণত ইসলামী বিশ্বের, বিশেষ করে মিসরের অবস্থা (সেখানে জামালউদ্দীন আফগানী নিজের জীবনের প্রচুর সময় কাটিয়েছেন এবং তাঁকে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কল্পনার উদ্যম ও আবেগের কেন্দ্র বানিয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ স্বভাব (তথা তাঁর প্রতিভা ও অসাধারণ ইসলামী জোশ, আফগানীয় আত্মমর্যাদা ও অনুরূপ অভিপ্রায়) তাঁকে বিদেশী আধিপত্য ও বৃটিশ রাজত্ব অবসানের কঠিন কাজের বাইরে অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেবার সময় দেয়নি এবং তাঁর সমস্ত চেষ্টা-তদবীরের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব কার্যকর ছিল। তাঁর মনোভাব ও তাঁর তবলীগ ও মিশনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁর প্রিয় শিষ্য শেখ মুহাম্মদ আবদুহু নিম্নলিখিতভাবে প্রদান করেছেন, তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল একটি এবং সে দিকেই তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনা চালিত করেছেন। নিজের সমস্ত জীবন সেই চেষ্টায় ও উদ্যোগে কাটিয়েছেন। সেই রাস্তায় বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ ও বিপদ সহ্য করেছেন, তা ঠিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের দুর্বলতা দূরীভূত করা এবং তাকে জাগ্রত করা যেন তা জগতের প্রভাবশালী ও শক্তিধর জাতিসমূহের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অগ্রগামী হতে পারে। এভাবে এ সত্য দীনের (ইসলাম) সম্মান ও শক্তি অর্জিত হতে পারে। প্রাচ্য দেশসমূহ হতে বৃটিশ আধিপত্য শেষ হওয়া তাঁর এই প্রোগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।[২]

মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু

শেখ মুহাম্মদ আবদুহুর সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি ইসলামের প্রতিরোধ করা (অর্থাৎ ইসলামের ওপর আনীত আপত্তিকে বাধা দেয়া), শিক্ষানীতির সংশোধন করা ও নতুন প্রজন্মকে দীনের সাথে পরিচিত করার বিষয়ে বড় উপকারী খেদমত করেছেন। এই ঘটনা প্রকাশ করা জরুরী মনে হচ্ছে যে, তিনি আরব জগতে সংস্কারের প্রাথমিক পতাকাবাহীদের একজন ছিলেন এবং ইসলাম ও বিংশ শতাব্দীর

---

১. তাশকীলে জাদীদ ইলহিয়্যাতে ইসলামিয়া, খুতবাহ নং ৪, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

২. যুআমায়ুল ইসলাহ ফিল আসরিল হাদীস, ড. আহমদ আমীন, পৃ. ১০৬

জীবন ও সামাজিকতার মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করার জন্য জোর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাঁর চিন্তা ও লেখায় পাশ্চাত্য মূল্যবোধের গভীর ছাপ পাওয়া যায়। তিনি ইসলামের এমন ব্যাখ্যা করতে চান যাতে ইসলাম ঐ সমস্ত পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সাথে খাপ খায়।

তিনি ফিক্‌হ (ইসলামী শরীয়তের আইন) ও শরীয়তের আদেশাবলীর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন যাতে আধুনিক সভ্যতার দাবিসমূহের বেশির ভাগ পূর্ণ হতে পারে। এই হিসেবে তাঁর মধ্যে ও স্যার সৈয়দ আহম্মদ খানের মধ্যে বেশি প্রভেদ দেখা যায় না। মুফতী মুহাম্মদ আবদুহুর এই প্রবণতা তাঁর তাফসীর, ফতোয়া ও রচনাবলীর মধ্যে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তার পরে সেই সকল আধুনিকতাবাদী নব্য গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে যারা সাধারণত মুফতী আবদুহুর[১] গ্রন্থাদি হতে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। মিসরের বৃটিশ প্রধান শাসনকর্তা লর্ড ক্রেমার তার গ্রন্থ Modern Egypt-এ শেখ মুহাম্মদ আবদুহুর এই প্রবণতা ও এর উপকারিতার কথা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু মিসরের নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই পরিকল্পনা ভারতের ঐ পরিকল্পনার সাথে মিলে যায় যা আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান স্থাপন করেছেন।[২]

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, আমাদের দৃষ্টিতে মুফতি মুহাম্মদ আব্দুহ-এর রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণ হলো তিনি মুসলমানদের সাথে সৃষ্ট পাশ্চাত্যের দূরত্বকে কমিয়ে আনার চেষ্টায় লিপ্ত। তিনি ও তাঁর বন্ধুগণ সকল সম্ভাব্য সাহায্য পাওয়ার যোগ্য ও তাদেরকে উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন। কেননা তাঁর ইউরোপীয় সংস্কারকদের প্রকৃত বন্ধু ও সাহায্যকারী।[৩]

এভাবে নিউম্যান তার গ্রন্থ Great Britain-এ শেখ মুহাম্মদ আবদুহুর ছাত্র ও তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করে লিখেছেন :

এতদ্ব্যতীত তাঁর প্রোগ্রামে এও ছিল যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে মিসরে প্রবেশ করাবার কার্যে বিদেশীদের সাথে সহযোগিতা করার ব্যাপারে উৎসাহ বৃদ্ধি করা।

---

১. এই সম্পর্কে তাঁর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, (১) রিসালাতুত তাওহীদ; (২) আল-ইসলাম ওয়ান নাসরনিয়্যা ফিল ইলমি ওয়াল-মাদানিয়্যা ।

২. এই প্রভেদের সাথে যে শেখ মুহাম্মদ আবদুহু আরবী ভাষা ও সাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্যের গভীর জ্ঞান রাখতেন এবং স্যার সৈয়দের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ ও হালকা ছিল।

৩. Modern Egypt,p.p.179-180.

এই কারণেই লর্ড ক্রেমার মিসরে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে ঐ দলের ওপরই নির্ভর করেছিলেন। এ কারণেই তিনি (মুফতী মুহাম্মদ আবদুহুর বিশ্বস্ত) সাদ যগলুল পাশাকে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত[১] করেছিলেন।

সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর আন্দোলনের প্রভাব ও তাঁর চিন্তাধারা

এই মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রাচ্যের বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা জামালউদ্দীন আফগানীর মত আবেগপূর্ণ ও অনুভূতিশীল ব্যক্তির পরিশ্রম ও চেষ্টার জন্য অন্য কোন ক্ষেত্র বাকি রাখেনি এবং তিনি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গঠন ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন প্রয়োজনীয় খেদমত সমাধা করতে পারেননি। পাশ্চাত্য সভ্যতার গভীর ও ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও স্বাধীনভাবে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করে এর আলোতে এমন এক নতুন মত ও পথ প্রস্তুত করার সুযোগও তাঁর মেলেনি যা পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে এবং প্রাচ্যের শক্তিশালী অনুকরণ প্রবণতার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে।

কিছু নব্য শিক্ষিত ও প্রতিভাবান মুসলমান প্রজন্মের দৃষ্টিতে যাঁর স্থান খুবই উচ্চে, তিনি সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে একজন যাঁরা নব্য ইসলামী প্রজন্মকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় দিক হলো এই যে, তিনি মিসরের শিক্ষিত সমাজ ও প্রতিভাবান শ্রেণীকে নাস্তিকতা ও দীনহীনতার কবল থেকে রক্ষা করেছেন।

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইসলামী চিন্তা ও জ্ঞানের প্রভাব এবং এর প্রতি মোটামুটি বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকার ব্যাপারে তাঁর রচনাসমূহ ও তাঁর প্রভাবের নিশ্চয় কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। ব্রোকেলম্যান (Brockelman) ঠিকই বলেছেন :

মিসরের আত্মিক জীবনের ওপর পূর্বে ইসলামের কর্তৃত্ব ছিল। বর্তমানেও এই অবস্থা অবশিষ্ট রয়েছে। এটা বেশির ভাগ জনৈক ইরানী জামালউদ্দীনের কারণে হয়েছে যিনি রাজনৈতিক কারণে যে দেশে তাঁর যৌবন কাটিয়েছিলেন। সে দেশের সাথে যুক্ত করে নিজেকে আফগানী বলে পরিচয় দিয়েছেন।[২]

---

১. Modern Egypt,p. 165.

২. (Carl Brokelman) Carl Brockelman-Geschichte Der Islamischen Voelker Und Staaten, Munchen-Berlin 1939.

আরব জগতে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রধান প্রচারক

ঐ যুবক যে নতুন প্রজন্মের নয়নমণি ও জাতির সম্পদ ছিল, যদি সে প্রথমে মিসরে আধুনিক জ্ঞান অর্জন করত, অতঃপর ইউরোপে গিয়ে নতুন শিক্ষাকেন্দ্রে ভ্রমণ করত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সাগরে ডুব দিত, সে যদি পাশ্চাত্য পরিবেশে যে অধ্যয়ন ও গবেষণা করবে তাকে চিন্তার স্বাধীনতা ও চারিত্রিক সাহসের সঙ্গে অনুসরণ ও অনুকরণ করতো, কোন জিনিস তার দুর্বলতাসহ চক্ষু বুজে গ্রহণ করাকে দূষণীয় মনে করা হতো এবং তা হতে বেঁচে থাকা উচিত, এই শিক্ষা যদি সে মিশরে পেত তাহলে এ আশা করা যেত যে, এ ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাচ্যের মুসলিম যুবকদের মধ্যে (যারা মিসর যেমন ইসলামী দেশে জ্ঞান ও দীনের কেন্দ্রের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে এবং কুরআন পাককে প্রতিটি কাল ও সময়ের জন্য চিরস্থায়ী বিধান এই বিশ্বাসের সাথে পাঠ করেছে) এমন ব্যক্তি সৃষ্টি হবে যার স্পষ্ট অনুধাবন ক্ষমতা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তা-ভাবনার মৌলিক দুর্বলতা, বস্তুবাদী উগ্রতা, তীব্র জাতীয়তাবোধ, মানব ও মানবীয় জ্ঞান ও আত্মার বিশালতা, উন্নতির ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবে এবং তাদের মধ্যে ইসলামী প্রেরণা ও ইসলামী মর্যাদাবোধ, মানবতার উচ্চ মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা, মিথ্যা ও কাল্পনিক সভ্যতার প্রতি ঘৃণা ও এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এক নতুন রূহ সৃষ্টি হবে। তাদের মধ্যে মহাকবি ইকবালের মত স্বাধীন, আলোকিত চিত্ত চিন্তাবিদ ও মুহাম্মদ আলীর মত বিপ্লবী ও সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হবে।

প্রকৃতপক্ষে মিসর ও অন্যান্য আরব দেশে এরূপ বিদ্রোহী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন এই ধারণা করা হয়েছিল এবং এর সংখ্যা অনারব অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ হতে বেশি হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এর বিপরীত হয়েছে। আরব ও ইসলামী দেশসমূহে ইকবাল ও মুহাম্মদ আলীর মত পাশ্চাত্যবিরোধী ইসলামের প্রেমিক দেখা যায়নি, অথচ উল্লিখিত দু'জনই ইসলামী কেন্দ্র হতে বহু দূরে অনারব ও অনৈসলামী পরিবেশে জীবন কাটিয়েছেন। তাঁদের শিরার মধ্যে খাঁটি ভারতীয় রক্ত প্রবাহিত ছিল। তাঁরা ঐ দেশের মাটির সন্তান যে দেশ আরবী ভাষা ও আরব সভ্যতার সাথে অপরিচিত ছিল।[১]

---

১. মহাকবি ইকবাল বিভিন্ন কবিতায় নিজের ভারতীয় বংশ ও ভারতীয় জাতি হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন। জনৈক দার্শনিক সৈয়দযাদাকে সম্বোধন করে বলেছেন : আমার মূল সোমনাথের, আমার পিতা লাত ও মানাতের পূজা যেখানে হয় সে স্থানের, আর তুমি সৈয়দ হাসেমী বংশের সন্তান। আমি ব্রাহ্মণজাত। এভাবে মাওলানা মুহাম্মদ আলীও উত্তর ভারতের ভারতীয় বংশের ছিলেন।

দু'জনেই পাশ্চাত্যের অগ্নিকুণ্ডে পুড়ে স্বর্ণ হয়ে বের হয়েছিলেন। এর বিপরীত পাশ্চাত্য শিক্ষিত প্রায় আরব যুবক পাশ্চাত্যের প্রচারক ও প্রতিনিধি সেজে ফেরত এসেছে এবং পাশ্চাত্যের অনুসরণকারী ও এ সভ্যতার পূর্ণ প্রবক্তা সেজে গেছে।

লর্ড ক্রেমার নতুন মিসরের আকৃতি দানের সবচেয়ে বড় একজন পাশ্চাত্যে কমিশনার ছিলেন। তার মতে মিশর ইসলামের সাথে নামমাত্র সম্বন্ধ রেখে পাশ্চাত্য চিন্তা-ভাবনা ও মূল্যবোধের দাসত্বের পতাকাধারী হবে। তিনি এই শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাস, মনোভাব ও চারিত্রিক অবস্থায় ছবি অংকন করেছেন এবং খুবই সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কিভাবে এরূপ এক নতুন জীব সৃষ্টি হয়েছে যা পূর্ণ মুসলমানও নয় এবং পূর্ণ পাশ্চাত্যবাসীও নয়। ইউরোপের ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী খৃস্টান ও প্রাচ্যের ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তিনি এও ঠিকমত চিহ্নিত করে দিয়েছেন যে, ঐ সমস্ত লোকের পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হওয়া ইসলামী সভ্যতায় তাদের স্থান নির্ণয়, তাদের হতবুদ্ধিতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া ও ইসলামী জীবনের সাথে সম্পর্কহীনতা কত দূর পৌঁছেছে। এ সব বিষয় তাঁর প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। তিনি তাঁর Modern Egypt গ্রন্থে লিখেছেন :

মিসরীয় সমাজ দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যার স্বাভাবিক ফল এই হয়েছে যে, এমন কতক লোকের একটি দল সৃষ্টি হয়েছে যারা নামেমাত্র মুসলমান বটে, কিন্তু ইসলামী সভ্যতাবিবর্জিত। যদি তারা ইউরোপীয় হয় তবে কোমর ভাঙ্গা (দুর্বল ও ইউরোপীয় গুণাবলী হতে শূন্য)। ইউরোপীয় ভাবাপন্ন মিসরের লোক অনেক সময় নামেমাত্র মুসলমান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণত তারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র গুণাবলীর অস্বীকারকারী (Agnostic) হয়ে যায়। তাদের ও আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আলিমের মধ্যে এত বড় পার্থক্যের সৃষ্টি হয় যেমন একজন আলিম আর একজন ইউরোপীয়ের মধ্যে।[১]

লর্ড ক্রেমার অন্য এক জায়গায় লিখেছেন :

সত্য কথা এই যে, ইউরোপীয় শিক্ষাঙ্গন অতিক্রম করে মিসরের যুবকগণ নিজের ইসলামী জীবন অথবা কম পক্ষে তার উৎকৃষ্ট অংশ হারিয়ে বসে। তাদের এই বিশ্বাস থাকে না, আমি সর্বক্ষণ আমার সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে আছি, যাঁর সম্মুখে একদিন না একদিন আমার কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু তারা এখনও

---

১. The Earth of Cromer, Modern Egypt (1908), Vol. H, p.228-29

ইসলামী জীবনের ঐ অংশসমূহ দ্বারা উপকৃত হতে থাকে যা তাদের চারিত্রিক দুর্বলতাসমূহকে সহ্য করে এবং যা জীবনের কার্যকলাপে তাদের সুবিধা-সুযোগের সাথে সংগতি রাখে। কিন্তু ইসলামী জীবনধারা হতে দূরে সরে শিক্ষিত মিসরীয়দের পক্ষে খৃস্টান হওয়াও খুব কঠিন।[১]

তিনি আর এক জায়গায় লিখেছেন :

মিসরের প্রগতিবাদীদের ধারণা ইউরোপীয় প্রগতিবাদীদের ধারণা হতেও অগ্রবর্তী। তারা নিজেকে এমন এক স্রোতস্বিনী নদীর মধ্যে পায় যেখানে কোন নৌকা নেই এবং কোন নাবিকও নেই। তাদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা তাদের ওপর কোন বাধা সৃষ্টি করে না। তারা দেখে তাদের দেশের সংখ্যাগুরু দল ধর্মে ন্যায্য সংশোধনীর বিরোধী। তাদের ধারণায় ধর্মই এই অনুচিত ফলাফলের দিকে তাদেরকে নিয়ে যায়। তাই তারা খুবই অসন্তুষ্টি ও রাগের সাথে একে পদদলিত করে একেবারে ছেড়ে দেয়। তারা নিজের ধর্ম হতে বিমুখ হয়ে শুধু নিজের নগ্ন ব্যক্তিগত সুবিধা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, অন্য কোন বাধাও তাদেরকে চারিত্রিক আইনের সীমায় রাখে না। যদিও তারা ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণের চেষ্টায় আছে কিন্তু ঐ ইউরোপীয়রা নিজ জাতির চারিত্রিক আইনের আওতায় বাঁধা থাকে, মিসরের যুবকদের সমাজ মিথ্যা ও ধোঁকাবাজিকে খুবই শক্তভাবে নিষিদ্ধ বলে মনে করে না, বিভিন্ন ধরনের চারিত্রিক কুকর্মের জন্য সামাজিক দুর্নামের ভয়ও কার্যত তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে না।

নিজের পৈতৃক ধর্মের প্রতি তারা দৃষ্টিও দেয় না। তারা যে ওটাকে ছেড়ে দিয়েছে শুধু এমনই নয়, বরং ওটাকে পদাঘাত করে। তারা চক্ষু বুজে ইউরোপীয় সভ্যতার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের এই জ্ঞান হয় না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বাইরের স্পষ্ট দিক কেবল তার বাইরের অংশই বটে। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় সভ্যতার তরীকে খৃস্টান চরিত্রের গভীর শক্তি অন্যায় কার্যকলাপ হতে রক্ষা করে। এই শক্তি একটি সুপ্ত শক্তি। এ কারণে ইউরোপীয় জীবনের নীতিকে ভ্রান্ত অনুসরণকারী পেতে পারে না। তারা শপথ করে বলে, আমরা ধর্মীয় গোঁড়ামিকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। তারা পৈতৃক শিক্ষাকে ঘৃণা করে। তারা ইউরোপীয়দের বলে, দেখ, আমাদের রেলগাড়ী আছে, স্কুল আছে, নিজ পত্রিকা, বিচারালয় ও অন্যান্য জিনিস যা তোমাদের সভ্যতার অংশ বিশেষ, সমস্ত আমাদের কাছে আছে। আমরা কি তোমাদের চেয়ে কোন্ অংশে কম?

---

১. The Earth of Modern Egypt (1908), Vol. II p.228-29.

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইসলামত্যাগী, ধর্মদ্রোহী মুসলমান যদিও তাদের এই অক্ষমতার জ্ঞান নেই যে, তারা ইউরোপীয় হতে এক হিসেবে অতি নিম্ন মানের মানবগোষ্ঠী হয়েছে যা সহজে দূর করাও যায় না। একজন সভ্য ইউরোপীয় যদিও মজবুত খৃস্টান না হয়, কিন্তু তবুও সে খৃস্টানের উৎপাদন। যদি উনবিংশ শতাব্দীর খৃস্টান সভ্যতা এর পিঠের ওপর না হতো সে ঐরূপ হতো না যেমন সে (প্রকৃতপক্ষে) আছে।[১]

মিসরে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার প্রভাব

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সামাজিকতার গভীর প্রভাবের এক প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত নারী স্বাধীনতার প্রসিদ্ধ মিসরীয় দলপতি কাসিম আমিনের কিতাব 'তাহরীরুল মারআ'[২] (নারী স্বাধীনতা) ও তার ২য় কিতাব 'আলমার আতুল জাদীদা' (আধুনিক মহিলা)"[৩] প্রথম গ্রন্থে গ্রন্থকার দাবি করেছেন যে, "পর্দাহীনতার আমন্ত্রণের মধ্যে দীনের কোন বিরোধিতা পাওয়া যায় না। তার কথা হলো ইসলামী শরীয়ত কতগুলো আদেশ ও নিষেধের সংমিশ্রণ ও সংবিধানের নাম। যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদেশ বর্ণনা করা এর কাজ হতো তবে বিশ্ব আইন হবার যোগ্যতা এর থাকত না যা প্রতিটি জাতির জন্য উপযোগী হয়। শরীয়তের ঐ সমস্ত আদেশ ও নিষেধ যা প্রচলিত রীতিনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে রচিত সেগুলোতে সময়ে সময়ে অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে।

শরীয়তের দাবি কেবল এই যে, এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যেন এভাবে না হয় যাতে এর সাধারণ ভিত্তিসমূহ প্রভাবান্বিত ও ঘায়েল হয়।"[৪]

এ গ্রন্থে গ্রন্থকার চারটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন : ১. পর্দা, ২. মহিলাদের সাধারণ জীবন যাপনে অংশ গ্রহণ করা, ৩. একের অধিক বিয়ে করা, ৪. তালাক। এই চার বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য নাগরিকদের নীতি গ্রহণ করেছেন এবং দাবী করেছেন যে, এটাই ইসলামের মতাদর্শ।

---

১. The Earth of Cromer, Modern Egypt (1908), Vol. H, p. Ibid., p.232.

২. প্রকাশনা ১৮৯৯ খ্রী.।

৩. প্রকাশনার সন ১৯০০ খ্রী.। এই কিতাবের উত্তর প্রসিদ্ধ মিসরীয় ফাজিল ফরীদ ওয়াজদী দিয়েছেন যা "আলমার আতুল মুসলিমা" নামে প্রকাশিত হয়েছে যার উর্দূ অনুবাদ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর প্রথম জীবনে করেছেন।

৪. তাহরীরুল মারআ, পৃ: ১৬৫।

গ্রন্থকারের ওপর পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও এর মূল্যবোধের গভীর প্রভাব তার দ্বিতীয় কিতাব 'আধুনিক মহিলা'-এ বেশি স্পষ্ট। এই কিতাবে গ্রন্থকার আলোচনা ও প্রমাণের জন্য পাশ্চাত্যের নতুন নীতি গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে ইসলামের সমস্ত স্বীকৃত ও সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত বিষয় এবং আকীদা-বিশ্বাসকে রদ করে দেয়াই হলো তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অবশ্য অভিজ্ঞতা অথবা বাস্তব অবস্থা তার এই প্রচেষ্টার সাহায্য করে না। কারণ ঐ সফল প্রমাণিত বস্তু ও আকীদা দীনের রাস্তা দিয়ে পৌঁছুক বা অন্য কোন রাস্তা দিয়ে পৌঁছে থাকুক, তা এমন নীতি যাকে পাশ্চাত্যবাসীরা জ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি (সাইনটিফিক) বলে থাকে। ঐ কিতাবের শেষে গ্রন্থকার পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতিকে গ্রহণ করার জন্য খোলাভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মুসলমান ও মিসরবাসী তাদের নিজস্ব সভ্যতা, সামাজিক অবস্থা ও অতীত গৌরবের সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন :

এ আমাদের ঐ রোগ যার চিকিৎসা সর্বপ্রথম প্রয়োজন, এর কেবল একটি ঔষধ। তা এই যে, আমরা নিজের নতুন প্রজন্মকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সামাজিকতার সাথে পরিচিত করাই এবং তারা তার মূল ও শাখা-প্রশাখার জ্ঞান অর্জন করুক। যখন সময় আসবে (যা বেশ দূরে নয়) তখন সূর্যের ন্যায় আলোকিত হয়ে যাবে। ঐ সময় আমরা পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও সামাজিকতার সম্মান ও মূল্য জানতে পারব। আমাদের বিশ্বাস হবে যে, কোন সংশোধন ঐ সময় পর্যন্ত সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত তা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তির ওপর স্থাপতি না হবে এবং মানুষের অবস্থাসমূহ পার্থিব হোক অথবা চারিত্রিক, তা আধুনিক জ্ঞানের অধীন হতে হবে।

কারণ আমরা দেখেছি বর্তমান সভ্য জাতিসমূহ জাতীয়তা, ভাষা, দেশ ও ধর্মে যতই ভিন্ন হোক, রাষ্ট্র কাঠামোর শৃঙ্খলা, বিচার, পারিবারিক নীতি, লালন-পালনের রীতি, ভাষা, লিপি পদ্ধতি ও স্থাপত্য, এমন কি সাধারণ অভ্যাস, পোশাক, সালাম ও খানাপিনার মধ্যেও একে অন্যের অনুরূপ। এই ভিত্তিতে আমরা পাশ্চাত্য নাগরিককে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ হিসেবে পেশ করেছি। তাদের অনুসরণ-অনুকরণের ওপর জোর দিচ্ছি এবং এই উদ্দেশে আমি আমার দেশবাসীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, তারা পাশ্চাত্য মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কে যেন অবহিত হয়![১]

১. আলমার আতুল-জাদীদা, ১৮৫-১৮৬ পৃ.।

এই দু'টি গ্রন্থ মিসরের আধুনিকতাপ্রিয় দলের মধ্যে খুবই গ্রহণীয় হয়েছে। ঐ পুস্তকদ্বয়ের প্রচারের ক্ষেত্রে নারী স্বাধীনতার আন্দোলনকারীরা বিশেষ উদ্যোগ ও উদ্যম দেখিয়েছে। ফলে মহিলাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতার ঢেউ জেগেছে। পুরুষ ও নারী একত্রে ওঠা-বসা, চলাফেরা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে এবং শিক্ষা লাভের জন্য মিসরীয় ছাত্রীরা ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছে। ইসকান্দারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হুসাইন তার গবেষণামূলক গ্রন্থ "আলইত্তিজাহাতুল ওতানিয়্যা ফিল আদবিল মু'আসির", ২য় খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন :

এই আমন্ত্রণ ও আন্দোলনের ফলে মহিলাদের মধ্যে পর্দাহীনতা, নির্লজ্জতা, স্বাধীনতা ও অবাধ্যতার যে প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে তাতে নিষ্ঠাবান মুসলমানরা ঘাবড়ে যান। মহিলাদের অবস্থার যে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে পুরাতন আচরণ ও রেওয়াজের এবং পিতা ও স্বামীর ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে ধারণা ও উদ্যমতা সৃষ্টি হচ্ছে তা তাদের কাছে পছন্দনীয় হয়নি। তারা অবাক চিত্তে লক্ষ্য করেন যে, পোশাকের পরিবর্তন হচ্ছে দ্রুত গতিতে, ঢিলেঢালা শরীর আবরণকারী মিসরীয় পোশাকের পরিবর্তে আঁটসাঁট বেঁটে পাশ্চাত্য পোশাক প্রচলিত হচ্ছে যা এত দ্রুত গতিতে মহিলাদের মধ্যে গৃহীত ও স্বীকৃত হচ্ছে যা ইতিপূর্বে অনুমানও করা যায়নি।[১]

মিসরের যে সমস্ত মহিলা এই আন্দোলনে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন তিনি তাদের বিষয় উল্লেখ করে লিখেছেন :

মহিলাদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিশেষভাবে আলীপাশা শারাভীর স্ত্রী হুদা শারাভী। তিনি অত্যন্ত সাহস ও নির্ভীকতার সাথে কাজ করেছেন। ইতিপূর্বে কোন মুসলমান মহিলা তা করতে সাহস করেনি। তিনি পাশ্চাত্য মহিলাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্যারিস ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি সাংবাদিকদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করতেন এবং নিজের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতেন।[২]

---

১. আল ইত্তি জাহাতুল ওতানিয়া ফিল আদবিল মু'আসির, ২য় খণ্ড, ২৩৫ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত।

মিসরে প্রাচ্যবিদদের কথার প্রতিধ্বনি

ইউরোপ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত যে আরব পণ্ডিতগণ মিসরে এসেছিলেন তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা পূর্ণভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল। তারা ইউরোপীয়দের অনুকরণে চিন্তা করতেন এবং এ কথা বললে মনে হতো কতগুলো তোতা পাখি শেখানো বুলি আওড়াচ্ছেন। তারা নিজেদের প্রাচ্যবিদ শিক্ষকদের প্রতিধ্বনি, পাশ্চাত্য কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অটল বিশ্বাসী ও পূর্ণ উদ্যমতা সহকারে পাশ্চাত্য মতবাদ নিজ দেশে প্রচার করার চেষ্টা করতেন। দুনিয়ার কোন প্রান্তে যদি কোন প্রাচ্যবিদ কোন চিন্তা অথবা কল্পনা পেশ করেন মিসরে কেবল তার সাহায্যকারী শুধু নয়, বরং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কলমের জোর ও ভাষাশৈলী দ্বারা তার ব্যাখ্যাকারীরূপে কোন-না কোন মিসরীয় সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ প্রস্তুত হয়ে যেতেন।[১]

বিধর্মী চিন্তাধারার স্রোত মিসরে প্রবলভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় : কুরআন শরীফ মানবীয় চিন্তাপ্রসূত, দীন ও রাজনীতি পৃথক বস্তু, রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানে ইসলামের কোন সংযোগ নেই। ইসলাম কেবল একটি আকীদা ও চারিত্রিক ইবাদত সংক্রান্ত কিছু রীতিনীতি।[২]

ধর্মনিরপেক্ষতার দাওয়াত, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক উৎস জাহেলী যুগের কবিতাসমূহ, হাদীস বা সুন্নতের বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা অগ্রহণযোগ্য বা সন্দেহজনক। নারী স্বাধীনতা জরুরী এবং তারা সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান। পর্দার বিরোধিতার পক্ষে জোর আন্দোলন করা হয়। ইসলামী ফিকাহশাস্ত্র রোমান আইন হতে গৃহীত এবং সেই ছাঁচে প্রভাবান্বিত ও রচিত। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতাকে জীবিত করার প্রচেষ্টা, ফির'আউনের সময়কে পবিত্র ও গৌরবজনক, তার সভ্যতা, সাহিত্য ও চরিতকথার ওপর গৌরব করা বাঞ্ছনীয় মনে করা।

---

১. এই বিষয় মিসরে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক আলিম শেখ আলী আব্দুর রাযযাকের কলমে একটি কিতাব প্রচারিত হয়েছে। তিনি তখন সেখানে কাযী বা জজও ছিলেন। কিতাবের নাম আল ইসলাম ও উসূলুল হিকম। এই বই মিসরের দীনী শ্রেণীর মধ্যে ভীষণ অশান্তি ও অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করে। ফলে গ্রন্থকারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ, পরিচয় ও সুবিধাদি হতে বঞ্চিত হতে হয়। অধ্যয়ন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওই কিতাব প্রাচ্যবিদদের মতামত শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে এবং একজন দীনী আলিম তাদের প্রচারের প্রতিনিধিত্ব করতে প্রস্তুত হয়েছেন। ঐ গ্রন্থকারের দাবি হলো যে, খিলাফত কেবল সমসাময়িক আরবী শব্দ। একটি রীতি ছিল যা মুসলমানগণ গ্রহণ করেছিলেন। শরীয়ত এর বাধ্যবাধকতা করে না। তিনি বলেন যে, সরকারী ও রাষ্ট্রীয় পদ খাঁটি পার্থিব পদ ও পার্থিব শৃঙ্খলা, যার কোন দীনী মর্যাদা নেই এবং শরীয়তের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

২. আল-ইসলাম ও উসূলুল হিকাম, পৃ: ৩২।

স্থানীয় কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করা, ল্যাটিন বর্ণমালা গ্রহণ করার আমন্ত্রণ, পাশ্চাত্য আইনের ভিত্তি ও নীতির আদলে আইন প্রণয়ন, আরবী জাতীয়তাবাদ ও বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের প্রচার-প্রসার, মার্কসবাদী কম্যুনিজমের আমন্ত্রণ, তদুপরি পাশ্চাত্য চিন্তাধারাই শুধু নয়, বরং পাশ্চাত্য কার্যপদ্ধতি ও রীতিনীতি অবলম্বনের কালো ছায়া আরববাসীদের মস্তিষ্ক ও রচনাতে বাহু প্রসারিত করে দেখাচ্ছে। এটা তাদেরকে এভাবে আচ্ছাদন করেছে যেমন একটি বড় বৃক্ষ নতুন চারা গাছকে নিজের ছায়ায় আশ্রয় দেয়। পাশ্চাত্য চিন্তার প্রতিচ্ছবি তাদের ওপর এভাবে পড়তে দেখা যায় যেভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আয়নায় সূর্যের প্রতিচ্ছবি পড়ে।

ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টিতে পাশ্চাত্য চিন্তা ও কল্পনা-বিজেতা বেশে প্রবেশ করেছে এবং প্রভাব বিস্তার করেছে। তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন জনৈক প্রাচ্যবিদ যিনি কাছে থেকে ইসলামী প্রাচ্যকে দেখেছেন এবং তাদের চিন্তা, কল্পনার প্রবণতা সম্পর্কে গভীরভাবে জ্ঞাত হয়েছেন।

প্রফেসর A. R. Gibb নিজ গ্রন্থ (Whither Islam)– এ লিখেছেন : যদি আমাদের পাশ্চাত্য প্রভাব অনুপ্রবেশের সঠিক পরিমাণ জানা প্রয়োজন হয় এবং আমরা এটা দেখতে চাই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ইসলামের (প্রাচ্য দেশসমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানদের) রন্ধ্রে রন্ধ্রে কিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে তবে এর জন্য আমাদেরকে ঐ চিন্তা, কল্পনা ও নতুন প্রস্তাবাবলীর ওপর গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যা কেবল পাশ্চাত্য নিয়ম ও পদ্ধতির গভীর প্রভাবের ফলাফল এবং কেবল ঐ সমস্ত প্রভাব দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচ্যের চিন্তা ও কল্পনা তাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করে তাকে নতুন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনা কর্মে নিজেদের অবস্থার সাথে সমন্বিত করে ব্যবহার করতে আগ্রহী এবং অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতেও যত্নবান।[১]

সংকলন ও অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ এবং মৌলিক রচনার ঘাটতি

যদি এ সকল সাহিত্যিক ও লেখক পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো অনুবাদ করতেন তবে নিজের দেশ ও ধর্মের এবং ভাষা ও সাহিত্যের উপকার করতেন। এখনও বিজ্ঞান বিষয়ক কিতাব হতে আরব জগত বঞ্চিত রয়েছে। জাপানের সাহিত্যিক ও লেখকরা বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা করার কারণে নিজেদের দেশকে এমন শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করেছে যে, জাপান শিল্পে ইউরোপের বড় বড় দেশের

---

১. A. R. GIBB. WHITHER ISLAM, পৃ: ৩২৮।

সমতুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আরবদের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে কেবল সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, উপন্যাস, কাহিনী, নাস্তিকতা, বিদ্রোহ ও চিন্তার বিশৃঙ্খলা সম্পর্কিত রচনাবলী বিষয়ে, এ সমস্ত রচনা ইসলামী দেশসমূহে চিন্তার অস্বচ্ছতা ও চারিত্রিক অধঃপতন সৃষ্টি করেছে। ফলে জাতীয় ব্যক্তিত্ব ও কর্মক্ষমতাকে আরো দুর্বল করে দিয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয় চিন্তা, মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণা নিয়ে একটি নতুন ও সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

এই পাশ্চাত্য ভাবধারা ও রীতিনীতি গ্রহণীয় করার চেষ্টায় মিসরের কোন কোন শীর্ষস্থানীয় লেখক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ কাজে এমন কতক ব্যক্তি উদ্যোগী হন, সমস্ত আরব যাদের ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও বর্ণনা শক্তির স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে কেবল মিসর নয়, পুরো আরব বিশ্বে বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে বা কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী এমন কোন ব্যক্তি সৃষ্টি হতে পারেনি যাকে পাশ্চাত্যও স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক জ্ঞানের অঙ্গনে যার কোন উচ্চ স্থান রয়েছে।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর Bernard Lewis এক প্রবন্ধে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের এই দুর্বলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঠিকই লিখেছেন :

মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞানে কোন মৌলিক কাজ হয়নি এবং প্রণিধানযোগ্য তেমন কোন উন্নতিও হয়নি। যেরূপ জাপান, চীন অথবা ভারতে হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাশ্চাত্যের উপাদান ও উৎস হতে সাহায্য নিতে হয়, যা ইতিমধ্যেই উন্নতির অনেক সোপান অতিক্রম করেছে। ফলে বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাসমূহ ও কারিগরি যোগ্যতায় তারা অনেক নিম্নে। ফলে সামরিক শক্তির দিক দিয়েও মধ্যপ্রাচ্য পাশ্চাত্যের উন্নতিশীল দেশের তুলনায় এত পেছনে যে, মনে হয় এই ব্যবধান একশ' বছর অথবা পঞ্চাশ বছরের, যখন প্রাচ্যকে পাশ্চাত্য বানাবার চেষ্টা শুরু করা হয়েছিল।[১]

পাশ্চাত্য জীবনের একটি ছবি

এই সময় মিসরের কোন কোন সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার জন্য ঐ সভ্যতা কৃষ্টিকে উচ্চ ও আদর্শ (আইডিয়েল)-রূপে চিত্রিত করে প্রকাশ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মিসরের ওপর বিভিন্ন কারণে পাশ্চাত্য

---

১. Bernard Lewis-এর প্রবন্ধ এই শিরোনামে (The Middle East Versus the West) লিখিত পুস্তিকা (Encounter oct-1963)।

সভ্যতার রং দিন দিন গভীর হতে যাচ্ছিল। ক্রমশ তারা পাশ্চাত্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। শিক্ষিত ও বিত্তবান শ্রেণীর লোক পাশ্চাত্যের জীবন যাপন পদ্ধতি ও সভ্যতার ঠিক প্রতীক বা প্রতিচ্ছবি হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। মিসর এ ব্যাপারে এত দূর অতিক্রম করেছিল যে, ১৯৩৮ খ্রী. ড. তাহা হুসাইন মিসরকে পাশ্চাত্য জীবন ও সভ্যতার নমুনা বলে গণ্য করেছিলেন। তিনি مستقبل الثقافة فى مصر। গ্রন্থে লিখেছেন :

আমাদের পার্থিব জীবন, সমাজের উচ্চ শ্রেণী ও পরিবার খাঁটি পাশ্চাত্য রূপ ধারণ করেছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, দল ও ব্যক্তি সামর্থ্য ও সম্পদ পরিমাণে পাশ্চাত্য জীবন দ্বারা প্রভাবান্বিত। যাদের জীবনের মান উচ্চ এবং যাদের সম্পদ বেশি তারা পাশ্চাত্য জীবন দ্বারা বেশি প্রভাবান্বিত ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক কাছে। যাদের সম্পদ ও উপায়ে কিছু ঘাটতি আছে তারা বাধ্য হয়ে তা থেকে কিছু দূরে রয়েছে। এর অর্থ হলো একজন মিসরীয় ব্যক্তির জাগতিক ও পার্থিব জীবনের জন্য আদর্শ হলো পাশ্চাত্য জীবন।[১]

আমাদের অভ্যন্তরীণ জীবন বিভিন্ন প্রকাশের মাধ্যমে খাঁটি পশ্চিমা। আমাদের রাষ্ট্রীয় রীতিনীতিও খাঁটি পশ্চিমা। আমরা এটাকে ইউরোপ হতে কোন উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ ছাড়াই যেভাবে আছে সেভাবে স্থানান্তর করেছি। আমরা যদি নিজকে এই ব্যাপারে কোন তিরস্কার করতে পারি তবে এতটুকু বলা যায় যে, আমরা ইউরোপের নাগরিক রীতিনীতিসমূহ ও রাজনৈতিক জীবনের আকৃতিসমূহ স্থানান্তর করতে অলসতা ও বিলম্ব করেছি।[২]

শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করলে বিচার্য এই, প্রায় এক শতাব্দী হতে এর নীতি কি এবং ঐ শিক্ষানীতি কোন্ ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়েছে? নির্দ্বিধায় বলা যায় তা স্থাপিত হয়েছে খাঁটি পাশ্চাত্য পদ্ধতির ওপর। এতে কোন সন্দেহ ও মতবিরোধের স্থান নেই। আমরা প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও উচ্চ শিক্ষায় আমাদের সন্তান-সন্ততিকে খাঁটি পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালাই করছি তাতে অন্য কোন জিনিসের মিশ্রণ নেই।[৩]

এসব কথার পরে তিনি উপসংহারে বলেন : এ সব কথা এই ইঙ্গিত বহন করে যে, আমরা বর্তমান যুগে ইউরোপের সাথে এমন নৈকট্য ও সম্বন্ধ চাচ্ছি যা দিন দিন

---

১. مستقبل الثقافة فى مصر, ৩১ পৃ.।

২. ঐ, ৩২ পৃ.।

৩. ঐ, ৩৬ পৃ.।

বেড়ে এই পর্যায়ে পৌঁছাবে যে, আমরা শব্দ, অর্থ প্রকৃতি ও আকৃতি প্রতিটি বিষয়ে তার একটা অংশে পরিণত হব।[১]

মিসরকে ইউরোপের একটি অংশ মনে করার আমন্ত্রণ

ড. তাহা হুসাইন আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রধান। যুবক ও তরুণ লেখকদের প্রিয় এবং আদর্শ সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ। মধ্যপ্রাচ্যের নতুন প্রজন্মের ওপর সম্ভবত তার চেয়ে বেশি কেউ প্রভাব বিস্তার করেনি। তাকে রচনাশৈলীর একটি পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। সেই পদ্ধতিকে কোন কোন আলোচক, সমালোচক ও সাহিত্যসেবী যদিও বেশি পছন্দ করেননি, কিন্তু তার সাবলীল, বিশুদ্ধ ও ক্লাসিক্যাল আরবীর সৌন্দর্য সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

তিনি ১৮৮৯ খ্রী. মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি দৃষ্টিশক্তি হতে বঞ্চিত হন। মকতবে ভর্তি হয়ে কুরআন শরীফ হেফজ করেছেন। কিছু দিন আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। কিন্তু তার রচিত গ্রন্থসমূহের অনেক জায়গায় দেখা যায়, তিনি এই উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্পন্ন করে প্যারিসে চলে যান। সেখানে গবেষণার কাজ শেষ করে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। দেশে ফিরে আসার পর মিসরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য কলেজের তিনি প্রথমে প্রফেসর পরে প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। দায়িত্ব হতে পরিত্রাণ পেয়ে পুস্তক রচনায় লিপ্ত হন। ১৯৪৯ খ্রী. তিনি মিসরের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং পাশা উপাধিতে ভূষিত হন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো হচ্ছে :

فى الشعر الجاهلى ، فى الادب الجاهلى - ذكرى ابى العلم الايام مستقبل الثقافة فى مصر -

তিনি এমন বহু মতামত ও গবেষণা প্রকাশ করেছেন যা সাহিত্য, ইতিহাস ও দীনের স্বীকৃত প্রমাণিত ও প্রসিদ্ধ ধারণা ও আকীদার বিপরীত, যার ফলে মিসরে সাহিত্যিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে ভীষণ প্রতিবাদ ও কোলাহল সৃষ্টি হয়। শেষ সময়ে তিনি উল্লিখিত বিষয়সমূহের ক্ষতিপূরণস্বরূপ অথবা পরিপক্ব ও বৃদ্ধ হওয়ার কারণে অথবা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের জীবন চরিত ও সাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে মর্মস্পর্শী ও মনোযোগ আকর্ষণকারী কিছু পুস্তক লেখেন যার মধ্যে على هامش ও الوعد الحق

---

১. مستقبل الثقافة فى مصر, পৃ. ৩৪।

السيرة। এই দু'টি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা হুসাইন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও দর্শনের প্রেমিক এবং ফরাসী সভ্যতা ও সাহিত্যের ধারক-বাহক ছিলেন। ফ্রান্সের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং ফরাসী সাহিত্যিকদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি এক ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তার সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষাও ফ্রান্সের পরিবেশে সমাপ্ত হয়েছে। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে তার বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং এ তিনি ভাষার প্রসিদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থের ভাবনা ও চিন্তাসমূহ আরবী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচ্যবিদদের কল্পনা ও গবেষণার পূর্ণ ছায়া দৃষ্ট হয়। তার ঐ সকল বিশেষ চিন্তা-ভাবনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। মানসিক উচ্ছ্বাস, ব্যাকুলতা ও নতুনত্বপ্রিয়তা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

এই আশা সম্পূর্ণ ন্যায্য ও স্বাভাবিক ছিল যে, ড. তাহা হুসাইনের মত বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি যার জ্ঞান ও সাহিত্য জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে, যিনি বাল্যকালে কুরআন শরীফ হেফজ করেছেন এবং তা অধ্যয়ন করতে থাকেন, যিনি কিছু দিন আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পান, যিনি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের স্বাধীন ও প্রসারিত দৃষ্টি দ্বারা বিচার-বিবেচনা করেন, যিনি ইউরোপের বস্তুবাদী সভ্যতা, নাস্তিক দর্শন, জাতীয়তাবাদের ক্ষতিকর দিক ও তার অকৃতকার্যতা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সমালোচনা শুনেছেন। এর সাথে ইসলামী ইতিহাস, নবী চরিত উৎসাহ ও মনোযোগের সাথে পাঠ করেছেন।

এমন ব্যক্তি হতে এই আশা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায্য ছিল যে, তিনি মিসরকে চিন্তা ও সভ্যতার ব্যাপারে নিজ পায়ের ওপর দাঁড়াতে, স্বাধীনভাবে নিজ বৈশিষ্ট্য গঠন করতে এবং ইসলামের পতাকাধারী হতে আহ্বান করবেন। কারণ তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শত শত বছর পূর্বে ভাগ্যবান করেছেন। যদি মিসর এভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারত, এমন কি মিসর যদি প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ মহাদেশের একটি অংশ হতো এবং পাশ্চাত্য পরিবারের এক সদস্য হতো, তবুও একজন উচ্চ সাহসী, উচ্চ দৃষ্টিসম্পন্ন মুসলিম মিসরীয় চিন্তাবিদের এই দায়িত্ব ছিল যে, তিনি মিসরকে ইসলামের বাহকরূপে প্রস্তুত করবেন যাতে সে জগতের মানচিত্রে নিজ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়।

কেননা এ আসমানী পয়গাম যা সমস্ত জাতি ও সমস্ত জনগণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে তা ঐ সমস্ত সভ্যতা হতে বহু উচ্চে, বহু উর্ধ্বে, বহু প্রশস্ত ও স্থায়ী এবং তা কোন বিশেষ সময়ের মধ্যে সীমিত নয়। তা ভৌগোলিক সীমারেখা ও ঐতিহাসিক

গতিসমূহ হতে স্বাধীন। যদি তারা এরূপ কাজ করত এবং এর আমন্ত্রণকে নিয়ে দাঁড়িয়ে যেত তা হলে তারা দীনের পুনর্জাগরণের দিশারী ও বিপ্লবের প্রথম পরিচালক ও নেতা হতে পারতেন, যা মিসর হতে শুরু হতো এবং আরব দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ত। তা তাদের মহৎ যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল।

কিন্তু ইসলামী বিশ্বের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ, গভীর প্রভাব ও তার শক্তিশালী আক্রমণের কারণে ইসলামী সভ্যতা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। যেহেতু তিনি এই সমাজেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন তিনি দাওয়াত দিলেন যে, মিসর নিজকে নিজে পাশ্চাত্যের এক অংশ মনে করুক। শুধু তাই নয়, তিনি তার সমস্ত বুদ্ধিমত্তা, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা এটা প্রমাণ করার জন্য ব্যয় করলেন যে, মিশরীয় চিন্তা-গবেষণা ও মস্তিষ্ক হয় সম্পূর্ণ পশ্চিমা চিন্তা-কল্পনা ও মস্তিষ্ক অথবা তার অতি ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী। মিসরবাসীর সাথে গ্রীক চিন্তা ও কল্পনার যত গভীর সম্বন্ধ রয়েছে প্রাচ্য চিন্তা-কল্পনা হতে তারা ততই দূরে রয়েছে।

তিনি আরো বলেছেন, মিশর প্রাচীনকাল ও ফেরআউনের সময় হতে আজ অবধি কোন সময় কোন আক্রমণকারী থাবা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি এবং ইরানীদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়নি (যাদের মিসরে কিছুদিন রাজত্ব করবার সুযোগ ঘটেছিল)। এভাবে গ্রীকদের, আরবদের ও মুসলমানদের দ্বারা মিসর কখনও প্রভাবিত হয়নি, যদিও কয়েক শতাব্দী মিসর মুসলিম শাসনাধীন ছিল। প্রাচীনকাল হতে আজ অবধি কোন এলাকা দ্বারা মিসর যদি প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে, তার মতে, তা ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী এলাকাও এর চিন্তা-ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যদি মিসর বিভিন্ন প্রকার মতের বিনিময় ও লেনদেন করে থাকে তাহলে তা কেবল ভূমধ্যসাগরীয় জাতিসমূহের সঙ্গে করেছে।[১]

তিনি বলেছেন : এর চেয়ে অজ্ঞ, বুদ্ধিহীন ও হালকা উক্তি আর কিছুই হবে না যে, মিসরকে প্রাচ্যের একটি অংশ মনে করা এবং মিসরের চিন্তাধারাকে ভারত অথবা চীনের মত প্রাচ্যের চিন্তাধারার মত জ্ঞান করা।[২]

এই ভিত্তির ওপর ড. তাহা হুসাইন মিসরীয় নাগরিকদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করতে ও নাগরিকদের সাথে (তার মতে যারা প্রকৃতপক্ষে একই জ্ঞান ও

---

১. مستقبل الثقافة فى مصر, পৃ. ২২।

২. ঐ, ৪১ পৃ.।

চিন্তা পরিবারের সদস্য) রীতিনীতি, মূল্যবোধ, সাধ-আহ্লাদে মিলন ঘটাতে দাওয়াত দেন। তিনি বলেছেন :

আমাদের উচিত ইউরোপের নাগরিকদের নিয়ম মাফিক চলা এবং তাদের চরিত্র, প্রকৃতি ও অভ্যাস গ্রহণ করা, তবেই আমরা তাদের সমান হতে পারব এবং সভ্যতার ভাল-মন্দ, তিক্ত-মধুর, পছন্দ-অপছন্দ প্রতিটি জিনিসেই তাদের সহগামী ও সহচর হতে পারব।[১]

আমরা একজন ইউরোপীয় নাগরিককে বিশ্বাস করাতে চাই যে, আমরা এশিয়াকে ঐ দৃষ্টিতে দেখি যে দৃষ্টিতে একজন ইউরোপীয় দেখে এবং তার মর্যাদা ও মূল্য আমাদের কাছে ঐ পরিমাণ যে পরিমাণ ইউরোপীয়দের কাছে, তার সম্পর্কে আমরা ঐ মত পোষণ করি যা একজন পাশ্চাত্য করে।[২]

হীন মন-মানসিকতা

অনুকরণ, অনুসরণ করার ও পাশ্চাত্যে বিলীন অথবা মিশ্রিত হওয়ার নির্লজ্জ দাওয়াত এবং ইসলামের উচ্চ আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দায়িত্ব, অবশ্য করণীয় কর্ম ও উদ্দেশ্যসমূহকে ভূগোল, ইতিহাস অথবা জাতীয়তাবাদের স্বভাব ও চিন্তার সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে অথবা প্রাচীন ইতিহাসের আলোকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করা একটি অতি নীচ স্তরের কাজ। এ ধরণের দাওয়াত হতে আমরা তাহা হুসাইনের মত জ্ঞানী চিন্তাবিদ ও সমাজসচেতন ব্যক্তিকে বহু উচ্চে ও ঊর্ধ্বে মনে করতাম। কারণ প্রাচ্যের অনৈসলামী দেশসমূহের কোন কোন নেতা ও চিন্তাবিদকে এই স্তর হতে অনেক উচ্চে দেখা যায়। তারা মানবতা, বিশ্বজনীন চিন্তাধারার চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসমূহের প্রতি (যারা ভৌগোলিক সীমানা, প্রাচীন ও নতুনদের প্রভেদ ও সভ্যতার সীমিত বেষ্টনী হতে মুক্ত) সুউচ্চ কণ্ঠে দাওয়াত দেন। তারা ঐ সমস্ত জড় ও সীমাবদ্ধ সম্বন্ধকে অস্বীকার করেন যা মানব পরিবারকে দেশ ও জাতিসমূহকে সভ্যতা, আঞ্চলিকতা অথবা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিচারে ভাগ করে।

আরবের একজন বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদ হতে এমন প্রসারিত দৃষ্টির সঠিক ব্যবহার ইসলামের বিশ্বজনীন পয়গামের আশা করা হয়েছিল। তিনি এর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি এই দাওয়াত ও মতবাদের পতাকাধারী হয়ে জগতের সম্মুখে উপস্থিত হবেন এবং মানবতাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার নেতৃত্ব

---

১. مستقبل الثقافة فى مصر, পৃ. ৪১।

২ ঐ, ৪৪ পৃ.।

দেবেন। কেননা তিনি এমন এক ছায়াযুক্ত বৃক্ষের নিচে প্রতিপালিত হয়েছেন যা প্রাচ্যেরও নয়, পাশ্চাত্যেরও নয় "زيتونة لا شرقية ولا غربية". (২৪ : ৩৫)।

ইখওয়াননুল মুসলিমীন আন্দোলন

প্রয়োজন ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে সম্মুখ মুকাবিলার, প্রয়োজন ছিল অদম্য সাহস ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসসহ তার সমালোচনার, আরও প্রয়োজন ছিল একজন আহ্বানকারীর ও আক্রমণকারী হিসেবে এর সম্মুখীন হওয়ার জন্য এক সুদৃঢ় সম্মিলিত চেষ্টার। তদুপরি পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বভাব ও তার গঠন প্রণালী সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা, ইসলামী দাওয়াত, এর শিক্ষা ও এর জীবন পথের প্রতি দৃঢ় আস্থা ও জ্বালাময়ী আবেগের। আরও প্রয়োজন ছিল এর জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বে (যা সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী গ্রহণ করেছিলেন) অথবা প্রতিরোধমূলক মনোবৃত্তির (শেখ মুহাম্মদ আবদুহু যেমন ছিলেন)। এই পরিস্থিতিতে অন্য এক শক্তিরও প্রয়োজন ছিল।

মিসরে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'-এর আন্দোলন[১] যদি সঠিক ও স্বাভাবিক গতিতে অগ্রগামী হতো এবং এর পতাকার নিচে ইসলামী জগতের চিন্তাবিদগণ, প্রধান লেখকবৃন্দ ও দক্ষ-অভিজ্ঞ আলিমগণ সমবেত হয়ে যেতেন[২] তাহলে এই আন্দোলন দ্বারা বহু বড় কিছুর আশা ছিল। আশা ছিল তারা মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের পুনর্জাগরণের কাজকে পরিপূর্ণ করতে পারবেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলন ও সংগঠনের এই বৃহৎ কার্যের কত দূর যোগ্যতা ছিল এবং তারা নিজেদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী কত দূর এর চাহিদা ও দাবি পূর্ণ করেছেন? এ সম্পর্কে অনেক লোকের সন্দেহ রয়েছে। উচিত হবে এই স্থানে একজন পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদের পর্যালোচনা পেশ করে দেয়া, যিনি ইখওয়ানের প্রতি সহানুভূতিশীলও নন বা তাদের মুখপাত্রও নন। প্রফেসর W. C. Smith ইখওয়ানের আন্দোলনের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন :

ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সেকেলে ও রক্ষণশীল মনে করা আমার মতে ভুল হবে। কেননা তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার ও মানবপ্রীতির ওপর

---

১. এই আন্দোলনের ইতিহাস, এর গুরুত্ব ও প্রতিষ্ঠাতা শেখ হাসানুল বান্না মরহুমের জীবনচরিত জানবার জন্য তাহরীকে ইখওয়ানুল মুসলিমীন দেখুন।

২. যাঁরা হলেন শহীদ আব্দুল কাদির আওদা, শহীদ সৈয়দ কুতুব, মুহাম্মদ আল গজ্জালী, ড. সঈদ রমযান, ড. মুস্তফা সিবায়ী, ড. ইউসুফ আল কারযাবী প্রমুখ।

ভিত্তি করে এক নতুন সমাজ স্থাপন করার মত প্রশংসনীয় উদ্যোগ রয়েছে যা প্রাচীন ঐতিহ্যের উৎকৃষ্ট মূল্যবোধ হতে গৃহীত হয়েছে। এটা আংশিকভাবে এমন এক বিচার শক্তির বাহক যা অবক্ষয় ও হীনতাবোধকে রোধ করতে পারে যেখানে বর্তমান আরব সমাজ পৌঁছেছে। এটা এক পূর্ণ বিশৃঙ্খল সমাজ যাতে সুযোগসন্ধানী, মনোবৃত্তি, ব্যক্তিগত অসাধুতা ও অবিশ্বাস অতি প্রকট। তাদের এই সংগঠন ঐ সমস্ত মূলনীতির দিকে ফিরে নিয়ে যেতে চায় যা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত সামঞ্জস্যপূর্ণ চারিত্রিক মূল্যবোধ ও মহৎ মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তারা এরূপ কার্যকর প্রোগ্রাম পেশ করতে চায় যা দ্বারা অভিপ্রেত লক্ষ্যগুলো সুশৃঙ্খল নীতিবান ও আদর্শবাদী (Idealists) কতক মানুষের সাহায্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এর সাথে সাথে তা এই শক্তিরও বাহক, যা দ্বারা অবোধগম্য, অকর্মণ্য, অযোগ্য, স্থবির ও শুধু আত্মিক মান (আইডিয়াল) অর্জনে তৎপর কর্মবিধি ও আকীদাকে শেষ করতে পারে। তারা ইসলামকে অনুভূতিবিহীন ও দুর্বল বিশ্বাসীদের অধীনতা হতে, ঐতিহ্যবাহী উপাসকদের ঘৃণ্য কার্যক্রম হতে রক্ষা করতে পারে। যদিও এই ভ্রান্ত পথচারীদের ধারণা তারা সনাতন কর্ম পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট। তারা নতুন শক্তি সৃষ্টি করার যোগ্যতা রাখে, সমস্যার নতুন সমাধান দিতে সক্ষম।

এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া (অথবা ঐ সমস্ত জিনিস ছাড়া যা ঐ পরিবর্তনসমূহের স্থলবর্তী হতে পারে) আমাদের মতে আরব সমাজ কোন অবস্থাতেই উন্নতি করতে পারে না। কোন সর্বসম্মত চারিত্রিক শক্তি কোন উৎসাহী শক্তি অথবা কোন অভ্যন্তরীণ প্রভাবশালী আন্দোলন ছাড়া (যা সঠিক স্থানে পৌছতে পারে) উত্তম হতে উত্তম সামাজিক অথবা জাতীয় প্রোগ্রামও কেবল কাগজের সৌন্দর্যরূপে বিরাজ করবে মাত্র। তদুপরি এই অবস্থায় আরব সমাজের আত্মিক পশ্চাৎগতি পূর্বের ন্যায় থেকে যাবে। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কর্মসূচিতে সমাজের প্রায় সকল বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান নিহিত আছে।

যতক্ষণ অন্য কোন দল এই সমস্ত বিষয়ের পূর্ণ সমাধান দেবার জন্য তুলনামূলকভাবে অধিক আগ্রহ ও ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে না আসে ততক্ষণ এটা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলন অত্যাচার ও উৎপীড়নের শিকার হওয়া সত্ত্বেও জীবিত থাকবে। একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া ইখওয়ানুল মুসলিমীনই এমন যারা একটি মৌলিক উদ্দেশ্য পেশ করেছে যা

মৌখিক ভক্তি ও বিশ্বাস হতে অগ্রসর হয়ে বেশি পরিমাণে সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।[১]

কিন্তু একদিকে এই আন্দোলনের পরিচালকগণ সময়ের কিছু পূর্বে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করায় এবং অন্যদিকে আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা ক্ষমতায় আসীন হয়ে ঐ আন্দোলনকে পূর্ণ শক্তির সাথে দলিত ও পিষ্ট করে দেয়ায় আরব জগত তৎসঙ্গে গোটা ইসলামী জগতও এই ব্যাপক শক্তিশালী আন্দোলনের উপকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগের সর্ববৃহৎ ইসলামী আন্দোলন এবং দ্রুত বিকাশ ঘটা একটি শক্তিশালী দীনী দাওয়াত। এর অবদমন ইসলামী জগত, বিশেষভাবে আরব জগতের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি ও বড় বেদনাদায়ক ঘটনা।

এখন মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কিছু স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে। কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, তাদের উৎসাহ ও উদ্যমের পুনর্জাগরণের সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। তারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হওয়ার পূর্বে তাদের যে মাসিক পত্রিকা الدعوة। প্রকাশিত হতো তা বহু বছর পর কায়রো হতে পুনরায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে এবং এর পাঠক সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যা কোন নতুন পত্রিকার হতে দেখা যায় না। এ দ্বারা মিসরের মুসলমানদের মনে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রভাব ও গুরুত্বের কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় এবং এও জানা যায় যে, এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইখওয়ানের শূন্যতা পূর্ণ হয়নি এবং ইখওয়ান ও এর মুখপত্রকে ইসলামী নেতৃত্বের স্থানে আবার আসতে হয়েছে। ولله الامر من قبل ومن بعد পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই (৩০ : ৪)

২৩ শে জুলাইয়ের মিসরীয় বিপ্লব ও এর প্রভাব

বিদেশী সংস্কৃতি, পাশ্চাত্যপ্রিয়তার আমন্ত্রণ ও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী আন্দোলন ও দর্শন যা বাইরে থেকে আমদানী করা হয়েছিল এবং হচ্ছিল তা প্রসার-প্রচারের নিমিত্ত দেশের বড় বড় সাহিত্যিক, লেখক ও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার জন্য নিজ নিজ খেদমত পেশ করেছেন। মানুষের অন্তরে এ সবের স্বাভাবিক প্রভাব কাজ করছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকগণ, নতুন প্রজন্মের ব্যক্তিবর্গ ও সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণ আত্মহারা হয়ে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক

১. Islam in Modern History, p. 161-162.

বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী ও অবস্থার পরিবর্তনে ইচ্ছুক ব্যক্তি একে সম্পূর্ণ সমাদরের সাথে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। এই সমস্ত বিষয়ে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রচারিত হচ্ছিল।

এই সমস্ত রচনা যুবকগণ তাদের বুদ্ধির উন্মেষের বয়সে পাঠ করতে থাকে এবং একে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করে। এটা তাদের কল্পনা, আকীদা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনার এমন এক অংশ হয়ে যায় যা কখনও ছিন্ন হবার নয়। তারা ঐ সব দর্শনে দেশের উন্নতি ও প্রগতির পথ দেখে, উন্নত দেশসমূহের শ্রেণীভুক্ত হওয়ার একমাত্র রাস্তা বলে একে মনে করে। প্রচলিত শিক্ষানীতি, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পরিচালনার সব কাঠামো ও প্রকাশিত সাহিত্য এর কোনটিতে এই যোগ্যতা ছিল না যে, প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি যা ইতিপূর্বে কামাল আতাতুর্ক নিজ দেশে পরীক্ষা করেছিলেন, তার ঊর্ধ্বে যুবকদের সামনে অন্য কোন উচ্চ চিন্তা ও কল্পনা উপস্থিত করতে পারে। তারা শুধু জাতীয়তার নাম বদলিয়ে সেই একই আন্দোলন ও পরিকল্পনার অনুসরণ নিজের দেশে করতে চাচ্ছিল (অর্থাৎ তুর্কী জাতীয়তার স্থলে আরব জাতীয়তা)। তারা এতে সোসালিজমের সংযোগ ঘটাচ্ছিল, যা কামাল আতাতুর্ক-এর আমলে এত স্পষ্ট ও শক্তিশালী আকারে আসে নি। তখনও এই মতবাদ মানুষের চিন্তা, কল্পনা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর তেমন অধিক পরিমাণে ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। এ দল বর্তমানে কেবল এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, আরব জগতের নেতৃত্বে তাদের হাতে আসুক এবং তারা এই মতবাদ সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে সক্ষম হোক!

মিসরে ১৯৫২ সালের ২৩ শে জুলাইয়ের বিপ্লব স্বাভাবিকভাবে সফলতা লাভ করেছে। যারা এই নাজুক অবস্থার পরিবর্তনে ইচ্ছুক ছিল, দেশের কল্যাণকামী ছিল এবং দেশের শক্তি, স্বাধীনতা ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষী ছিল, তারাই এই বিপ্লবকে অভ্যর্থনা জানাল। বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন মতের ব্যক্তিগণ এই বিপ্লবের সাথে বিভিন্ন রকমের আশা যুক্ত করেছিল। এই বিপ্লবের পক্ষে সম্ভব ছিল মিসরকে এর কেন্দ্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। একে ইসলামী বিশ্বের প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব এবং বিশ্বাস ও সম্মানের উচ্চ পদ দান করা, এর জন্য অগ্রগতির পথ পরিষ্কার করা ও জীবনের এমন এক নিয়ম-নীতি তৈরি করা যা মিসরীয় জাতির দীনী আবেগ ও আরব বিশ্বের প্রকৃতির (যাকে আল্লাহ তা'আলা কেবল দীন দ্বারা একত্র ও শক্তিশালী করার মীমাংসা করেছেন) সাথে সামঞ্জস্যশীল।

এভাবে তা নতুন যুগের প্রকৃতির সাথেও বিশেষভাবে খাপ খেত, যা জাতীয়তাবাদে (ন্যাশনালিজম) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে এবং সংকটময় ভ্রমণে ঐ সমস্ত গোঁড়ামি হতে মুক্ত থাকতে সচেষ্ট হয়েছে, যা ভাষা, বংশ, বর্ণ ও দেশের ভিত্তির ওপর স্থাপিত। এটা ঐ সমস্ত বন্ধন পশ্চাদ্‌গমনের কারণ বলে সাব্যস্ত করে, এ সকল বন্ধন ও সম্পর্ক মানবীয় ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কিন্তু বিশ্ব আরবদের হতে এর চেয়ে বেশি প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও আরব জাতীয়তা হতে আরও উন্নত চিন্তার আশা করে। বিশ্ব মিসরীয় বিপ্লবের কর্ণধারদের কাছ থেকে অনেক গভীর বুদ্ধিমত্তা ও স্পষ্ট সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির আশা রেখেছিল। কিন্তু এখন সকলেই হতাশ হয়েছে।

মিসরীয় ও আরব সমাজ ব্যবস্থা বিকৃত করার চেষ্টা

সত্বরই জানা গেছে যে, তা এক সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র দর্শন ও মতবাদ এবং একটি পূর্ণ পরিকল্পনা যা বস্তুবাদী জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মিসর ও এর মাধ্যমে পূর্ণ আরব বিশ্বকে পরিবর্তন করার এক সক্রিয় কৌশল, এক বিশেষ উদ্দেশে প্রস্তুত করা হয়েছিল যাতে এই সমাজ এমন এক নতুন সমাজে পরিণত হয় যা নিজের জন্য নতুন সামাজিক বন্ধন ও বন্ধুত্ব নির্বাচিত করতে পারে। যার ফলে নতুন নৈতিক মূল্যবোধসমূহ মজবুত হয়ে স্থিত হয় এবং নতুন দেশী সামাজিকতায় তা প্রকাশ পায়।[১]

এমন সমাজ যা স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও একতাকে জীবনের ভিত্তি ও সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলে বিশ্বাস করে।[২]

আমাদেরকে মিসরীয় সাধনার মূল ফেরআউনী ইতিহাসে খোঁজ করতে হবে যা মিসর ও মানব সভ্যতার সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা।[৩] আরব জাতির জন্য তাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার উদ্দেশে আরব জাতির ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা যা তাদের নিকট আরবী ভাষা, ইতিহাস ও আশার ঐক্যের ওপর স্থাপিত। ভাষার ঐক্যের মাধ্যমে চিন্তা ও মন-মানসিকতার ঐক্য সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক ঐক্য বিবেক ও জ্ঞান-শক্তির ঐক্যকে সৃষ্টি করে। আশার ঐক্য ভবিষ্যতের ঐক্যের উৎস।[৪]

---

১. এটা প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের ভাষণ যা তার প্রসিদ্ধ জাতীয় ঘোষণা, ৩১শে মে ১৯৬২ সালে প্রচারিত হয়েছে। দেখুন আল মীছাকুল জ্বানী, ১ম অধ্যায়।

২. ঐ।

৩. জাতীয় ঘোষণা, ৩য় অধ্যায়।

৪. ঐ, নবম অধ্যায়।

ইসলাম যা ক্ষুদ্র (অমুসলিম) সংখ্যালঘু ছাড়া সমগ্র আরবের দীন। তাকেও অন্যান্য ধর্মের মতই তারা ধারণা করে। তারা সব ধর্মকে এক শ্রেণীতে ও এক স্তরে স্থান দেয়। সব ধর্মের স্থায়িত্বের ও উন্নতির জামিন এবং সকলের প্রভাব ও শক্তির স্বীকৃতি দেয়। তাদের মতে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা পবিত্র আমানত। আমাদের নতুন জীবন ব্যবস্থায় এটা স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। ধর্মের কারণেই স্থায়ী আত্মিক মূল্যবোধসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো মানুষকে হেদায়েত করার ও মানুষের জীবনকে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার এবং ভাল, সত্য ও বন্ধুত্বের ন্যায় মানবীয় গুণকে অসীম শক্তি দান করার ক্ষমতা রাখে।[১]

তিনি ঐ সমস্ত মূলতত্ত্ব ও ঘটনা সমাজবাদী ও বস্তুপূজারীর অনুরূপ দৃষ্টিতে দেখেন। আর তারা ধর্মের কেবল বাহ্যিক দিকের বিপ্লবী শক্তি ও মানব ইতিহাসে এর কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিতে অভ্যস্ত। পরকাল ও অদৃশ্য তত্ত্বের ওপর ঈমান ও আকীদার দীনী মূল্য ও পরকালের প্রতিদানের প্রতি কোন নিশ্চিত বিশ্বাস তাদের নেই। মিসরের নতুন বিধি-বিধানে রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় (যা রাষ্ট্রপতি পড়ে শুনিয়েছেন) নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে : সমস্ত খোদায়ী ধর্মতত্ত্ব ও প্রকৃতিতে মানবীয় বিপ্লব রয়েছে। যার উদ্দেশে মানুষের সম্মান, মহত্ত্ব ও সুখ অর্জন করা এবং ধর্মীয় চিন্তাবিদদের সর্বোচ্চ কর্তব্য হলো দীনের এই আসল লক্ষ্য ও মূলতত্ত্বের রক্ষণাবেক্ষণ করা।[২]

প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দেল নাসের নতুন আরবীয় সমাজ, সমাজের সদস্যদের ও তাদের অধিকার সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন তা ইসলামী শরীয়ত ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিষ্ঠিত আইনের পরিপন্থী এবং তা পাশ্চাত্য সামাজিক ব্যবস্থা ও আধুনিক চিন্তার ওপর ভিত্তি করে রচিত। নারী তাদের নিকট সর্ববিষয়ে পুরুষের সমান। তার মতে পুরাতন শৃংখল ও বন্ধন যা স্বাধীনভাবে কাজ করতে তাকে বাধা দেয় তা বিলুপ্ত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে সে জীবনের গঠনমূলক কার্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কার্যকর অংশ গ্রহণ করতে পারবে।[৩]

এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ও প্রমাণাদির কথা বাদ দিলেও এতে কোন সন্দেহ থাকে না, যে মনোভাব ও চিন্তাধারা এই বিধিবদ্ধ আইন ও ঘোষণায় প্রতিভাত হয়েছে তা যিনি বা যারা রচনা করেছেন, তিনি ও তারা খাঁটি বস্তুবাদী মনোভাবেরই

---

১. জাতীয় ঘোষণা, সপ্তম অধ্যায়।

২. জাতীয় ঘোষণা, সপ্তম অধ্যায়।

৩. জাতীয় ঘোষণা, সপ্তম অধ্যায়।

ধারক-বাহক। যদি এই ঘোষণা হতে আরব ও মিসর শব্দগুলো বাদ দেয়া যায়, য বারংবার এতে উচ্চারিত হয়েছে এবং যা দ্বারা বোঝা যায় যে, এই মিসরীয় পরিবেশ ও সমাজের জন্যই এই বিধিবদ্ধ (সেকুলার) সমাজবাদী নিজাম (বিধান) প্রণীত। কারণ এই সমস্ত সরকার ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার ও মানব সভ্যতার ওপর ধর্মের কারণে সৃষ্ট আত্মিক মূল্যবোধের প্রভাব ও ক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়।

এই বিপ্লবের নেতাগণ মিসরীয় সমাজ চিন্তা-কল্পনা ও মন-মগজের পূর্ণ পরিবর্তন এবং নব্য আকৃতি দানের জন্য বহু প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা প্রকৃতপক্ষে আরব জাতির মনোভাব পুরোপুরি পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল। তারা আরব জাতীয়তার ওপর ধর্ম ও বিশ্বাসের জোর দিয়েছেন। লেখক, সাহিত্যিকগণ এ উষ্ণ উদ্দেশ্য ও আদর্শ হিসেবে তার গুণগান প্রচার করেছেন। তাদেরকে ফেরআউনী কালের গৌরব করতে ও ফেরআউনী সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতে সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল।

এক জাতি, এক সভ্যতা ও এক দেশীয় হিসেবে ফেরআউনী আচার-আচরণের দাওয়াত দিতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। লোকেরা এতে বলেছিল, আমরা আরব ও ফেরআউনের বংশধর। ফেরআউন শব্দের মধ্যে এখন মানুষের জন্য কোন ঘৃণা ও অপছন্দের কথাই নেই যাকে কুরআন মজীদ এক চিরস্থায়ী অভিশপ্ত ও পরিত্যাজ্য নীতিরূপে পেশ করেছে এবং প্রতিটি কালের প্রতিটি দেশের মুসলমানদের এর ওপর ঈমান ও বিশ্বাস রয়েছে। আরব ও আরবীয় হওয়ার শব্দকে আল্লাহর নামের সঙ্গে অংশীদার করা হয়েছে।

তারা এই কথা বলেছে, العزة لله وللعرب। অর্থাৎ সম্মান নির্দিষ্ট আল্লাহর জন্য এবং আরবদের জন্য। তাদের এই সব উক্তি ও ব্যবহার অন্যান্য ব্যক্তির সাহসকে বর্ধিত করেছে। ফলে এ ব্যাপারে সীমাহীন অতিশয়োক্তির সঙ্গে কথা বলা দূষণীয় গণ্য হয়নি। এমন কি তাদের উক্তি ও আচরণ নাস্তিকতার সীমায় পৌঁছে গেলেও তা নিন্দনীয় নয়। বরং ইসলাম হতে বের হয়ে যাওয়া এখন পুরস্কার, উপাধি, প্রশংসা, জয়ধ্বনি, উপহার-উপঢৌকন লাভের একটি সহজ উপায়। এ ধরনের কার্যক্রম দ্বারা তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

লেখক ও সাংবাদিকগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দীন ও ইসলামের রীতিনীতি ও নিদর্শনের খোলাখুলি উপহাস করতে ও অবমাননা করতে পারতেন এবং সমাজে নির্লজ্জতা, গোমরাহী, পাপাচার ও অনাচার ছড়াতে দ্বিধা করতেন না। প্রেসকে

জাতীয়করণ করায় এই সমস্ত বিষয় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পত্র-পত্রিকায় উলঙ্গ অশ্লীল ছবিসমূহ, অপবিত্র যৌন সম্বন্ধীয় গল্প-কাহিনী ও অপরাধ সংক্রান্ত উস্কানিমূলক সংবাদসমূহের প্রচার বহু গুণে বেড়ে গেছে। পর্দার অন্তরালে উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ক্রমশ সমাজ ব্যবস্থা ও মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়া এবং বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও কম্যুনিস্ট রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হয়ে যাওয়া।

সমাজের ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য তারা আরো বিভিন্ন প্রকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নীতি পরিবর্তন করা হয়েছে, ইসলামী আদালত, কাযীদের দফতর, ধর্মীয় ওয়াকফসমূহের ব্যবস্থাপনা বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। সহশিক্ষা, বিচিত্রানুষ্ঠান, নৃত্য ও গানের আসরের বেপরোয়া প্রবর্তনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আরব বিশ্বের ওপর মিসরীয় বিপ্লব ও তার নেতৃত্বের মন্দ প্রভাব

ঐ সকল বুদ্ধিমান, উচ্চ সাহসী যুবক যাদের প্রাণে আরবদের সম্মান ও উন্নতির চিন্তা ছিল এবং যারা আরবদের শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ আকারে দেখার বাসনা রাখত, তারা আরব জাতীয়তাবাদীর পতাকাধারীদেরকে নিজেদের আদর্শ মনে করেছে, তাদের বন্ধুত্বের দাবি করেছে এবং ঐ আন্দোলনকে আরবী আত্মার এক নতুন জাগরণ ধারণা করেছে, যা তাদের ধারণায় আরবদের প্রাচীন মহত্ত্ব ও নেতৃত্ব এবং অতীত মর্যাদা ও প্রভাব আবার ফিরিয়ে আনতে পারে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই এবং সমালোচনা ও তিরস্কারেরও কোন কারণ নেই। সম্মান, প্রভাব ও ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা স্বাভাবিক ও প্রকৃতিজাত। আরব যুবকদেরও তা ইচ্ছা করার ও পূর্ণ শক্তির সঙ্গে আরব দেশ ও আরব শাসনসমূহের মধ্যে একতা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টার অধিকার রয়েছে।

কিন্তু এই প্রচেষ্টার এক বেদনাদায়ক দিক এই যে, এই চিন্তা ও প্রবণতার সাথে শেষ দিকে কিছু এমন ঘটনা, পদক্ষেপ এবং ইসলামের শিক্ষা ও প্রাণের বিপরীত উদ্দেশ্যাদি সংযোগ করা হয়েছে যা ইসলামের প্রভাবকে ছোট করে দেয়। এটা আরব জনগণ ও নেতাদের সম্বন্ধ বিশ্বব্যাপী ইসলামী ভ্রাতৃত্ব হতে কর্তিত করে। তা তাদের মধ্যে আরব জাতীয়তা, এটার পবিত্রতার ধারণা এবং তার সঙ্গে মানসিক ও আত্মিক সম্বন্ধ সৃষ্টি করে, যা যে কোন সুনির্দিষ্ট মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আকীদার স্বভাব। ফলে আরব বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় শহরসমূহে শিক্ষিত

যুবকদের মধ্যে নাস্তিকতা অসাধারণ দ্রুত গতিতে ছড়াতে আরম্ভ করেছে এবং আরব জাতীয়তার আবেগপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক ও আমন্ত্রণকারীদের মুখ হতে এমন মন্তব্য বের হচ্ছে যাতে কুফর (আল্লাহকে অবিশ্বাস করা) ও মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগ) হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নাজাতের একমাত্র উপায় ও অছিলা মনে করে না এবং হযরত ﷺ যে মানুষের সম্মান, মহত্ত্ব ও আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের উৎস তাও মানে না। তারা নিজেদের উন্নতি, শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অতীতের অন্ধকার রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি অন্ধকার যুগের আরবদের কোন তিরস্কার করা হয়, কোন শক্ত সমালোচনা করা হয় তবে তাদের খুব খারাপ লাগে এবং তারা অসহ হয়ে ওঠে। আবার কোন কোন সময় তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অন্ধ যুগের পক্ষপাতিত্ব الحمية الجاهلية প্রকাশিত হয় এবং তাকে রক্ষা করার প্রবণতা জোরালো হয়ে ওঠে।

চিন্তার অঙ্গনে ধর্মদ্রোহিতার বিকাশ

আরব বিশ্বে চিন্তা, সংস্কৃতি ও ধর্মে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছে। এটা একটা বড় সংকট। আরবদের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান, সুদৃঢ় সাহস, শক্তিশালী রাষ্ট্র ও ব্যাপক ঐক্য, এ সব কিছু এই সংকটকে রুখতে পারবে না। এটা এক অতুলনীয় ক্ষতি যার মুকাবিলা করা অতি কঠিন। এর ফল আর কিছুই নয় যে, তারা বার বার অপমানিত হবে এবং নিজেদের উদ্দেশে বার বার অকৃতকার্য দেখতে পাবে। তারা একটি স্থায়ী অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার শিকারে পরিণত হবে। আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির সত্যতা তারা অবলোকন করবে :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً ـ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ـ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ـ

অর্থাৎ (হে পয়গম্বর) আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে জানাইয়া দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের অবস্থা? উহারাই তাহারা, দুনিয়ার জীবনে যাহাদের প্রচেষ্টা পণ্ড

হয়, যদিও তাহারা মনে করে যে, তাহারা সৎ কর্ম করিতেছে। উহারাই তাহারা, যাহারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ ও তাহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার কথা অস্বীকার করে। সুতরাং তাহাদের সমস্ত কাজ নিষ্ফল হইয়া যায় এবং কিয়ামতের দিন তাহাদের (কর্মের) কোন গুরুত্ব রাখিব না। [সূরা কাহাফ : ১০৩-১০৫]

সন্দেহযুক্ত করার মহোদ্যম ও আরব দেশসমূহের মানসিক অস্থিরতা

মিসরের সাহিত্যিকগণ[১] (যাদের মধ্যে খৃস্টান লেখকগণ অগ্রবর্তী রয়েছে) বহু দীর্ঘ সময় হতে সন্দেহ সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত আছে। তারা নিজেদের রচনা ও লেখা, সাহিত্য জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও আলোচনা-সমালোচনা দ্বারা দীনী আকীদা, ঐতিহাসিক সর্বসম্মত বিষয়সমূহ, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক মূল্যবোধসমূহ, সামাজিক নীতিসমূহ, সাধারণ আচার-ব্যবহার ও এই ধরণের বিষয়কে সন্দেহযুক্ত ও বিশ্বাসের অযোগ্য সাব্যস্ত করে দিতে চেষ্টা চালান। কেবল তাদের বর্ণনারীতি নয়, বরং তাদের উস্কানিমূলক কার্যক্রমও প্রায় বিভিন্ন প্রকার হয়। কোন সময় এই কাজ নতুনত্ব প্রিয়তার আকাঙ্ক্ষা এবং ইউরোপের চরম অনুসরণ ও অনুকরণপ্রিয়তার জন্য করা হয়। আর কোন সময় খ্যাতি অর্জন ও নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে প্রিয় ও সমাদৃত হওয়ার জন্য করা হয়।

আবার কোন সময় ব্যবসার মনোভাবের সাথে আর্থিক লাভ ও নিজের গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশে করা হয়। আবার কোন সময় এর পেছনে কাজ করে দ্রুত সুনাম অর্জন এবং সত্বর গ্রন্থ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা। এটা নিশ্চিত যে, খৃস্টান সাহিত্যিক ও গ্রন্থকারদের উদ্দেশ্য সুদূরপ্রসারী। তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল যে, ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা ও ইসলামের প্রতি বিশ্বাসকে শিথিল ও নড়বড়ে করে দেয়া। মিসরে প্রচার ও প্রকাশের শক্তিশালী আন্দোলন ও বড় বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকায় তাদের কাজ খুবই সহজ হয়েছিল এবং তাদের কাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে অতি দ্রুত। তদুপরি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ খ্রীস্টান অথবা মারোনী বা ধর্মহীন ব্যক্তিদের অধীনে ছিল।

অপরদিকে পূর্ণ আরব জগত মিসর হতে প্রকাশিত প্রতিটি রচনাকে (ভাল মন্দ বিচার ছাড়া) হাতে হাতে নেবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকত। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, মিসরে নতুন নতুন পুস্তক ও সাহিত্যিক রচনাদির লিখন, মুদ্রণ ও

---

১. এক্ষেত্রে রিফা বেগ তাহতবী, কাসেম আমীন, আহমদ লুতফী সাইয়েদ ও ড. তাহা হুসাইন-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে উদ্দাম প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে । বেশির ভাগ পুস্তক আধুনিক পদ্ধতিতে সুন্দরভাবে ছাপা। নব প্রজন্ম এই সমস্ত নতুন পুস্তকের আগ্রহী পাঠক। তাদের মন-মগজে এগুলোর গভীর প্রভাব বিদ্যমান। এ কারণে কেবল মিসর নয়, বরং সকল আরব দেশে চিন্তার জগতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সমস্ত সনাতন ভিত্তি সম্পূর্ণ নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। অথচ এ সকল ভিত্তির ওপর জ্ঞান ও সভ্যতার সৌধ স্থাপিত হতে পারত। আর তা হতো আকীদা, ব্যক্তিত্ব ও ইতিহাসে গৌরবের বিষয়। এ দ্বারাই জীবনযুদ্ধে মুকাবিলার শক্তি, দৃঢ়তা অবলম্বন, বিপদ-আপদে ধৈর্য, দীনের জেদ ও আত্মমর্যাদা বোধ অর্জিত হতে পারত। এর স্থান দখল করেছে সন্দেহ, অস্থিরতা, দুর্ভাবনা, ভীরুতা, দুর্বলতা, অকর্মণ্যতা,[১] স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তা ও আরাম-আয়েশ।

সন্দেহ সৃষ্টির এই ষড়যন্ত্র পূর্বপরিকল্পিত ছিল। আর তা সম্ভব হয়েছিল নিম্ন মানের সাহিত্যের প্রভাবে যার ভিত্তি হলো যৌনাচার ও পাপাচার। ফলে সমস্ত আরব জাতি আত্মিক শক্তি হতে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে যা ছিল কঠিন সময়ে জাতির সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্য শক্তি এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী কর্মক্ষমতা। সন্দেহযুক্ত মনোভাবের দরুন ইতিহাসের প্রতিটি যুগে বহু জাতিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। অনেক সভ্যতা ও অনেক পুরাতন সংস্কৃতি কেবল এই কারণেই জগৎ হতে মুছে গেছে। বর্তমানে আরব জগতের এই অবস্থার জন্য বিশেষভাবে দায়ী এই সকল অনূদিত সাহিত্য, নাটক, গল্প-কাহিনী, উপন্যাস, টেলিভিশন ও রেডিও'র প্রচার-প্রসার। ১৯৬৭ সালের ৫ই জুনের বেদনাদায়ক ঘটনার প্রাথমিক কারণও তাই। পরবর্তীকালের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের অবস্থার মূল উৎসও এগুলোতেই অনুসন্ধান করতে হবে।

এর বিপরীত ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলন দীনের প্রতি অটল আকীদা, দীনের কাজের যোগ্যতা ও ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাস, চারিত্রিক স্থিরতার এমন এক তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল যাতে এর অনুসারীদের মনে আকীদা ও নীতির জন্য প্রাণ দেবার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছিল, ধর্ম ও ইজ্জতের জন্য ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করার অভিপ্রায় জন্মেছিল এবং বীরত্ব ও ধৈর্যের এমন সব উচ্চ গুণ সৃষ্টি করেছিল যার নিদর্শন ১৯৪৮ সালের ফিলিস্তীনের যুদ্ধে প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু যখন আরব জগত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব হতে (বিভিন্ন কারণে যার বর্ণনার এটা স্থান নয়) বঞ্চিত

১. এগুলোর জন্য হাদীসেও 'ওহন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো মৃত্যুর ভয় ও দুনিয়ার মুহাব্বত। (আবু দাউদ)

হলো তখনও ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ কর্ম সম্পন্ন করতে বাধাগ্রস্ত হলো, তখন অন্য কোন দল মাঠে আসেনি, যারা ইসলামের নামে আহ্বান করতে সক্ষম এবং ঈমান ও ইসলামী বীরত্বের ওপর ভরসা রাখে।

অপরদিকে আরব জাতীয়তা সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমের আন্দোলন ও প্রকৃতভাবে এই শূন্যতা পূর্ণ করতে পারেনি আরবদের মধ্যে ইসলামী আবেগ ও উদ্যম সৃষ্টি করা এবং বিচ্ছিন্ন আরব জগতকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অকৃতকার্য রয়েছে, তাই পরাজয়ের বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। যে ঘটনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল মুসলমানকে হেয় করে দিয়েছে এবং আরবদের কপালে এমন অপমানের চিহ্ন লাগিয়ে এমন এক তিক্ত স্মৃতি রেখে গেছে যা ভুলবার জন্য প্রয়োজন এই বৃহৎ পরাজয়ের গ্লানির বিপরীতে বৃহত্তম কোন জয় লাভ।

লোকসানের কেনাবেচা

মিসর বহু দিন যাবত আরব জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, চিন্তা-চেতনায়, সাহিত্যে, ধ্যান-ধারণায় ও দীন পরিচালনার ক্ষেত্রে দিশারী বা পথপ্রদর্শক ছিল। আজ সে ধর্মহীনতায় ও সীমাহীন আরব জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্রের নীতিকে গ্রহণ করতে আগ্রহী এবং খাঁটি বস্তুবাদী রাজনৈতিক চিন্তাধারায় আবিষ্ট। হ্যাঁ, এটা বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যদি মিসরের নেতাগণ (আরো সঠিকভাবে বললে মিসরের একনায়ক জামাল আবদুন নাসের) আরবদের জন্য উচ্চ মর্যাদার স্থান অর্জন করতে ও মিসরের ইজ্জত বাড়াতে সফলতা লাভ করত। যেমন কামাল আতাতুর্ক খুব কঠিন অবস্থায় তুরস্কের সম্মান রক্ষায় প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং বিজয়ী হয়েছিলেন। এটা এ শ্রেণীর জন্য ঐ সমস্ত ত্যাগের মূল্য হতে পারত, যা মিসরকে নেতৃত্ব দেয়ার সময় এসেছিল যার ফলে মিসরকে নিজের অনেক যোগ্য সন্তান হতে বঞ্চিত হতে হয়েছে (যারা জাতির জন্য রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীনের ক্ষেত্রে মিসরের বহু উপকার করতে পারতেন)। ইসলামী উদ্যম, আবেগ ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি যা পুরনো আমল হতে মিসরের নীতি ছিল তা হতে বহু নীচে মিসরকে নামতে হয়েছে।

শুধু তাই নয়, বরং তা থেকে হাত গুটাতে হয়েছে। তাদেরকে জীবিকার ক্ষেত্রে ভীষণ বিপদে পড়তে হয়েছে। তাদের প্রেস মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হয়েছে যা প্রতিটি দেশের জন্য বড় নিয়ামত এবং মিসরের জন্য, বিশেষ করে গৌরবের বিষয় ছিল। ইসলামী জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ দুর্বল হয়ে

গেছে এবং প্রতিবেশী আরব দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্কে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে সুয়েজ খালের যুদ্ধের সফলতার পর এই নতুন নেতৃত্ব প্রেস ও রেডিও'র মাধ্যমে (বাকচাতুর্যে ও উচ্চ অভিপ্রায়ে কোন প্রাচ্য দেশ এর সমকক্ষ নয়) বিশ্বকে এই আভাস দিয়েছে যে, মিসর সমস্ত আরব দেশের মুক্তিদাতা হতে পারে এবং মিসর কেবল ইসরাঈলের মত ছোট রাষ্ট্রের সঙ্গে নয়, বরং বড় পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের মুকাবিলা করতে পারে। অতঃপর সীনাই উপত্যকা ও আস্কারা উপসাগরের সীমানায় সে যুদ্ধ বাঁধায়।

সুয়েজের যুদ্ধের পর সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টি আবার তার ওপর নিবদ্ধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য যে, বিশ্বকে সে ভীষণ নৈরাশ্যে ফেলে দেয় যখন ১৯৬৭ সালের ৫ই জুন ইসরাঈল রাষ্ট্র সম্মিলিত আরবীয়া জমহুরিয়ার ওপর আক্রমণ করে বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে মিসরের সৈন্যদের পশ্চাৎপদ হওয়ার সংবাদ আসতে থাকে। এই আক্রমণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মিসরের বিমান শক্তি শেষ হয়ে যায় এবং চার-পাঁচদিনের মধ্যে জমহুরিয়া আরবীয়া যারা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছিল কোন শর্ত ছাড়াই যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব মেনে নেয়। ইসরাঈল গাজা ও শরমুশ শায়খকে দখল করে এবং সীনাই এলাকা নিজের অধীনে আনে। তদুপরি সুয়েজের পূর্ব তীরও তারা দখল করে নেয়।

মিসর তাদের তোপের কবলে এসে যায়। তখন ন্যায়পরায়ণ পর্যবেক্ষকগণ পূর্ণভাবে অনুভব করলেন যে, মিসর তাদের শক্তির উৎস ঈমানী, চারিত্রিক চেতনা ও ইসলামী আত্মমর্যাদা ছেড়ে দিয়ে খাঁটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। মানুষের এটা বুঝতে বাকী রইল না যে, আরব জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র বাতাসে পরিপূর্ণ একটি মশকের মত ছিল, সুঁই বিদ্ধ হওয়ামাত্রই সমস্ত বাতাস বের হয়ে গিয়েছে। বিশ্ব এটাও অনুমান করতে পেরেছে যে, এই সমস্ত ক্রীড়া বাইরের এক শক্তি (সোভিয়েত রাশিয়া) ও আন্তর্জাতিক অবস্থার ভরসায় খেলা হয়েছিল যা সময়ে কোন কাজে আসেনি। ফলে আরব বিশ্বকে নৈরাশ্য ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানের হাত হতে চলে যাওয়ায় বিশ্ব মুসলিম আত্মিক আঘাত পেয়েছে এবং অপমানিত হয়েছে।

যুদ্ধের অংশীদার আরব শক্তিসমূহের ওপর দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের পাহাড় নেমে এসেছে। তাতারীদের হাতে ইসলামী জগতের অপমান ও বাগদাদের পতনের ঘটনার পর ইসলামী ইতিহাসে তার নজীর পাওয়া যায় না। এ দ্বারা এ সত্যটি উজ্জ্বল দিনের মত প্রকাশিত হলো যে, আরবদের ভাগ্য ইসলামের সাথে চিরতরে জড়িত এবং এ সমস্ত দেশে অন্য কোন আন্দোলন ও কোন চেষ্টা সফল হতে পারে

না। ইসলামবিমুখ বস্তুবাদী কোন ব্যবস্থা আরব দেশে তথা মুসলিম বিশ্বে কোনদিন কৃতকার্য হতে পারে না। তা দ্বারা প্রসিদ্ধ আরব ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ইবন খালদূনের মত আবারও সত্য বলে প্রমাণিত হলো, "আরবদের মধ্যে দীনী সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ একতা ও শক্তি সৃষ্টি করতে পারে না।"

আনওয়ার সাদাতের আমলে মিসর

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে জামাল আব্দুন নাসেরের ইন্তিকাল হয়। ১৯৬৭ সালের পরাজয়ের ফলে মিসর ভীষণভাবে আর্থিক, রাজনৈতিক, মানসিক অস্থিরতা ও দুর্ভাবনায় পড়েছিল। মিসরীয় জাতি পরাজয়জনিত দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল। আনওয়ার সাদাত জামাল আব্দুন নাসের-এর স্থলবর্তী হলেন। তিনি অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী নেতার তুলনায় যারা নেতৃত্বের প্রার্থী ছিলেন, মধ্যমপন্থী ও দীন সম্পর্কে তার ধারণা বিদ্বেষমূলক ছিল না, তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থিগণ বামপন্থী ছিলেন, যাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল রাশিয়া। আনওয়ার সাদাতের নির্বাচনে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সমর্থন ছিল।

ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পর আনওয়ার সাদাত জামাল আব্দুন নাসেরের বিরোধী দলকে সাহায্য-সহায়তা করলেন এবং বামপন্থীদেরকে দমন করার চেষ্টা করলেন, রাজবন্দীদের মুক্তি দিলেন। ঐ বন্দীদের মধ্যে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের লোকও ছিল। প্রেসকে সামান্য স্বাধীনতা দিলেন। ক্রমশ রাজনৈতিক দলসমূহকে কাজ করবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার সাথে সাথে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে আবদুন নাসেরের আমলে যেভাবে ছিল সেভাবেই বিদ্যমান থাকে।

এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার ফলে দীনের আন্দোলনকারিগণ পুনঃ কাজ আরম্ভ করে, ইখওয়ানীরা বাজেয়াপ্ত করা পুস্তিকা 'আদ-দাওয়াত' পুনঃপ্রকাশ করল। আদ-দাওয়াতের প্রথম প্রকাশ যেভাবে দেশে অভিনন্দিত হয়েছিল, এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, মিসরীয় জাতি সত্যের ডাক শুনতে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় ছিল। প্রথম প্রকাশের কয়েকটি এডিশন প্রচারিত হয়। প্রতিটি এডিশন বাজারে আসা মাত্রই শেষ হয়ে যায়।

মিসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে ইসলামী ভাবাপন্ন ছাত্রগণ জয়ী হয়। প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আবদুন নাসেরের আমলের অত্যাচার-অবিচারের ওপর পুস্তকাদি প্রচারিত হয়। প্রতিটি

পুস্তকের অনেক এডিশন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং জনগণের মধ্যে তা সমাদৃত হয়। জনগণ শরীয়তী আইন চালু করার জন্য চাপ দিতে আরম্ভ করে এবং ঐ দাবি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এ বিষয়ে ইতিবাচক নীতি গ্রহণ করলেন কিন্তু পরোক্ষভাবে এই দাবিকে বাধা দেয়ার চেষ্টা জারি রাখলেন। কারণ দীনী মনোভাবের এরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তিকে মিসরের শাসকবর্গ নিজেদের জন্য রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিপজ্জনক মনে করতেন। বামপন্থীদের প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য তাও সম্ভব ছিল না যে, দীনী মনোভাবকে সরাসরি প্রদমিত করার চেষ্টা করে। রাশিয়ার নেতিবাচক মনোভাব ও বামপন্থীদের এর সাথে সহানুভূতি আনওয়ার সাদাতকে এমন পদক্ষেপের জন্য বাধ্য করেছে যা দীনীপন্থীদের শক্তির কারণ হয়।

আনওয়ার সাদাত জামাল আবদুন নাসেরের প্রতিটি পরিকল্পনায় কেবল অংশীদার ছিলেন না, বরং পরামর্শদাতাও ছিলেন। ফলে ইখওয়ানের শক্তির ঠিক পরিমাপ তার জানা ছিল এবং তিনি দীনী মনোভাবকে নিজের জন্য বিপদ মনে করতেন। নিজের নতুন মুনিব আমেরিকাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে তিনি তাদের মুকাবিলার জন্য খৃস্টানদের সাহস বৃদ্ধি করে দিলেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করার পন্থা অবলম্বন করলেন। সংখ্যালঘিষ্ঠদের নেতা বাবা শনোবদা কে সমান অধিকার নয়, বরং তাকে স্বতন্ত্র অধিকার দিলেন। বাবা শনোবদা খৃস্টানদের জন্য আরো অতিরিক্ত অধিকারের দাবি করল। শরীয়তী আইন প্রচলন করার যখন দাবি আসল তিনি তখন খুব জোরে তার বিরুদ্ধাচরণ করলেন। অন্যদিকে আমেরিকার সাথে সম্পর্ক জোরদার হওয়ার সাথে সাথে খৃস্টানের প্রভাবও বৃদ্ধি পায়। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও একটি খাঁটি খৃস্টান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার দাবি করা হলো এবং আমেরিকা তার যাবতীয় খরচ বহন করার স্বীকৃতি দিল। আনওয়ার সাদাত এর মঞ্জুরি দিলেন।

মিসরের এই নতুন প্রবণতায় বৈদেশিক সম্পর্কের ওপর এই প্রভাব পড়েছিল যে, আফ্রিকার দেশসমূহের সমস্ত ইসলামী আন্দোলন হতে মিসর চক্ষু বন্ধ করল। কারণ এ সমস্ত আন্দোলন খৃস্টীয় শক্তিসমূহের বিরোধী ছিল। তদুপরি কোন কোন স্থানে ইসলামী আন্দোলনকে দলিত ও প্রশমিত করার জন্য মিসর খৃস্টান রাষ্ট্রের সাহায্য প্রদান করেছে। মকারিউস নির্বাসনের সময় যখন মিসর গিয়েছিলেন তাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। রাষ্ট্রের এই নেতিবাচক নীতি খৃস্টানদের প্রতি অসাধারণ পক্ষপাতিত্ব, তাদেরকে সাহায্য ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান

ইখওয়ানের সাথে বিশেষ ধরনের ব্যবহার দীনী লোকদের মধ্যে আনওয়ার সাদাত সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি করে।

জামাল আবদুন নাসেরের আমলে ইসলামী ভাবাপন্ন লোকদের ওপর অত্যাচার, অবিচার ও অমানুষিক ব্যবহারের জন্য যারা দায়ী ঐ সমস্ত লোকের সাথে কেবল নরম নীতি নয়, বরং অজ্ঞতার ভান আনওয়ার সাদাতকে আরো বেশি সন্দেহভাজন করে তুলল এবং তিনি ইসলামী ভাবাপন্ন লোকদের নিকট অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তিতে পরিণত হলেন।

১৯৭৩ সালের যুদ্ধে মিসরের সফলতা অর্জিত হয়েছিল যা দ্বারা মিসর নিজের হারানো সম্মান বহু পরিমাণে বহাল করেছিল। মিসরের জন্য আরব বিশ্বের নেতৃত্বের খুব সুন্দর সুযোগের সৃষ্টি হয়েছিল, সউদী আরবের সাহায্য ও পেট্রোলের যুদ্ধ আরবদেরকে সম্মিলিত সংগঠনের আকৃতিতে দণ্ডায়মান করিয়ে দিয়েছিল। তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে বড় বড় শক্তি শংকিত হয়েছিল। এতে ধারণা করা হয়েছিল যে, বিশ্বের ভবিষ্যৎ আরবদের পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করবে। ঐ সময়ে ইসলামী একতার যে প্রকাশ ঘটেছে অতীতের ইতিহাসে এর নজীর খুবই কম পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী কোন কোন পদক্ষেপে ইসলামী বিশ্বে ভীষণ নৈরাশ্যের সঞ্চার হলো। মিসর যুদ্ধের পরপরই ইসরাঈলের সাথে এককভাবে সন্ধির চেষ্টা আরম্ভ করে দিল।

১৯৭৩ সালের যুদ্ধে সফলতা যা ইসলামী ঐক্য বন্ধনের বদৌলতে সম্ভব হয়েছিল এবং যার স্বীকৃতি মিসরের নেতৃত্ব প্রথমে খোলাখুলিভাবে দিয়েছে কিন্তু অতি সত্বর আনওয়ার সাদাত এই লক্ষ্য পাল্টাবার চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি জামাল আবদুন নাসেরের মত দীনী মনোভাব রাখা লোকদের ভয়ে ভীত ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, এই যুদ্ধের ফলে ও কম্যুনিস্টদের বিরোধিতা করার দরুন দীনী মনোভাব কিছু সজাগ ও সতেজ হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে তিনি একে বাড়তে না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৯৭৭ সালের তাকফীর ও হিজরত [কাফেরের ফতোয়া দেয়া ও দেশ ত্যাগ করা] দলের ব্যাপারটিতে আনওয়ার সাদাত ও তার অধীনস্থ শাসকদের দীনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়ার বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। ড. হুসাইনুয যাহাবীর হত্যাকে দীনী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, দীনের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে পত্র-পত্রিকায় প্রচার চালিয়েছে এবং আলিমদের ও ধর্মীয়

কিতাবসমূহের যেভাবে অপমানিত করা হয়েছে, তা দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আনওয়ার সাদাত দীন সম্পর্কে ঐ ধারণাই রাখতেন যা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ দীন সম্বন্ধে বলেছেন। অর্থাৎ দীন হলো সীমাবদ্ধ ইবাদত এবং রাজনীতি ও জীবন হতে সম্পূর্ণ আলাদা।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আনওয়ার সাদাত ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের শত্রু নন এবং জামাল আবদুন নাসেরের বিপরীতে নামাজ-রোযা কিছু পরিমাণ আদায়ও করতেন। ফলে কোন কোন লোকের তার সম্পর্কে ধারণা ভাল ছিল। তাই তারা তাকে الرئيس المؤمن। অর্থাৎ 'ঈমানদার বাদশাহ' উপাধি দিয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তার ওপর নাস্তিকতার দোষ আরোপ করা যেতে পারে না। কিন্তু তার বক্তৃতা ও বর্ণনা দ্বারা তার দীনের ধারণার ব্যাখ্যা হয়। তিনি দীনের অর্থ কেবল দীনই মনে করেন, ইসলাম মনে করেন না। এ কারণে তিনি কিছুদিন পূর্বে এমন এক ইবাদতখানার কল্পনা পেশ করেছেন, যাতে মুসলমান, খৃস্টান ও ইহুদী সকল ধর্মাবলম্বী ইবাদত করতে পারে, তা হলে সকল ধর্ম পরস্পর মিলেমিশে অবস্থান করতে পারবে। মিসরের রেডিওতে কুরআন পাক তেলাওয়াতের সময় ঐ সমস্ত আয়াতের তেলাওয়াত যতদূর সম্ভব পরিহার করা হতো যে সমস্ত আয়াতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে কোন কথা আছে। ঐরূপ পুস্তকাদির প্রচার হতেও বিরত রাখা হতো, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকর্মে এরূপ অন্তর্ভুক্ত করা নিষিদ্ধ যে বিষয়ে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়েছে।

আনওয়ার সাদাত নিজের গ্রন্থ البحث عن الذات-এ লিখেছেন (এর উল্লেখ তিনি বক্তৃতাতেও করেছেন) তিনি বাল্যকাল হতেই কামাল আতাতুর্ক দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

তার রচনাসমূহে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জীবনের প্রভাব প্রকাশ পায়। অধিকন্তু প্রাচ্য সভ্যতা সীমাবদ্ধ ও নিম্ন স্তরের, এ ধারণাও তিনি পোষণ করতেন। এর বিপরীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সীমিত প্রয়োগের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সর্বোপরি কোন অবস্থায় ইসলামের নেতৃত্ব অথবা জীবনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক স্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এ কারণে তিনি নিজের শাসন আমলে ঐ সমস্ত দল বা ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা অথবা কর্মের স্বাধীনতা দেননি যাতে তার চিন্তাধারার বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে ইসলামপন্থীদের সঙ্গে তার কলহ-বিবাদ জামাল আবদুন নাসেরের আমলের অনুরূপ ছিল বলা যায়।

তাকফীর ও হিজরত দলের আহ্বায়কগণকে নামেমাত্র বিচারের পর ফাঁসি দেয়া হয়েছিল এবং এ দল ও তার কার্যক্রম দীন-রাজনীতিকে একত্র করার ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। এর পর এই চিন্তাধারার ব্যক্তিদের ওপর নির্মম নির্যাতন করা হয়। যারা ঐ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি রাখত, আনওয়ার সাদাতের এ ধরনের মনোভাবের কারণে মিসরের ঐ সমস্ত আলিম যারা জামাল আবদুন নাসেরের আমলে দেশ ত্যাগ করেছিল মিসরে ফিরে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, কোন কোন আলিম যারা মিসরে এখনও ছিলেন তারা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

আনওয়ার সাদাত নিরাপত্তা ও শান্তির প্রস্তাব নিয়ে ইসরাঈলে যান। ফলে কেবল মুসলমানদের থেকে নয়, বরং আরবদের থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এর ফলে তাকে আমেরিকার ওপর বেশি বেশি ভরসা করতে হয়েছে। এর পর ক্যাম্প-ডেভিড (Camp-David) চুক্তি হয়েছে। এ চুক্তির বিরুদ্ধে আরব বিশ্ব সোচ্চার এবং একে অপমানজনক ও অসম্মানজনক চুক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। এই চুক্তির ফলে ইয়াহুদীদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ এমনই হয়েছে যেমন ছিল ইতিপূর্বে খৃস্টানদের সঙ্গে। এ কারণে ইসলামী দল থেকেও ঐ পরিমাণ তিনি দূরে সরে গেলেন। ইসলামী দলের পক্ষ হতে বিরোধিতার ফলে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী ও নির্যাতনের পরিমাণ আরো বহু গুণে বেড়ে যায় এবং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে মিসরবাসী বিভক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে ১৯৭৩ সালের যুদ্ধের ফলে যে ইসলামী একতা জন্ম নিয়েছিল তা আনওয়ার সাদাতের পদক্ষেপের ফলে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং মিসরের যে নেতৃত্ব দানের আশা ছিল তাও ধূলিসাৎ হয়।

মিসরের জন্য বেদনাদায়ক এই যে, মিসরীয় বিপ্লবের পূর্বে ও পরে মিসরের শাসক দল দীনকে ও দীন-দরদীদেরকে নিজেদের প্রকৃত শত্রু ভাবে এবং নিজেদের সমস্ত শক্তি তাদের প্রভাবকে ক্ষুণ্ন করবার জন্য ব্যয় করে। আল্লাহ তা'য়ালা মিসরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে প্রতিভা ও যোগ্যতা দান করেছিলেন, যা তার আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় সংকল্প, কর্মশক্তি, নেতৃত্ব ও যোগ্যতার সহযোগী হতে পারত। এই প্রতিযোগিতার কারণে ঐ সব প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। ফলে মিসর তাঁর আমলে পুরোপুরিভাবে চিন্তার দৈন্য ও নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে এবং শক্তির উৎসের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।[১]

---

১. মিসরের বর্তমান অবস্থা যা বর্ণিত হয়েছে তা মাওঃ ওয়াযিহ রশিদ নদভী (শিক্ষক, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা ও সম্পাদক আররাইদ)-এর লেখা যা তিনি এই গ্রন্থকারের আদেশ মত এই নতুন এডিশনের জন্য লিখে পাঠিয়েছেন।

কিন্তু মিসরের জন্য শক্তির উৎস হতে সাহায্য পাওয়া মিসরের ইসলামী প্রাণ ও তার অস্বাভাবিক অবস্থা ছিল না। কারণ দীনী মন-মানসিকতা নিশ্চিতভাবে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। যে দেশকে ইসলামের কেন্দ্র বলা হতো আমরা কামনা করি, সে দেশ আরব জগতের নেতৃত্বের সবচেয়ে বেশি যোগ্য ও নতুন শক্তি হয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করবে।

সিরিয়া ও ইরাক

ফ্রান্স ও বৃটিশের অধীনতা হতে স্বাধীন হওয়ার পর মুসলিম জনসংখ্যা[১] গরিষ্ঠ এই দু'টি শ্যামল ও উর্বর দেশে ইসলাম ও সভ্যতার গৌরবজনক ইতিহাস রয়েছে। এ দেশ দু'টি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইসলামী খিলাফতের কেন্দ্র ছিল। উভয়েই বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী বিপ্লবসমূহের কবলে পতিত হয়। এই উভয় মুসলিম আরব দেশ পাশ্চাত্যের গভীর চারিত্রিক ও সামাজিক প্রভাবের কবলে ছিল। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের রাজনৈতিক নেতাগণের ও শাসকশ্রেণীর ঝোঁক সব সময় আরব জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা (সেক্যুলারিজম) ও আধুনিকতার দিকে প্রবল। ক্রমশ পাশ্চাত্যমুখী হয়ে পড়েছে। তারা যদিও উভয় দেশের জনগণ সরল সহজ খাঁটি মুসলমান ও দীনের প্রতি ভালবাসা রাখে।

বহু প্রাচীন ঐতিহ্য ও কিংবদন্তীর এই উভয় দেশ। এমন অনেক প্রতিভাশালী, বুদ্ধিমান আলিম ও বিখ্যাত জ্ঞানী এই দুই দেশে বর্তমানে আছেন যাদের সমকক্ষ অন্য দেশে পাওয়া কঠিন। কিন্তু ক্রমশ সাধারণ সমাজ হতে দীনের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যাচ্ছে এবং আলিম ও দীনদারদের ক্ষমতা পতনের দিকে। মহিলাদের মধ্যে স্বাধীনতা, পর্দাহীনতা ও প্রচলিত রীতিনীতি বিস্তার লাভ করছে। কালচারাল প্রোগ্রাম, অশ্লীল আমোদ-প্রমোদ, পুরুষ ও নারীর অবাধ মিলন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। সহশিক্ষার রেওয়াজ সাধারণ রীতিনীতিতে পরিণত হচ্ছে। সেখানে ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্টি ও ধর্মহীন ব্যক্তিগণ প্রভাবশালী ও জীবন ব্যবস্থার ওপর ক্ষমতাশালী হতে শুরু করেছে।

এই দুঃখজনক অবস্থার শেষ পরিণতি এই যে, এই ছত্রসমূহ লেখার সময় খাঁটি ইসলামী আকীদার এই দুই দেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ এই দুই

১. সিরিয়ার মুসলমান শতকরা ৯০% এবং ইরাকের শতকরা ৯৩%।

দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ 'নুসাইরীদের' ক্ষমতাধীন রয়েছে। এরা সঠিক ইসলামী শিক্ষার প্রভাব কোন সময় গ্রহণ করেনি। এই সংখ্যালঘু দল মুসলিম জনগণের পক্ষ হতে সর্বদা ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ পেয়ে এসেছে। তারা সেনাবাহিনীতে যোগদান করে সামরিক শক্তি অর্জন করেছে। ফলে অন্যদের তুলনায় শক্তিশালী হয়েছে এবং ক্ষমতা দখল করেছে। পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকবৃন্দ তাদেরকে সঠিক শিক্ষা ও তাদের দীনের প্রচার-প্রসারে উদ্যোগী হয়নি। ফলে এই দল সব সময় দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপদ হয়ে রয়েছে এবং অনৈসলামী বাইরের শক্তিসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্ব[১] করতে তৎপর হয়েছে।

এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই যে, বাথ পার্টি বহু দিন যাবৎ ইরাকের রাজনীতি ও শাসনের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে এবং এই ছত্রসমূহ লেখার সময় পর্যন্ত সিরিয়ার ওপর এই পার্টির শাসন কায়েম রয়েছে। এই পার্টির কর্মসূচি ও দলীয় ঘোষণা এই :

আরব জাতি এক চিরস্থায়ী বার্তাবাহক। তারা পৃথিবীর ঐ অংশকে নিজেদের আরব দেশ বলে মনে করে যেখানে আরব জাতি বসবাস করে। এ অঞ্চলটি তুরুস পর্বত ও আর্সেনিয়া পর্বতমালা, বসরার উপসাগর, আরব সাগর, আবিসিনিয়ার পর্বতশ্রেণী, আফ্রিকার বৃহৎ বন ও মরু অঞ্চল (যাকে সাহারা বলা হয়), আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যখানে অবস্থিত।

নিম্নে পার্টির কর্মসূচির কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেয়া যাচ্ছে, যা দ্বারা ঐ পার্টির চিন্তা ও মন-মানসিকতা অনুমান করা যেতে পারে :

১. আরব জাতি একটি সভ্যতার ধারক-বাহক, তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য[১] রয়েছে, তা অতি নগণ্য ও ভিত্তিহীন, যা আরবীয় অনুভূতি জাগরণের সাথে আপনাআপনিই বিদূরিত হবে।

২. আরব জাতি একটি চিরস্থায়ী বার্তাবাহক যা ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত ও পরিপক্ব হওয়ার মাধ্যমে বহু আকারে প্রকাশ পায় এবং মানবতার মর্যাদায় নতুনত্ব আনয়ন করে। মানবগোষ্ঠীর উন্নতির উৎসাহ দেয় এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রেও প্রায় অভিন্ন উৎসাহ বৃদ্ধি করে।

---

১. এর বিস্তারিত বিবরণ ইবন কাসীর-এর 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিয়াহা'-তে শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার ইতিবৃত্তে, শেখ আবূ যোহরার কিতাব ইবন তাইমিয়া ও গ্রন্থকারের কিতাব সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, ২য় খণ্ডে পাওয়া যাবে।

৩. বার্থ পার্টি একটি জাতীয়তাবাদী পার্টি, যে পার্টি বিশ্বাস রাখে যে, জাতীয়তাবাদী অনন্তকালের একটি জীবিত প্রকৃতি এবং এও বিশ্বাস রাখে যে, তা জ্ঞানসম্পন্ন জাতীয় অনুভূতি, যা ব্যক্তিকে দলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। এটা এক পবিত্র অনুভূতি ও জ্ঞান যা সৃজনশীল শক্তিসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ, ত্যাগের জন্য উৎসাহ দানকারী, সচেতনতা সৃষ্টিকারী, ব্যক্তির মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য কার্যকর ও উপকারী পরিচালন শক্তি উদ্ভাবনকারী।

৪. বার্থ পার্টি একটি সমাজতান্ত্রিক দল। এর আকীদা হল, সমাজতন্ত্র এমন এক প্রয়োজন যা আরব জাতির অন্তরে সৃষ্ট ও প্রতিপালিত। এটা এক সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি, যাতে আরব জাতির যোগ্যতা ও জ্ঞানকে পরিপূর্ণতা দান করার উপায় ও উপকরণ রয়েছে।

৫. জাতীয় সম্বন্ধই আরব শাসনের এক চিরবিদ্যমান সম্বন্ধ, যা দেশবাসীর মধ্যে অভিন্ন অভিপ্রায় ও ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে এবং সকলকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারে এবং তা ধর্মীয়, গোষ্ঠী, পরিবার, বংশগত ও আঞ্চলিক গোঁড়ামির সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধরত।

৬. সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে আরব রাষ্ট্রের জন্য একই বিধান প্রস্তুত করা হবে যা বর্তমান যুগের আত্মার অনুরূপ এবং আরব জাতির অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত।[২]

এই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও মস্তিষ্ক এক খৃস্টান পণ্ডিত মিশাল 'আফলাক'। তিনি নিজ গ্রন্থ 'ফীসাবীলিল বা'ছ'-এ নিজের চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তা থেকে নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো :

এটা স্বভাবতই সম্পূর্ণ সম্ভব যে, যে কোন ব্যক্তি যতই সীমাবদ্ধ যোগ্যতার অধিকারী হয়ে মুহাম্মদ ﷺ-র নগণ্য, অস্পষ্ট প্রতিরূপ (সদৃশ) হতে পারে যদি সে এমন এক জাতির সাথে সম্পর্ক রাখে যে জাতি নিজের সমস্ত শক্তি ও যোগ্যতাকে একত্র করে মুহাম্মদ ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন অথবা আরো ন্যায্য বর্ণনায় বলা যায়, তখনই কোন ব্যক্তি ঐ জাতির একজন হবে যার জন্য মুহাম্মদ ﷺ নিজ সমস্ত শক্তি একত্র করেছেন এবং একে সৃষ্টি করেছেন। অতীতে এক ব্যক্তির মধ্যে পুরো

১. যেমন ধর্মীয় পার্থক্য।

২. আল-আহ্‌যাবুস সিয়াসিয়া; ফী সুরিয়া গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

জাতির জীবন প্রতিফলিত হয়েছিল এবং আজ প্রয়োজন হলো গোটা জাতি উন্নতির রাজপথে পদচারণা করে ঐ মহান ব্যক্তিত্বের জীবনের ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণ হয়ে যাওয়া। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-ই পূর্ণ আরব ছিলেন। আজ সম্পূর্ণ আরবকে মুহাম্মদ ﷺ হতে হবে।[১]

ইসলাম জয়যুক্ত ও প্রভাবশালী হতে এত বিলম্ব হয়েছে তার প্রকৃত কারণ ছিল এই যে, আরবগণকে নিজেদের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সাধনা, অস্তিত্ব রক্ষায় দুনিয়ার নানাবিধ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা, বহু বিপদাপদ ও কষ্ট, আশা-নিরাশা, সফলতা ও অকৃতকার্যতার পর মূল প্রকৃতি পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে অর্থাৎ ঈমান যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়। আর সর্বোপরি তা প্রকৃত ঈমান হতে হবে। এই হিসেবে ইসলাম একটি আরবীয় আন্দোলন ছিল এবং এর অর্থ ছিল আরবকে নতুনত্ব ও পূর্ণতা দান করা।[২]

ইসলাম আরব জাতির স্থায়িত্ব লাভের ও বিকাশের উত্তম প্রকাশ এই হিসেবে ইসলাম মূলসূত্রে আরবী ও নিজ আদর্শগত উদ্দেশে মানবীয়। সুতরাং ইসলাম হচ্ছে মানবীয় ও আরবীয় চরিত্রের।[৩]

এ কারণে ঐ তাৎপর্য– যা এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুগে এবং উন্নতি ও পরিবর্তনের এই কঠিন স্তরে ইসলাম প্রকাশ করে– তা এই যে, সমস্ত শক্তি আরবদের শক্তি বাড়াবার ও আরবদেরকে উন্নত করার জন্য ব্যয় করা হোক এবং এ সমস্ত শক্তি আরব জাতীয়তার সীমার মধ্যে সীমিত থাকুক।[৪]

ইউরোপের খাঁটি জাতীয়তাবাদের দর্শন যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখন সেখানে জাতীয়তা ও ধর্ম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া একটি মীমাংসিত বিষয়। কারণ ইউরোপে ধর্মকে বাইরে থেকে আমদানি করা হয়েছে এবং তা তাদের স্বভাবও ইতিহাসের জন্য ভিনদেশী। তদুপরি তা পরকালের আকীদা ও নৈতিকতার সংক্ষিপ্তসার যা তাদের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীলও নয় এবং তাদের ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন যোগসূত্রও নেই। এর বিপরীতে ইসলাম আরবদের জন্য কেবল পরকালের আকীদা অথবা কতক চারিত্রিক বিষয়ের সংমিশ্রণ নয়, বরং এটা জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে তাদের অনুভূতির

---

১. আল-আহযাবুস সিয়াসিয়া; ফী সুরিয়া গ্রন্থ থেকে গ্রহীত, ৪৫ পৃ. ।
২. ঐ, ৪৬ পৃ.।
৩. ঐ, ৪৭ পৃ. ।
৪. ঐ, ৪৮ পৃ.।

বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এবং তাদের ব্যক্তিত্বের একমাত্র শক্তিশালী বর্ণনা যা শব্দ চিন্তা ও জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত ও মিলিত।[১]

সিরিয়ার অসহায় অবস্থা ও বা'থ পার্টির অকৃতকার্যতা

দুর্ভাগ্যবশত চিন্তার এই পদ্ধতি ও এই জীবন-দর্শন সিরিয়ার সৈনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদদের মধ্যে ক্রমশ স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেশের অধিবাসীরদের যে সকল লোক বিভিন্ন আকীদা ও ধর্মের অনুসারী ছিল এবং প্রথম থেকে সেনাবাহিনীর ওপর প্রভাবশালী ছিল তারা তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল। অতীতের কয়েক বছর হতে সিরিয়ার ওপর এই পার্টি ও ঐ চিন্তাধারার অনুসারীদের ক্ষমতা চলে আসছিল। ধর্মহীন রাজনীতি, আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রভাব দেশের ওপর এতই শক্তিশালী ও দৃঢ় ছিল যে, ইসলামপ্রিয়দের বা অন্য কোন চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষকদের ঐ দেশে থাকা বা ঐ ধরণের চিন্তাধারা প্রচার করা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছিল এবং তাদের বহু লোক দেশত্যাগ করে অন্য আরব দেশ অথবা ইউরোপে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

সিরিয়া এক সময় দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী চিন্তা, গবেষণার জন্য মিসরের পর দ্বিতীয় কেন্দ্র বলে গণ্য হতো, বর্তমানে তারা নিজ গর্বের সামগ্রী 'আলিম, চিন্তাবিদ, লেখক ও ধর্মীয় নেতাদের থেকে বঞ্চিত। ফলে দেশের ক্ষমতা ঐ সকল যুবক শ্রেণীর হাতে এলো যাদের পরিপক্ব মনোভাব ছিল না, পরিচালনার অভিজ্ঞতাও ছিল না, সংযতচিত্ততাও ছিল না। এদেশ এক সময় সচ্ছলতা ও উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, এখন তা জীবনোপকরণের ব্যাপারে দুরবস্থায় পতিত হলো। দেশের সম্পদের এক বড় অংশ প্রতিদিনের হাঙ্গামার ভয়ে বাইরে স্থানান্তরিত হলো। জাতীয়তা, খাঁটি বস্তুবাদী চিন্তা ও সমাজতন্ত্রের নেশা এত তীব্র হয়ে গিয়েছে যে, যুবক লেখকগণ ও সরকার সেনাবাহিনীর কোন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির দীনী ভাবধারা ও আসমানী দীনসমূহের সাধারণ স্বীকৃত ও প্রমাণিত বস্তুসমূহের প্রতি প্রকাশ্যে হাসি-ঠাট্টা করা থেকে বিরত থাকেনি। এই প্রবণতা ও চিন্তাধারার কিছু নমুনা সিরিয়ার সরকারি সেনাবাহিনীর (জায়শুশ শু'আব) পত্রিকার একটি প্রবন্ধে দেখা যেতে পারে, যা জনৈক সৈনিকের লিখিত। এখানে তার কতক অংশ পেশ করা হলো :

আরব জাতি ইলাহ (উপাস্য) হতে সাহায্য চাইল, ইসলাম ও খ্রীস্টীয় পুরাতন মূল্যবোধসমূহকে যাচাই করল, জায়গীরদারী পদ্ধতি ও পুঁজিবাদী পদ্ধতি হতে

---

১. আল-আহযাবুস সিয়াসিয়া; ফী সুরিয়া গ্রন্থ থেকে গ্রহীত, ৪৯ পৃ. ।

সাহায্য চাইল, মধ্যযুগের কোন কোন প্রসিদ্ধ নীতির পরীক্ষা করা হলো, কিন্তু এগুলো দ্বারা তাদের যৎসামান্য উপকারও হয়নি। তারপর আরব জাতি খুব সাহসের সাথে দৃষ্টি উচ্চ করে বহু দূর পর্যন্ত দেখতে লাগল এবং তাদের নবজাত শিশুকে দেখবার চেষ্টা করল যা ক্রমশ তাদের নিকটবর্তী হচ্ছিল, এই নবজাত শিশু হলো "নতুন সমাজতন্ত্রের আরবীয় মানবগোষ্ঠী"। যে সমস্ত রোগ ও দুর্বলতা সমাজে পাওয়া যাচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে জায়গীরদারী, পুঁজিবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তির সৃষ্টি করা। ঐ সমস্ত মূল্যবোধ আরবীয় মানবকে ধীর গতিসম্পন্ন, অলস, সাহসহীন, অকর্মণ্য ও তকদীরের সম্মুখে মাথা নতকারী বানিয়েছে যা এমন এক মানব যে কেবল 'لا حول ولا قوة الا بالله العظيم' জপতে জানে।

নতুন আরবীয় মানব নতুন মূল্যবোধসমূহ সৃষ্টি করবে, তা এক অত্যাচারিত ও বিদ্রোহী মানুষ হতে প্রকাশিত। সে একজন ক্ষুধার্ত নতুন বিপ্লবী এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। নতুন সমাজ হবে তাদের সৃষ্টি, যে সমাজ কেবল মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখবে।

আরব সভ্যতা ও আরবীয় সমাজের গঠন ও আকৃতি দানের একমাত্র পন্থা হলো এই নতুন সমাজতন্ত্র যা আরবীয় মানবেরই সৃষ্টি, যার আকীদা হবে আল্লাহ জায়গীরদারী, পুঁজিবাদী উপনিবেশ ইত্যাদি, যেগুলো পুরনো সমাজের শাসক ও কর্তা ছিল। তারা কেবল ইতিহাসের যাদুঘরে মমীকৃত লাশরূপে সংরক্ষিত থাকবে।

আমরা যখন এই শর্ত আরোপ করি যে, আমাদের নতুন মানুষের জন্য পূর্বের সমস্ত মূল্যবোধ ও রীতিনীতি অস্বীকার করতে হবে, তখন আমাদের কর্তব্য হবে তাদেরকে কিছু নতুন নির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও রীতিনীতি দেয়া। তা হলো মানবের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন। যে মানব কেবল নিজের অস্তিত্বের ওপর, নিজ কর্মের ওপর ও এই জিনিসের ওপর যা মানবতা দান করে, ভরসা রাখে। যে কারণে সে জানে যে, তার অপরিহার্য পরিণতি মৃত্যু, মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। তৎপর দোযখেও হবে না, বেহেশতেও হবে না, বরং সে এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু হয়ে যাবে যা জমিনের সাথে ঘূর্ণন করতে থাকবে। এ কারণে সে বাধ্য যে, যা কিছু তা দ্বারা হতে পারে কোন পারিশ্রমিক ও বিনিময় ছাড়াই (যথা: বেহেশ্তের মধ্যে কোন একটি ছোট স্থান) নিজের জাতি ও নিজের মানবতাকে প্রদান করে।[১]

---

১. ইব্রাহীম খল্লাসের লিখিত জাইশুশ শু'আব, দামেশক পত্রিকার "আল ইনসানুল আরবী আল জাদীদ' শিরোনামের প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ঠিক আবেগময় উদ্যম, যৌবনকালে ইসরাঈল ও আরবের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সিরিয়াকে সামনাসামনি ঐ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, যে শত্রুকে সে ধমকের সুরে, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধে আহ্বান করছিল যার মুকাবিলা করা ও যাকে আঘাত হানার জন্য জাতীয়তাবাদী আরব উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার দিচ্ছিল। তার সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধল। কিন্তু এই যুদ্ধের ফল হলো সিরিয়া নিজের সীমান্ত রক্ষা করতে পারল না। কেবল তাই নয়, বরং শত্রু তার দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বহু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেল এবং আরবগণ ইসরাঈলের কোন ক্ষতি করতে পারল না। এখন তারা অসহায় অবস্থায় সমাজতন্ত্রের নেতা ও জাতীয়তাবাদী আরব পতাকাধারীরদের কাছে সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারিত করছে। জীবনোপকরণ সংগ্রহে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও সামরিক কর্মকাণ্ডে তারা এখন শ্রান্ত, ক্লান্ত ও দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত রয়েছে। এটা ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন যে, তারা এই কঠিন অবস্থা হতে কি করে নিষ্কৃতি পাবে। তার সঙ্গে সিরিয়ার যুবকগণ যাদের মধ্যে ঈমানের স্ফুলিঙ্গ রয়েছে, যারা সহজে এই দেশকে ধর্মহীনতা, ধর্ম ও পার্থিব ক্ষতির কবলে নিপতিত অবস্থায় দেখতে চাইনা, তারা প্রাণপণ সাধনায় ব্রতী হয়েছে। শিক্ষিত যুবক ও শিক্ষিতা যুবতীদের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক দীনের জাগরণ সৃষ্টি হচ্ছে। এই জাগরণ ও অসন্তুষ্টিকে দলিত ও পিষ্ট করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে ঐ সমস্ত কাজ করা হচ্ছে যা সম্ভবত সর্ববৃহৎ ইসলামবিরোধী শক্তিও করত না।

আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা, বিশ্বাসহীনতা ও নিরাশা

এই গ্রন্থকারের (১৩৯৩ হি. রজব মোতাবেক ১৯৭৩ খ্রী, আগস্ট) সিরিয়া ভ্রমণের ও দামিস্কে কিছু সময় অতিবাহিত করার সুযোগ হয়েছিল এবং এই ভ্রমণে অর্জিত অনুভূতি 'কাবুল নদী হতে ইয়ারমুক নদী' পর্যন্ত গ্রন্থের লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে এই বিপদের ইঙ্গিত রয়েছে, যা গ্রন্থকার পূর্বের আলোচনাসমূহে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ সিরীয় জাতির সমাজতন্ত্র দ্বারা কোন উপকার না হওয়ার কথা। গ্রন্থকার সেখানে উল্লেখ করেছিলেন :

ঐ সমস্ত নেতার চিৎকার ও আওয়াজ ছিল রুটি, ক্ষুধার্তদের জন্য এক গ্রাস খাদ্য, জাতির মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা, ছিন্নমূল মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ। তাদের দৌড়াদৌড়িও এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই ছিল। যখন এ সব উদ্দেশ্যই অর্জিত হলো না তখন এর স্পষ্ট অর্থ হলো, পর্বত খনন দ্বারা তৃণখণ্ড বের

করা। সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও কম্যুনিজম– এ সবই জ্ঞান ও মানবতাবিরোধী এক দর্শন ও জীবন পদ্ধতি মাত্র যা কেবল একটি চমকপ্রদ বিশ্বাস, আত্মতৃপ্তি ও আবেগময় উচ্চাশার ওপর প্রতিষ্ঠিত। একে জ্ঞান, কর্মৎপরতা, অভিজ্ঞতা ও ফলাফলের কষ্টি পাথরে যাচাই করা যেতে পারে না অথবা তা নেতিবাচক নীতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যার উদ্দেশ্য বিধ্বস্ত করা অথবা নীতি হতে পলায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়।[১]

গ্রন্থকার এই ভ্রমণকালে বাগদাদ দেখেছেন এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখেছেন। এখানে এর কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা যাচ্ছে :

আমি বাগদাদের রাস্তায় টহল দিচ্ছিলাম, লোকের কথা শুনছিলাম এবং তাদের চেহারার দিকে তাকাচ্ছিলাম। অতঃপর এই ভ্রমণের কোন কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার আলোকে আমার এরূপ অনুভব হচ্ছিল যে, আব্দুল করীম কাসিমের বিপ্লবের পূর্বে দেশ অনেক ভাল অবস্থায় ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, জাতি বর্তমানের চেয়ে অধিক স্বাধীন ছিল, নিশ্চিন্ত ও আত্মবিশ্বাসী ছিল। ১৯৫৬ খ্রী. যখন আমি বাগদাদ গিয়েছিলাম তখন কোন চাপ, ভীতি, বাধ্যবাধকতা ও পাহারার সম্মুখীন হইনি। আমি পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে বাগদাদের অভ্যন্তরে ও বাগদাদের বাইরে ঘোরাফেরা করেছিলাম। যার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হতো দেখা করতাম এবং যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা করত বিনা বাধায় দেখা করত। কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হতো না। অবশেষে এই সমস্ত দেশের এই সকল ভয়ানক বিপ্লব দ্বারা কি উপকার হয়েছে? অথচ তা সংঘটিত হয়েছিল অবস্থাকে সংশোধন করা, জাতিকে অত্যাচার, অবিচারের লৌহশৃঙ্খল হতে মুক্তি দেয়া এবং এর স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।[২]

এ বিপ্লবের কারণে ইরাকের বিরাট ক্ষতি হয়েছিল। যা সামান্য বাকি ছিল ১৯৮০ খ্রী. অক্টোবর মাসে ইরান আক্রমণ করে তা পূর্ণ করেছিল যার ফলে উভয় দেশের ধ্বংস এবং ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্নাম ও অপমান ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

---

১. কাবুল নদী হতে ইয়ারমুক নদী পর্যন্ত, ১৭২ পৃ. (দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক)।
২. ঐ, ২০১-২০২ পৃ.।

ইরান

ইরানও তুরস্কের অনুসরণ করে নিজ দেশের মানসিকতার ও সভ্যতা সংস্কৃতির পরিবর্তন করার চেষ্টায় সংস্কারের কাজ আরম্ভ করেছিল। এ কাজের সূচনা সাবেক ইরানের বাদশাহ রেযা শাহ্ পাহলভী (১৯২৪-১৯৪১ খ্রী.) নিজ শাসন আমলে করেছিলেন এবং এর জন্য কিছু চিন্তা-ভাবনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর (George Lenczowski) নিজ গ্রন্থ The Middle East in World Affairs-এ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার বিবরণ পেশ করেছেন : রেযা শাহ্ পাহলভীর সংস্কারের পরিকল্পনা ইরানের শিল্প উন্নতির মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি দেশকে শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের সমপর্যায়ের ও আধুনিক বানাতে চেষ্টা করেন। ১৯২৭ খ্রী. তিনি ফ্রান্সের বিচার বিভাগীয় রীতি ও আইন জারি করেন। এভাবে তিনি সমাজ ও নগরের ব্যাপারে দেশীয় বিচারালয়ের যোগ্যতা ও পারদর্শিতার প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদর্শন করেছেন। দেশকে ধর্মহীন বানাবার ঝোঁক তার মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেখা গিয়েছিল কিন্তু তিনি তা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেননি যেভাবে তুরস্কে করা হয়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, প্রগতিবিরোধী শী'আ আলিমগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেশকে পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালাই করার কাজে প্রতিবন্ধক হবে।

কাজেই তিনি খুব সাবধানতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। ১৯২৪ খ্রী. গণতন্ত্রের জন্য যে বাদানুবাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল, তার অকৃতকার্যতা ও প্রতিবেশী দেশ (আফগানিস্তান)-এর শাসনকর্তা আমীর আব্দুল্লাহ খান যে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, তার ব্যর্থতা হতে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করলেন যে, যা এক অর্ধ-পাশ্চাত্য দেশ তুরস্কে করা সম্ভব হয়েছিল, তা বর্তমানে ইরানে করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া ইরানের সংবিধানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ ছিল যে, ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। আর স্বীকৃত দল ছিল জা'ফরী শী'আদল। বিধান মতে শাহে ইরানকে ঐ আকীদার অনুসরণকারী ও ঐ আকীদার প্রচারক হতে হবে।

এই বিধান অনুসারে ইরানী আইনসভার (ইরানী পার্লামেন্ট) এমন কোন আইন অনুমোদন করার অধিকার নেই যা ইসলামের মূল রীতিনীতির বিপরীত। কোন আইন অনুমোদন করতে হলে ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকদের অভিমত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ সমস্ত ধাপ অতিক্রম করার পরই আইন প্রণয়ন করা যাবে। শাহের এই কথা জানা ছিল যে, তিনি এ সমস্ত আইনের ধারাসমূহের বিরুদ্ধাচরণ

করতে পারেন না। এ কারণে তিনি সম্মুখে এসে আক্রমণ করার পরিবর্তে রাজনৈতিক কায়দায় কাজ করলেন। তিনি ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়ে তাদের প্রতি গুরুত্ব না দেয়াই বেশি সমীচীন মনে করলেন।

আধুনিক যুগের শিক্ষা পদ্ধতি স্থাপন করা ও মহিলাদের মধ্যে স্বাধীনতার আগ্রহ ও জাগরণ সৃষ্টি করার জন্য যে কোন চেষ্টার সফলতা নির্ভর করত ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম হওয়ার ওপর। এ উদ্দেশে যুদ্ধের আমলে সুন্দর কাজ করা হয়েছে।

১৯৩০ খ্রী. থেকে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী স্কুলসমূহে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক রইল না, ঐচ্ছিক করা হলো। পাঠ্য তালিকায় দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধক অনুভূতি সৃষ্টির ওপর জোর দেয়া হলো। খেলাধুলাকে উৎসাহিত করা হলো। আধুনিক ধরনের স্টেডিয়াম বড় বড় শহরে প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হলো। সরকার বয়স্কাউট ও গার্লস গাইড সংগঠনে অংশ গ্রহণ যুবক-যুবতীদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিল যেন নতুন প্রজন্মে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়! এ সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ্যভাবে দেশের যুবকদেরকে ধর্মীয় কাজকর্মে ও ধর্মীয় নীতিতে চিন্তা-ভাবনা করা হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

১৯২৮ সালে প্রাচ্য (মুসলিম) পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ধর্মীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তির ওপর ভীষণ আঘাত হানা হলো। তুর্কী টুপি ও পাগড়ির পরিবর্তে প্রথমে পাহলভী হ্যাট ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হলো। কিছুদিন পর ইউরোপীয় হ্যাট তার স্থান দখল করল। শাহ্ মহিলাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও জাগরণ আনার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। শাহের ইঙ্গিত ও প্রভাবে পার্লামেন্টের মাধ্যমে তালাক দেবার ক্ষমতা যা পুরুষের অধিকার ছিল, তা সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করে দেয়া হলো।

মহিলাদের জন্য বিভিন্ন অফিসে ও প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার সুযোগ সৃষ্টি করা হলো, যদিও রাজনৈতিক উৎসবে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার কখনও অধিকার ছিল না। সামরিক নেতা ও সরকারি পদস্থ কর্মচারীদেরকে উপদেশ দিয়ে মহিলাদেরকে পাশ্চাত্য পোশাক গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হলো। ১৯৩৫ সালে ইরানের রাণী নিজে ও রাজকন্যাগণ পাশ্চাত্য পোশাক পরিধান করে এক সাধারণ উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। তখন হতে বোরকা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হলো। এর ফলে কিছু

বিবাদ সংঘটিত হয়। কিন্তু সরকারি ব্যবস্থা খুব কড়া ছিল। শেষ পর্যন্ত সকলকে আইনের সম্মুখে মাথা নত করতে হলো।

শাহের পক্ষ হতে ভাষার ওপরও পুনর্বিবেচনার কাজ আরম্ভ হলো। এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ফার্সী ভাষাকে আরবী ভাষার প্রভাব হতে মুক্ত করা, এটা ইরানের সাহিত্য পরিষদের (Academy of Literature) যা ১৯৩৫ খ্রী. স্থাপিত হয়েছিল, এক বিশেষ কাজ বলে গণ্য হলো। আরবী লিপি ফার্সী ভাষার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে না এ সত্ত্বেও তা বদলানো হয়নি। যেমন তুর্কিতে করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে সরকারিভাবে এই দেশের নাম ফারেস অথবা পার্শিয়ার পরিবর্তে (যা গ্রীকদের রাখা নাম ছিল)[১] ইরান রাখা সাব্যস্ত হয়েছিল।

মুহাম্মদ রেযা শাহ্ পাহলভী বর্তমান (তৎকালীন) ইরানের সম্রাটের ধারণা মতে তখন অনেক সংস্কার ও পরিবর্তনের সময় এসেছে। তাই তিনি কোন কোন নতুন আইন ও সংশোধনকে সংবিধানের মর্যাদা দেন। তিনি জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, জমিনের মালিকদের মালিকানা স্বত্ব রহিত করা, মহিলাদের ভোট দেয়ার অধিকার ও মহিলাদের নির্বাচিত হওয়ার অধিকারকে সংবিধানগত আইনের মর্যাদা দিয়েছিলেন। ইরানের আলিম ও মুজতাহিদগণ (ইসলাম ধর্ম জ্ঞানে সুপণ্ডিতগণ) এর বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিবাদ করেছিলেন। দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল, কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন হয়নি।[২]

উজ্জ্বল দিক

কিন্তু ইরান ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইসলামী চিন্তা ও অভিজ্ঞতার এক বড় ক্ষেত্র ছিল। ইরানকে তার কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও সূফী সাধকবৃন্দের কারণে– যাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন– ইসলামী প্রাচ্যের গ্রীক বললেই চলে। সেখানে ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণার লোক থাকা সত্ত্বেও– যা ইরানের অতীত ইতিহাসের প্রাকৃতিক ফল– ইসলামকে জীবিত করা এবং ইসলামী একতার আন্দোলনে উৎসাহ দানের গভীর আগ্রহ সেখানে লক্ষ্য করা যায়। ফলে ইরানের উৎসাহব্যঞ্জক, উদ্যমশীল ও প্রাণবন্ত ইসলামী সাহিত্য অধিক হারে সমাদৃত হতে দেখা যাচ্ছে।

---

১. পুরাতন আরবী ইতিহাস ও ইসলামী সাহিত্যে এই দেশের নাম ফারেস লিখিত হয়েছে।

২. The Middle East in World Affairs, p. 180.181,182 .

ইরানে ইসলামী বিপ্লব

ইরানে বাদশাহের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণসমূহের প্রতি যদি গভীর মনোনিবেশ করা হয়, তাহলে এর প্রকৃত কারণ বোঝা যায় যে, বাদশাহ ইরানী জনসাধারণের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অনুভূতি ও চাহিদার প্রতি আঘাতমূলক কর্ম পদ্ধতি পরিচালনা করেন। ফলে তা তার সমস্ত খেদমত ও সামরিক কর্মতৎপরতা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার সমস্ত চেষ্টাকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ইরানের ঘটনাবলী এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, দেশের জনগণের আবেগ, উদ্যমকে ঘায়েল করে কোন নেতৃত্ব দেশের উন্নয়নে তার যতই অবদান থাকুক, স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।

বাদশাহ তার আমলের শেষ দিকে ইরানকে সামরিক দিক দিয়ে এত শক্তিশালী করেছিলেন যে, ঐ এলাকায় ইরান এক বড় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া শাহে ইরান রাজনৈতিক বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং দেশ অভাবশূন্য অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। নব্য সভ্যতার মাপকাঠিতে ইরান উন্নত দেশসমূহের মধ্যে গণ্য হচ্ছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে ঐ এলাকায় ইরান বহু দেশ হতে অগ্রবর্তী ছিল। ছাত্রদের এক বড় দল বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা পাচ্ছিল।

এই অবস্থাতে দেশকে কোনরূপেই সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ বলা যেতে পারে না। এজন্য জনসাধারণের অসন্তুষ্টির কারণ অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতা বলা যেতে পারে না। কেবল রাজতন্ত্র এর কারণ হতে পারে না। কেননা কোন কোন উন্নত দেশেও বর্তমানে রাজতন্ত্র রয়েছে, সেখানে কোন অসন্তুষ্টি দেখা যায় না। এ কারণে কেবল রাজতন্ত্র এই রাজনৈতিক মহাবিক্ষোভের কারণ বলে গ্রহণ করা যায় না। এটাও মনে রাখা উচিত যে, ইরানী জাতির স্বভাবে ব্যক্তিপূজার নিদর্শন প্রতি যুগেই পাওয়া গিয়েছে এবং রাজতন্ত্র এই স্বভাবের অনুকূল ছিল। তবে এই রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণ কি ছিল?

রাজনৈতিক তৎপরতায় যে ধ্বনি সবচেয়ে অধিক প্রভাব বিস্তারকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং যে ধ্বনি সমগ্র দেশকে শাহে ইরানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, তা কেবল ইসলামী হুকুমত বা বিধানের প্রতিষ্ঠিত করার ধ্বনি। এ বিপ্লবী আঘাত রাজতন্ত্রের কারণে ততো পড়েনি যত পড়েছে বাদশাহের ধর্মবিরোধী

রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার কারণে। বাদশাহকে ইসলামী নীতি স্থাপনের জন্যই ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ দেশে দীন ও ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল তা বাদশাহ্ ও তার সঙ্গীদের পাশ্চাত্যের দাসত্বের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল।

বাদশাহের শিক্ষা-দীক্ষা অনৈসলামী পরিবেশে হওয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও এর জীবন সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণাকে ইরানে প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি তার আমলে এমন কতক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যা ধর্মীয় রীতিনীতিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে পারে এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বকে শেষ করে দিতে চায়। ইয়াহূদী ও বাহাঈদের ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে তিনি দেশ পরিচালনার ভার ইসলামের শত্রু শক্তিবর্গের হাতে দিয়েছিলেন। জাতির ইসলামের সাথে সম্পর্ক শেষ করার জন্য যেভাবে মিসরের শাসকবর্গ মিসরের ফেরআউনের সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, অনুরূপভাবে বাদশাহ ও তার সম্পর্ক সাইরাসের সাথে করেছিলেন। এর জন্য তিনি একটি ঐতিহাসিক উৎসব উদ্‌যাপন করেন। এতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেন। ইসলামী বর্ষপঞ্জীর স্থলে তিনি পুরান ইরানী বর্ষপঞ্জীর প্রচলন করেন।

ইরানী জনগণ সব সময় তাদের 'আলিম সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকত। শাহে ইরানের প্রগতিমূলক কার্য প্রণালীসমূহের অধিক বিরোধিতা সব সময় আলিমদের পক্ষ হতে হতো। আলিমদের প্রভাবকে শেষ করার জন্য শাহে ইরান ওয়াক্‌ফসমূহ পরিচালনার আইন পরিবর্তন করেছেন। প্রভাবশালী 'আলিমদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। বহু সংখ্যক 'আলিমকে গ্রেফতার করা হলো। ইসলামের সমর্থনে যারা কর্মতৎপর হলেন তাদের শাস্তি দেয়া হলো। এতে হাজার হাজার প্রাণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কিন্তু শাহের এই কঠোরতা জনগণের আবেগ-উদ্যমের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দিল। অতঃপর আয়াতুল্লাহ খোমিনীর নেতৃত্বে যিনি প্যারিসে নির্বাসনের জীবন যাপন করেছিলেন, ইরানী জনগণ বৃহত্তম উৎসর্গ দিয়ে শাহে ইরানকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করল এবং ১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হলো।

আয়াতুল্লাহ খোমেনীর অদ্ভুত সফলতার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়। প্রথমে এই বিপ্লবকে বামপন্থী বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। শাহে ইরান প্রথমে একে বামপন্থী আন্দোলন বলে পিষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের

কিছুকাল পরই যে শক্তি পরীক্ষা হয় তাতে ইসলামপন্থী দল যাদের নেতৃত্ব 'আলিমগণ দিয়েছিলেন, তারা জয়ী হন। এ দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে, এই আন্দোলনের পশ্চাতে কেবল ইসলামী দলই ছিল। ইরানী আলিমদের বিচক্ষণতা, পরিচালনা শক্তি ও জনগণের ওপর তাদের আধিপত্য বিপ্লবের সফলতার প্রধান কারণ, যা একটি জ্বলন্ত সত্য। জনগণের আলিমদের সাথে এমনভাবে যুক্ত থাকা ও জনগণের বিরামহীন এই উৎসর্গ এমন এক ঘটনা যার নজীর পাওয়া যায় না বললে অত্যুক্তি হবে না।

আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর দৃষ্টিভঙ্গি

আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী ইরানী বিপ্লবের উজ্জীবিত প্রাণপুরুষ ছিলেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে এমন এক রাজনৈতিক নেতা যার আন্দোলনের ভিত্তি হলো ইসলাম। তার চিন্তাধারা অন্য 'আলিমদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন। তিনি ইবাদত হতে সমাজ গঠন সংক্রান্ত কার্যকলাপকে অধিক গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, ইবাদতের কল্পনা ইসলামী শিক্ষায় রয়েছে। ইসলামের এই অংশ (ইবাদত) জীবনে প্রতি যুগে প্রচলিত ও প্রকাশিত। কিন্তু জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি তার নিকট রাজনৈতিক জ্ঞান ও সমাজ সংস্কার ছাড়া সম্ভব নয়। তার নিকট শাসনকর্তা মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম, ইবাদতকে বিপদহীন মনে করে। এর মুকাবিলায় রাজনৈতিক জ্ঞানকে নিজের জন্য বিপজ্জনক মনে করে।

আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী নিজ গ্রন্থে 'ইসলামী হুকুমত'-এ তার বর্ণনা এভাবে দেন : রাজতন্ত্রের চেষ্টা এই যে, আমরা কেবল নামায-রোযা করতে থাকি এবং আমাদের জীবনে ইসলাম কেবল ইবাদত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে যেন এ দ্বারা আমাদের মধ্যে কখনও রাজনৈতিক সংঘর্ষ না হয়!

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদেরকে দাওয়াত দেয় যে, আমরা সকাল-বিকাল যত মনে চায় নামায পড়তে থাকি। আমাদের পেট্রোলের ওপর যেন তাদের অধিকার থাকে! আমাদের নামায দ্বারা তাদের কোনই ক্ষতি হয় না, যদি আমাদের বাজার তাদের পণ্যদ্রব্যের জন্য মুক্ত থাকে এবং আমাদের পুঁজি তাদের ব্যবসায়ীদের জন্য ও শিল্পসমূহের জন্য স্থায়ীভাবে প্রদান করা হয়। এ কারণে আক্রমণ করে তাদের আইন, তাদের জীবন ব্যবস্থা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয় এবং আমাদেরকে প্রবোধ দেয় যে, ইসলাম জীবনের জন্য অকর্মণ্য, ইসলাম আমাদের সমাজের সংস্কার

করতে পারে না। ইসলাম রাষ্ট্র চালাতে পারে না। ইসলাম তাদের মতে নারীদের ঋতু, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও এরূপ আরো কতক বিষয়ের কিছু মাসলা-মাসায়েলের নাম। আমাদের সমস্ত পশ্চাৎপদতার কারণ, তাদের মতে, ইসলামী শিক্ষা। কারণ ইসলামী শিক্ষার মধ্যে তাদের মত জীবনের বিষয়বস্তু নেই, এ কারণে ইসলাম থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া অর্থাৎ ইসলাম ছেড়ে দেয়া ছাড়া জীবনপথে অগ্রগামী হওয়া যায় না।

ইসলামী শাসন স্থাপনের ওপর জোর দিয়ে তিনি লিখেছেন : কেবল আইন সামাজিক অবস্থার সংস্কার করতে পারে না। সংস্কারের জন্য আইন কার্যকর করার প্রয়োজন আছে এবং আইন প্রয়োগ করার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন আছে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াত ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী আদেশাবলী জারি ও প্রয়োগ করার পূর্ণভাবে চেষ্টা করেছিলেন, তবেই ইসলামী শাসন স্থাপিত হয়েছিল।

খোমেনীর মত এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর এই দায়িত্ব তাঁর খলীফাদের ওপর অর্পিত হয়েছে এবং খলীফাদের পর তাঁদের খলীফা ও উম্মতের আলিমদের ওপর অর্পিত হয়েছে। তিনি বলেন :

আইন ও সামাজিক রীতিনীতির জন্য প্রয়োগকারীর প্রয়োজন। কোন লোকই আইন পরিচালনার রীতিনীতি বানিয়ে অবকাশ প্রাপ্ত হয় না, বরং তাকে প্রয়োগ করার উপায়-উপকরণও তালাশ করে। আইনের সাজ-সরঞ্জামের সাথে তা প্রয়োগ করার সাজ-সরঞ্জামের অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং তা এই কুরআনী আয়াতের দাবি :

"اطيعو الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم" [সূরা নিসা, ৫৯]

অর্থ : তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূল ﷺ-র এবং তাঁদের যাঁরা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী।

দীনের অবাধ্যদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা সম্পর্কে তিনি বলেন :

শরীয়ত ও জ্ঞান উভয় আমাদের ওপর অবশ্য কর্তব্য করে দিয়েছে যে, আমরা প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাকে যেন এর ভ্রান্ত নীতিতে ছেড়ে না দিই। এই সম্পর্কে অনেক প্রমাণ রয়েছে। যে শাসন ব্যবস্থা দীনের অবাধ্য তা শয়তানী শাসন এবং আমাদের দায়িত্ব হলো তার প্রভাব ও চিহ্নকে সমাজ ও দেশ থেকে দূরীভূত করা, তার জন্য আমাদের এমন প্রজন্ম তৈরি করতে হবে, যারা শয়তানী শাসনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। এ অবস্থায় আমাদের সম্মুখে কেবল একটিই রাস্তা রয়েছে, তা হলো বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাতিল ও কর্তা ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দেয়া। আর এটাই ইসলামী বিপ্লব যার দায়িত্ব সমস্ত মুসলমানের রয়েছে।

যে সমস্ত আলিম ও ফকীহ (ইসলামী শরীয়তের বিশেষজ্ঞ) অনৈসলামী সরকারের সহায়তা করে এবং তাদের পক্ষে ফতোয়া প্রদান করে তাদের সম্পর্কে খোমেনী লিখেছেন :

এ সমস্ত আলিম ইসলামের শত্রু। তাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দেয়া দরকার। জনগণের উচিত যে, তাদেরকে অসম্মানিত ও অপমানিত করে সমাজ থেকে বের করে দেয়া, তাদের পাগড়ি কেড়ে নেয়া, তাদেরকে দীনের নামে সুযোগ গ্রহণ করতে না দেয়া এবং জনসাধারণকে প্রতারিত করা হতে বাধা দেয়া।[১]

আয়তুল্লাহ খোমেনী এই সমস্ত মন্তব্য দ্বারা জাতির মধ্যে এক নতুন প্রাণ সৃষ্টি করেছেন।

তিনি ইসলামকে জীবনে প্রয়োগ করার ডাক দেন, জাতি তাকে এর সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। এখন তার প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সুন্দর পরিচালনার পরীক্ষা হবে। তিনি কী শেষ পর্যন্ত নিজ উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করতে পারবেন? তার জন্য এটাও বড় পরীক্ষা যে, বহুদিন থেকে বাদশাহ ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে জাতির মধ্যে প্রচণ্ড আকারে যে প্রতিকারের ইচ্ছা বিদ্যমান ছিল তা থামিয়ে রাখা, যেন জাতিকে প্রাণহানি এবং আর্থিক ও চিন্তাগত ক্ষতি হতে রক্ষা করা যায়। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে তিনি তা থামাতে পারেননি যার কারণে দেশ শত শত যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোক হতে বঞ্চিত হয়েছে। ক্ষমার স্থানে ইসলাম সম্পর্কে কঠোরতা ও অত্যাচারের ছবি দুনিয়ায় প্রকাশ পেয়েছে যা প্রচারের ক্ষেত্রে খুব ক্ষতিকর বলে ধারণা করা যায়।

কোন কোন ঘটনা, বিশেষ করে আমেরিকার যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইরান যে কঠোর পন্থা গ্রহণ করেছে তা এই সন্দেহের অবকাশ দেয় যে, দেশের ওপর তার পারদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পূর্ণ ক্ষমতা নেই এবং দেশে যুবক ও আবেগপ্রবণ ব্যক্তিদের প্রাধান্য রয়েছে। এভাবে ইমামত ও ইমামদের সম্পর্কে তার এমন কিছু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে যা দ্বারা পয়গাম্বরীর মর্যাদার ওপর আঘাত আসে এবং কোন ব্যতিক্রম ছাড়া নবীগণ নিজেদের উদ্দেশ্যকে সফল করতে অকৃতকার্য থাকার উক্তি প্রকাশ পায়।[২]

১. আয়াতুল্লাহ খোমেনীয় হুকুমতে ইসলামিয়া।
২. এই বক্তব্যসমূহের কোন প্রতিবাদ ইরান হতে করা হয়নি।

সংস্কার সম্পর্কেও কোন কোন পদক্ষেপ দ্রুত গতির সাথে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং ইসলামবিরোধী শক্তিবর্গের আনন্দ-উল্লাসের কারণ হয়েছে। শরীয়তের আদেশাবলী প্রয়োগ করার মধ্যেও তিনি সংখ্যালঘু সুন্নীদের অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। ফলে সুন্নীদের সঙ্গে সংঘর্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত অজুহাতে দেশে একতার ঐ দৃশ্য বাকি নেই যা আন্দোলনের সময় দেখা গিয়েছিল।

খোমেনীর বিপ্লবী প্রচেষ্টায় সফলতা ও ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করার কারণে তাকে ইসলামী বিশ্বের কোন কোন গ্রুপ ইমামের পদ ও পদমর্যাদা দিয়েছে। আর কোন গ্রুপ তাকে শায়খ হাসনুল বান্না ও মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর সমকক্ষ বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু ভবিষ্যতই জানা যাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি চিন্তার সংস্কারে কত দূর সফলতা লাভ করেছেন এবং তার প্রচেষ্টা কেবল রাষ্ট্র স্থাপন করা অথবা এক অত্যাচারী বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে কিনা কি? আমরা আশা পোষণ করি, তিনি ইরান জনসাধারণের চিন্তাজগতে বিপ্লব সংঘটন করতে পারবে যা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য।

তখনও ইরানের অবস্থায় স্থিতিশীলতা আসেনি হঠাৎ ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে ইরাক সরকার ইরান আক্রমণ করে। ইরানের প্রতিরোধ শক্তি পূর্বের চেয়ে দুর্বল হয়েছিল। এই আক্রমণের দরুন ইরানের অর্থনৈতিক অবস্থা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন বলা যায় না যে, ইরান এই বিপদ হতে কখন রেহাই পাবে এবং কত দূর শক্ত হতে পারবে এবং দুনিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে নিজের বিশেষ কর্মধারায় বিকাশ ঘটাতে পারবে কিনা যার জন্য তারা এত বিরাট কোরবানী দিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া

আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য সম্পর্কে স্বাধীন মুসলিম দেশসমূহের যে মানসিকতা ইন্দোনেশিয়ারও সে একই মানসিকতা। ইন্দোনেশিয়াও সেই সাধারণ নীতিমালা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহে ধর্মনিরপেক্ষতা ও এই যুগে ইসলামী বিধি-বিধানের অকার্যকারিতা ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের ব্যাপারে ওপরে বর্ণিত অবস্থা হতে ব্যতিক্রম নয়, অথচ সে দেশের শতকরা ৯০ জন মুসলমান।

সেখানে এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী আন্দোলন চলেছে যা দারুস সালাম আন্দোলন আকারে কয়েক বছর ধরে চলেছে এবং এখন যার প্রাণবায়ু প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক সরকারের রাষ্ট্রপ্রতি ডক্টর আহমদ সুকর্নোর পরিচালনায় দেশের শাসকশ্রেণী এক সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত পরিকল্পনার অধীনে একে তুরস্কের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ লেখক Louis Fisher নিজ গ্রন্থ The Story of Indonesia-এ সংক্ষেপে এখানকার অবস্থার ছবি অংকন করেছেন এবং ক্ষমতাশালী শ্রেণীর মনোভাবের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

তুরস্ক একমাত্র অকমিউনিস্ট মুসলিম দেশ যা এক গভীর সাংস্কৃতিক বিপ্লব অতিক্রম করেছে। সেখানে কামাল আতাতুর্ক রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ইসলামের বিলুপ্তি ঘটান। শরীয়তী বিচার ব্যবস্থা, খিলাফত, পর্দা, হারাম ও আরবী লিপি আইন নিষিদ্ধ হয়েছে। এর বিপরীতে সেখানে পাশ্চাত্য পোশাক, ল্যাটিন লিপি, সহশিক্ষা, মেয়েদের ভোটের অধিকার, রোববারের ছুটি ও জাতীয়তাবাদ নীতিমালা আইনের মর্যাদা লাভ করে।

ইন্দোনেশিয়া এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কিছুটা অগ্রগামী। তথায় এ সমস্ত সংস্কারের অথবা কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনই ছিল না। কারণ এ ধরনের সংস্কার ইন্দোনেশিয়াতে আগেই এসে গিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার সরকার ধর্মনিরপেক্ষ, যদিও ১৯৪৫ ও ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের সংবিধানে ছিল যে, এই রাষ্ট্রের ভিত্তি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, কিন্তু সরকারপ্রধান হতে নিম্নতম কর্মচারী কারও মুসলিম হওয়া অপরিহার্য নয় এবং কোন সরকারী চাকুরে অথবা কোন পদস্থ অফিসারের জন্য বিশ্বস্ততার প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ্‌র নামে অথবা মুহাম্মদ ﷺ-র নামে হলফ করা[১] প্রয়োজনীয়

১. পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের এটা জানা নেই যে, ইসলামে আল্লাহ্‌র নামে ছাড়া অন্য কারও নামে হলফ করা বৈধ নয়।

নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ পছন্দমত ধর্ম গ্রহণ করা এবং তার ওপর স্থায়ী থাকার অধিকার সংবিধানে দেয়া হয়েছে।

অনৈসলামী ও ধর্মনিরপেক্ষ ইন্দোনেশিয়া দেশের এক বৃহৎ অংশকে নিজের বিরোধী বানিয়ে ফেলেছে এবং তার সরকারের বিরুদ্ধে এমন এক যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে যে, যা ইন্দোনেশিয়ার জন্য সবচেয়ে দীর্ঘ ও সবচেয়ে ব্যয়বহুল গেরিলা যুদ্ধ (Guerilla war) প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণত এই ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থনে এই যুক্তি পেশ করা হয় যে, দেশে খৃস্টান, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের সংখ্যা যথেষ্ট রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের আসল যুক্তি যা তারা মুখে তেমন বলে না, তা এই যে, কোন নতুন রাষ্ট্রই কুরআনী নীতি ও শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালনা করা যায় না যা সাড়ে তের শ' বছর পূর্বে মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-র ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। দ্বিতীয় কথা এই যে, কুরআন মজীদ যদি আইন হয়, তাহলে এর উকীল ও ব্যাখ্যাকারী অন্ধকারে নিমজ্জিত 'আলিম সমাজ' হবেন এবং রাজনীতির ওপর শত শত বছরের পুরানো ধারণার ছাপ পড়বে। ইন্দোনেশিয়ার প্রায় রাজনৈতিক দল ও নেতা আধুনিক চিন্তাবিদ, তারা আধুনিক মনোভাবের অনুসরণে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারক। তারা এ কথায় বিশ্বাসী যে, একটি মুসলিম দেশের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা অবশ্যই প্রয়োজন। তাদের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক পাশ্চাত্য নীতি অনুযায়ী ভাবতে ও কাজ করতে অভ্যস্ত।[১]

অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া

আধুনিকতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার (Secularism) প্রতি প্রবল আকর্ষণের ফলে ড. সুকর্নোর নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া দ্রুত গতিতে কম্যুনিজমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কম্যুনিস্ট সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তাগণ ও সেনাবাহিনীর অনেকে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তারা সরকারের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভের চেষ্টা করে অকৃতকার্য হচ্ছে। কারণ এই কর্ম পদ্ধতির বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম জনসাধারণ, বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে এক ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে ঐ কম্যুনিস্ট গ্রুপ সেনাবাহিনী ও সরকার হতে বহিষ্কৃত হয় এবং রাষ্ট্রপ্রধানও ক্ষমতাচ্যুত হয়।

এই প্রতিক্রিয়ার ইতি ও নেতিবাচক দিকগুলো এখনও অস্পষ্ট, বলা যায় না যে, আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যমুখী প্রবণতার যে পথে ইন্দোনেশীয়গণ দ্রুত গতিতে অগ্রসর

১. The Story of Indonesia, p. 250-261.

হচ্ছিল এই পরিস্থিতিতে এতে কি কোন পরিবর্তন আসবে এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন এর দ্বারা কত দূর লাভবান হবে।

এটা স্পষ্ট যে, এই দেশে খৃস্ট ধর্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় এবং ঐ ধর্মের প্রচার সেখানে খুব দ্রুত গতিতে হচ্ছে। ফলে তা শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানদের দেশে ইসলামের জন্য বিপদ সৃষ্টি করেছে।

নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম দেশসমূহ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হওয়ার পথে

প্রাচ্য দেশসমূহ যারা নিকট অতীতে স্বাধীনতা লাভ করেছে, আধুনিক ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হওয়ার পথে চলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যে পথে তুরস্ক কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে অগ্রসর হয়েছে। কার্যকলাপে এমন দৃষ্ট হয় যে, এ সমস্ত রাজনীতিবিদ ও লিডার পাশ্চাত্যের চিন্তাগত দর্শনকে সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকসমূহ গ্রহণ করতে বিশেষভাবে আগ্রহী। সর্বোপরি তার জড়বাদী জাতীয়তাবাদকে নিজ নিজ ইসলামী দেশে প্রয়োগ করার দৃঢ় ইচ্ছাও করছে। তারা এজন্য ইসলামী স্বভাবের সাথে স্থায়ীভাবে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, অথচ এর মূল ও শাখাসমূহ সব দিকে বিস্তৃত এবং তার সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে ঠিক রেখে তা দ্বারা বহু উপকৃত হতে পারত। দেশ ও জাতির কল্যাণ কর্মে মূল্যবান সাহায্য নেয়া যেতে পারত। তারা ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক শক্তিসমূহের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে যা মহান সাধক ও দীনী সংস্কারকদের নজিরবিহীন এখলাস ও কুরবানীর কারণে এ উম্মতের মধ্যে মজবুত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে রয়েছে।

তারা নিজ কর্ম পদ্ধতি, শিক্ষানীতি, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও ঘোষণাবলী দ্বারা জাতির এই ঈমানী ও দীনী আবেগ-উদ্যমকে বরাবর দুর্বল করে যাচ্ছেন, যা কোন কারখানা ও ফ্যাক্টরী হতে ঢালাই হয়ে বের হয় না এবং কোন আবেগপূর্ণ উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতা দ্বারাও সৃষ্টি হয় না। এটা শুধু পয়গাম্বরের (আ) প্রভাব, সাহচর্য ও তাঁদের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও অনুরূপ নিষ্ঠাবান ধর্ম প্রচারকগণের চেষ্টা ও তদবীর দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ্ না করুন, যদি মানব হৃদয়ের এই নির্ভেজাল উৎসাহ শুষ্ক হয়ে যায়, তাহলে এই শূন্যতাকে কোন জাতীয় অনুভূতি, রাজনৈতিক জাগরণ, জ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নতি পূর্ণ করতে পারে না।

এই ঈমানী শক্তি অতীত কালেও আশ্চর্যজনক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যা শত শত বছর ধরে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে হতবুদ্ধি করেছে। এর মধ্যে এখনও ঐ

অলৌকিক শক্তি লুক্কায়িত রয়েছে। এই ঈমানী শক্তি ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শাহাদত লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষার ফলে সুয়েজ খালের যুদ্ধে জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে এবং আলজিরিয়ার রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব হয়েছে, বরং দশ লক্ষ লোকের কুরবানীর বিনিময়ে (যারা জিহাদের আবেগে মাতোয়ারা ছিল) দেশের স্বাধীনতা ও মর্যাদা অর্জন করা হয়েছে।

এটা ইতিহাসের এক আশ্চর্যজনক বেদনাদায়ক ঘটনা ও রাজনৈতিক উপহাস। কোন এলাকায় যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ চলতে থাকে এবং বিদেশী ক্ষমতা হতে মুক্তি অর্জন করার জন্য জনসাধারণের আত্মত্যাগ, আবেগ ও উদ্যমের প্রয়োজন, যখন জনগণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, পরকালের প্রতিদান, পুরস্কার ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্যের প্রতি আকর্ষণ রাখে না, ধর্মীয় কথা ছাড়া অপর কোন কথার সঙ্গে পরিচিত হয় না এবং ধর্মীয় ডাক ছাড়া রক্তে উত্তেজনা ও মস্তিষ্কে নেশা সৃষ্টি করা যেতে পারে না, তখন স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা ও পরিচালকগণ ঐ ভাষা ছাড়া জনগণের সঙ্গে অপর কোন ভাষার কথা বলে না। তারা ধর্মীয় ধ্বনি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামের গৌরব ও আল্লাহ্ তা'আলার আদেশাবলী প্রচলন করার লোভ দেখিয়ে তাদেরকে জীবন নিয়ে খেলা করবার, মাটি ও রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি দেবার আমন্ত্রণ জানায় এবং ঐ ঈমানী শক্তি দ্বারা (যার তুল্য অন্তত মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে কোন বড় শক্তি পাওয়া যায় না) স্বাধীনতার কেল্লা জয় করে এবং অপরাজেয় শত্রুকে মাথা নত করতে বাধ্য করে।

কিন্তু যখনই এই কঠিন মঞ্জিল পার হয়ে যায়, সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং দেশ ও জাতির ভাগ্য যখন তাদের হাতে এসে যায় তখন তারা দেশকে পাশ্চাত্য ও ধর্মহীনতার রাস্তায় নিক্ষেপ করে এবং অতি সত্বর সমাজ সংস্কারের নামে ইসলামী আইনের রদ বদল করা ও সংশোধন করা এবং দেশকে পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢালাই করার প্রয়োজনীয় কাজ আরম্ভ করে দেয়। এই কাজ এত দ্রুততা ও তীব্রতার সাথে সম্পন্ন করে যে, কোন কোন সময় ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছে, তারা এটা চিন্তা করতে থাকে যে, তারা সম্ভবত ভুল করেছিল এবং দেশের এই স্বাধীনতা ইসলামী জীবন ও ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে উপকারী হওয়ার পরিবর্তে অপকারী প্রমাণিত হয়েছে। ১৯২৪ সালের তুরস্ক হতে ১৯৬২ সালের আলজিরিয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক একই কাহিনী। তা থেকে কেউ বাদ পড়েছে বলে মনে হয় না। আর আরব দেশসমূহ পূর্ণ সংকল্প, আবেগ ও উদ্যমের সঙ্গে তুরস্কের অনুকরণ করে চলেছে, অথচ তার শাসনের বিরুদ্ধে তারা এক সময় বিদ্রোহ করেছিল এবং তার রাজনীতির প্রতি এখনও তাদের দারুণ অসন্তুষ্টি।

তিউনিসিয়া

যে সমস্ত আরব রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিউনিসিয়ার নাম আসে। তিউনিসিয়া ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে স্বাধীন সরকার গঠনের সক্ষম হয়। এর প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন আলহাবীব বুরাকীবা। তিনি ইসলাম ও আবেগপরিপূর্ণ মুসলিম আরব দেশ তিউনিসিয়ায় পূর্ণোদ্যমে কামাল আতাতুর্কের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও ভাষণসমূহ যা সময় সময় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়, তা হতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, তিনি নিজ দেশকে ক্রমশ তুরস্কের রাস্তায় নিয়ে যেতে চান এবং নিজ ফরাসী প্রশিক্ষণ অনুযায়ী নব্য সভ্যতার ছাঁচে নতুন তিউনিসিয়ার কাঠামো তৈরি করছেন। এ সম্পর্কে অতি সাবধানী এক ফরাসী সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি পেশ করা যাচ্ছে, পত্রিকাটি নতুন তিউনিসিয়ার ধর্মহীনতার দিকে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে।

প্যারিসের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র Le Monde ১৯৫৮ সালের ২৯ জানুয়ারি সংখ্যায় তিউনিসিয়ার ৩য় বছরে পদার্পণ উপলক্ষে তিউনিসিয়া সম্পর্কে লিখেছেন :

রাষ্ট্রপতি হাবীব বুরাকীবা একের অধিক বিবাহের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করে দিয়েছেন।[১] এভাবে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেবার অধিকারে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।[২]

এ পারিবারিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার সাথে মিলে সোনায় সোহাগা হয়েছে! বর্তমানে মহিলাদের ভোট দেবার অধিকার অর্জিত হয়েছে। সংসদ সদস্য হবার অধিকার অর্জিত হয়েছে। চাকরির সকল দরজা খুলে গেছে। বর্তমানে এক শত মহিলা শিক্ষা অধিদপ্তরে, দেড় হাজার মহিলা অফিস আদালতে ও সাত হাজার মহিলা বিভিন্ন অফিসে কর্মরত রয়েছে।

তিউনিসিয়া উন্নতির ময়দানে নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করছে। কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্ক এ পথের সূত্রপাত করেছিল। এখন তিউনিসিয়া সে পথে পা বাড়িয়েছে। ফলে দেশে দ্রুত গতিতে ও সুস্পষ্টভাবে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। পর্দা (বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মের মাঝে) কম হয়ে আসছে। বাইরে

---

১. এটা ১৯৫৮ সালের কথা। এরপর একের অধিক বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

২. এটাও ১৯৫৮ সালের কথা। এরপর স্বামীর অধিকার খর্ব করে আদালতকে তালাক দেবার অধিকার দেয়া হয়েছে।

যাতায়াতকারী মহিলাদের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি হচ্ছে। রাজনীতির মাঠে তাদেরকে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। পল্লীগ্রামগুলোতে (যেখানে এখনো কঠিন বিরোধিতা রয়েছে) উন্নতি ধীর গতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি বুরাকীবা এই পরিবর্তনকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার কোন চেষ্টা করেননি। তিনি এটা পছন্দ করেন যে, এই পুরাতন কাপড় কর্তিত ও নষ্ট হয়ে যেন শরীর হতে স্বাভাবিকভাবে নেমে যায়। প্রতিবাদের সুরে বলেন, তিনি ধর্মহীনতায় বিশ্বাসী নন, তিনি ইসলামকে ছেড়ে দিতেও চান না। কিন্তু তিনি সব সময় প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও দীনী-ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে চান। তিনি এটা প্রমাণ করতে চান যে, যদিও তার সংস্কারগুলো আভিধানিক অর্থে কুরআন মজীদের স্পষ্ট নির্দেশসমূহের মোতাবেক নয়, কিন্তু তা কুরআনের মূলনীতির বিরোধীও নয়। এ কারণে বলা ঠিক হবে যে, তিউনিসের নতুন লক্ষ্য কামাল আতাতুর্কের চিন্তাধারার মুকাবিলায় মিসরের চিন্তাধারার নিকটবর্তী, যেমন মিসর জামিআ' আযহারকে অপরিবর্তিত রেখেছে, তদ্রূপ বুরাকীবা তিউনিসে বড় মাদ্রাসা জামিআ' যয়তুনার বিরুদ্ধাচারিতার ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করেন। কিন্তু তিনি দু' বছর হতে এর কার্যক্রম সীমিত করতে ও এর প্রভাব-প্রতিপত্তি কম করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি একে তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কেবল একটি ফাকলিটি আকারে রাখতে মনস্থ করেছেন।[১]

প্রফেসর জোযেফ শাখত (Schacht) 'নতুন ইসলামী আইন প্রণয়ন' শিরোনামের এক প্রবন্ধে তিউনিসের এই আধুনিক বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন : শেষ পর্যন্ত তিউনিসিয়া ১৯৫৬ সালের আইনকে বিধিবদ্ধ করে যে সমস্ত দেশ ইসলামী আইনের আধুনিকীকরণের দিকে অগ্রসর হতে আগ্রহী তাদের আমীররূপে পরিগণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম সাধারণ ওয়াকফসমূহ শেষ করে দেয়া হয় এবং ঐ সমস্ত ওয়াক্‌ফের আয়কে রাষ্ট্রের সম্পত্তি গণ্য করা হয়। তার এই কর্ম আইনের গুরুত্ব হিসেবে সিরিয়া ও মিসরের ওয়াকফ শেষ করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত এক বছর পূর্বের মিসরীয় আইনের অনুসরণ করে শরীয়ত বিভাগের ঐ

১. ইদ্রীস আল-কত্তানী : المغرب المسلم ضد اللادينية পৃ. ৯৫-৯৬

সমস্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হলো যা দ্বারা ঐ বিভাগ ঐতিহ্যগত ইসলামী আইনের সাথে সমন্বয় সাধন করত।

তৃতীয়ত তিউনিসের জন্য পার্সনাল ল (Personal Law) নামে একটি নতুন আইন (مجلة الاحكام الشخصية) Tunisian code of Personal Status নামে প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়। অবশ্য তিউনিসের বিচার বিভাগীয় মন্ত্রণালয় এক সার্কুলার-এর মাধ্যমে এই কথার দাবি করেছে যে, এই আইনকে ইসলামী আইনের উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণ পছন্দ করেছেন, যদিও এই আইনে এমন কিছু ধারা রয়েছে যা অবস্থা অনুযায়ী খাঁটি ইসলামী, যেমন মেয়েদের মোহরানা, দুগ্ধ পান করানো দ্বারা বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া। এই আইন খুঁটিনাটি বিষয়ে তিউনিসে প্রচলিত দু'টি মাযহাবের আইনসমূহের কোন একটির সঙ্গে নিশ্চিতভাবে মিল রাখে। তা সত্ত্বেও কোন দূরতিক্রম্য ব্যাখ্যা দ্বারাও একে সনাতন ইসলামী আইনের সমতুল্য সাব্যস্ত করা এবং এটাকে ঐতিহ্যগত ইসলামী আইনের একটি পরিবর্তিত রূপ বলা কিছুতেই সম্ভব নয়।

তিউনিসের বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট উক্ত বহু উচ্চ শ্রেণীর আলিমগণ এই আইনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন যাতে স্পষ্টভাবে এর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। উক্ত আলিমদের মধ্যে চারজন আলিম, যাঁরা মালিকী ও হানাফী মযহাবের মুফতী আজম ছিলেন। প্রতিবাদস্বরূপ উচ্চ বিচারালয় (Tribunal Superior) হতে তাঁরা তাঁদের সদস্য পদ হতে ইস্তফা দিয়েছেন। এটা সত্য যে, বিধিমালার যে অংশ ওয়ারিসী আইনের সাথে সম্পর্কিত তা ইসলামী ওয়ারিসী আইনকে কোন পরিবর্তন ছাড়াই গ্রহণ করেছে। এর কারণ নিশ্চিতভাবে এই ছিল যে, বর্তমানে ওয়ারিসী আইন তিউনিসের সামাজিক অবস্থার চাহিদাসমূহ এখনও খুব ভালভাবে পূর্ণ করতে পারে। কিন্তু বিবাহ ও তালাকের আইনসমূহ এভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে যে, এর স্বরূপ ও পরিচয় বাকি রাখা হয়নি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, একের অধিক বিবাহ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একে শাস্তিযোগ্য ফৌজদারী অপরাধে গণ্য করা হয়েছে। ফলে বিবাহ এখন উভয় পক্ষের সম্মতি দ্বারা হয়। কিন্তু তালাক কেবল আদালত দ্বারা হতে পারে। তাও কেবল এই তিন অবস্থায় (১) উভয় পক্ষের কেউ ঐ সমস্ত শর্তের ভিত্তিতে তালাকের দরখাস্ত দেবে যে সমস্ত শর্ত বিধিমালার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, (২) উভয় পক্ষ তালাকের ওপর সম্মত থাকবে, (৩) কেবল এক পক্ষ তালাকের দরখাস্ত

করে তবে এই অবস্থায় জজ সাহেব টাকার একটি অংক ঠিক করে দেবেন, যা দরখাস্তকারী পক্ষ অপর পক্ষকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করবে। এভাবে বিবাহ ও তালাক ব্যবস্থায় স্ত্রীকে শুধু মৌলিকভাবে স্বামীর সমান বানিয়ে দেয়া হয়নি, বরং আনুষঙ্গিকভাবে অধিকারের ঐ সমস্ত ব্যাপারেও সমান করে দেয়া হয়েছে যা বিবাহের ফলে স্বামী লাভ করে।

এটা অকল্পনীয় যে, তিউনিসের এই আইনের খসড়া প্রস্তুতকারীরা আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিধানের বিশেষ কোন জ্ঞান রাখতেন। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, তিউনিসের এই আইন ইসলামী আইন দ্বারা খুব কমই প্রভাবিত হয়েছে। তিউনিসের সরকার যা-ই ঘোষণা করুন, তাদের উল্লিখিত পারিবারিক আইনকে যদি সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় তবুও বলা যাবে যে, তা ইসলামী ঐতিহ্যের পরিপন্থী তেমনই যেমন তুরস্কের সেকুলার সিভিল কোড (দেওয়ানী আইন)।[১]

তিউনিসের রাষ্ট্রপতির পদক্ষেপ ও ভাষণসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, তার সাংস্কৃতিক সংশোধন পাশ্চাত্য সভ্যতার সমর্থক, প্রচারকগণ, খৃস্টান মিশনারী ও প্রাচ্যবিদগণের শিক্ষা ও চিন্তাধারা অনুপাতে জারি থাকবে এবং তা সুদূরপ্রসারী হবে। বর্তমানে তিনি ইঙ্গিত ও ইশারার সীমা অতিক্রম করেছেন। অতএব, এখন তিনি নির্ভয়ে নিজের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করেন এবং সাহসের সাথে কাজ করেন। এর প্রমাণ তার ঐ সমস্ত বক্তৃতা, যা ইসলামী বিশ্বে কোলাহল সৃষ্টি করেছিল।

তিনি তিউনিসে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সভ্যতা কনফারেন্সে আগত শিক্ষিত ও সুধীবৃন্দের অধিবেশনে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন যা তিউনিসীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। তবে তার ঐ বক্তৃতার ঐ সমস্ত অংশ বিলুপ্ত করে প্রকাশ করেছেন, সে অংশগুলোতে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ভীষণভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল। সেগুলো সরকারি সংবাদপত্রেও বিলোপ করা হয়েছিল। লেবাননের সাপ্তাহিক পত্রিকা الشهاب। সপ্তম বছরের প্রথম সংখ্যায় ১৯৭৪ সালের ১৫ই এপ্রিলে তা প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিম্নরূপ :

১. কুরআন পাকে বৈপরীত্য রয়েছে এবং এমন বিষয় রয়েছে যা জ্ঞান গ্রহণ করে না। যেমন এক জায়গায় আছে قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যা লিখে

---

১. প্রফেসর শাখত এর প্রবন্ধ Problem of Modern Islamic Legislation শিরোনামে মৌলভী ফযলুর রহমান আনছারী এম. এ., এল, এল. বি. (আলীগ)-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিল্লির বুরহান পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯৬৩-তে প্রকাশিত।

দিয়েছেন তা ব্যতীত আমাদের ওপর (কোন বিপদ-আপদ) আসবে না। অপর এক জায়গায় আছে : "ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما با نفسهم" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জাতির মধ্যে আছে তা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা তাদের মধ্যে যা আছে তাকে পরিবর্তন না করেন।[১]

===

২. পয়গম্বর মুহাম্মদ ﷺ একজন সহজ-সরল লোক ছিলেন, আরব মরুভূমিতে বেশি বেশি ভ্রমণ করে বেড়াতেন, তখনকার প্রচলিত কল্পকাহিনীসমূহ শুনতেন। তৎপর তিনি ঐ কথাগুলোরই বর্ণনা কুরআন পাকে দিয়েছেন। যেমন মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি যা হাত হতে নিক্ষেপ করা মাত্র সেটা অজগর সাপ হয়ে যায়, কিন্তু গবেষণার পর জ্ঞান তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় এবং যেমন আসহাবে কাহাফের ঘটনা।[২]

৩. মুসলমানগণ পয়গম্বর মুহাম্মদ ﷺ-কে উপাস্য বানিয়েছে। কেননা তারা সব সময় তাঁকে মুহাম্মদ ﷺ বলে থাকে যার অর্থ হলো আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর রহমত পৌছায়। এটা মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহ্র পদ দেয়ার অনুরূপ।[৩]

রাষ্ট্রপতির এই সমস্ত বক্তৃতা ইসলামী পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করা হয়েছে, অথচ সরকারি পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তিউনিসীয় পত্রিকা "الصباح" যে বক্তৃতা প্রচার করেছে (যা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকে) তা রাষ্ট্রপতির এই অপবাদ হতে অব্যাহতি দেয় না। তার চিন্তার পথভ্রষ্টতাকে খাটো করেও দেখানো যায় না। নিম্নে এর অবিকল উদ্ধৃতি পেশ করা হলো :

এতে আরও কিছু তথ্য রয়েছে, যেমন মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি যা হাত থেকে নিক্ষেপ করা মাত্র অজগর সর্প হয়ে যায়। এর ওপর লোকের ঈমান ছিল যে,

১. রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত আয়াতে বৈপরীত্য পেয়েছেন তা হয়ত আরবী ভাষায় অজ্ঞতার কারণে হবে। কেননা তার শিক্ষা ফ্রান্সে হয়েছে অথবা কুরআন ও তার তাফসীর পাঠ না করার ফল। যদি তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত কোন সাধারণ আলিমের সাথে আলোচনা করতেন তাহলে এই সন্দেহে পড়তেন না।

২. এটা রাষ্ট্রপতির অজ্ঞতার কারণে অথবা বিশৃংখল চিন্তার প্রকাশ মাত্র যা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধেকের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বর্তমান আধুনিক যুগে এই প্রকার বক্তব্যের কোন মূল্য নেই। এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি বুরাকীবা কুরআন শরীফকে নবী করীম ﷺ -এর রচিত মনে করেন, আসমানী কিতাব বলে স্বীকার করেন না।

৩. এটা রাষ্ট্রপতির অজ্ঞতার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ, না জেনে তার কথা বলবার একটা দৃষ্টান্ত। কাউকে উপাস্য বানাবার সঙ্গে দরূদ, বরকত ও দোয়ার কি সম্পর্ক রয়েছে? এ প্রকারের দোয়া সমস্ত আসমানী কিতাব, বরং সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দোয়া দ্বারা মানব জাতির দাসত্বের ও অভাবগ্রস্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই তো তার জন্য আল্লাহর নিকট রহমতের প্রার্থনা করা হয়!

পাথর থেকেও জীবনের সৃষ্টি হতে পারে। এই ধারণা ইউরোপেও ছিল। লুই পাস্তুর Louis Pasteur উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জীববিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রথমবার এটা প্রকাশ করেছেন যে, ছোট ছোট জীবাণু রোগ সৃষ্টি করে। এর সময় থেকে এই ধরনের বিশ্বাস একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। ঐ সমস্ত গল্পে আরব দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল। যেমন, আসহাবে কাহাফের গল্প যারা শত শত বছর যাবত ঘুমিয়ে রয়েছে, আবার তাদের মধ্যে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে।[১]

আমি এখানে এই বক্তৃতার কোন পর্যালোচনা করতে চাইনি। কারণ রাষ্ট্রপতি বুরাকীবা উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত নন এবং ঐ বক্তৃতার পেছনে প্রণিধানযোগ্য কোন চিন্তা ও যুক্তি নেই। অবশ্য তা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রাষ্ট্রপতি বুরাকীবা হীনতাবোধ ও চিন্তাগত দাসত্বের শিকার হয়েছেন। তিনি এই বয়সে এমন কোন ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেননি, যা দ্বারা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। এখন প্রশ্ন কেবল এই থেকে যায়, যে ব্যক্তি ইসলামের প্রতি এই প্রকার শত্রুভাবাপন্ন সে ইসলামের সীমায় থাকতে পারে কিনা এবং মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশ শাসনের অধিকারী হতে পারে কিনা? রাষ্ট্রপতির এই সমস্ত প্রকাশ্যে উক্তির ফলে বিশ্বের ইসলামী ও দীনী কেন্দ্রসমূহে যে ভীষণ অসন্তুষ্টি ও প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়েছে তা ঐ প্রশ্নের উত্তম জবাবই ছিল।[২]

উল্লিখিত তিনটি আপত্তি ছাড়াও রাষ্ট্রপতির উক্তিসমূহে এ ধরনের আরও সব চিন্তা রয়েছে। তার বক্তব্যে পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র জীবন, ইসলামী আকীদা, ইবাদতের পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়। এও জানা যায় যে, তিনি কেবল যে ইসলামের ভিত্তিমূলসমূহ ও শরীয়তের সাথে একমত নন তা নয়, বরং তিনি তিউনিসের মুসলমানগণকেও ঐ মতাবলম্বী করতে চান। তিনি তাদের অন্তরে দীনের আকীদা ও তত্ত্বাদি সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিতে চান। এ থেকে এটা

---

১ الصباح। তিউনেসিয়া ২০-২১ মার্চ।

২. ঘটনাক্রমে ঐ সময় মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা কমিটির অধিবেশন চলছিল। সেখানে ইসলামী ও আরব দেশসমূহের নির্বাচিত শিক্ষক, অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। এই লেখকও কমিটির সদস্য হওয়ার কারণে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এক ভিন্ন বৈঠকে মিলিত হয়ে ঐ সমস্ত উক্তি পরীক্ষা করা হয়। অধিবেশনের সদস্যগণ ঐ সমস্ত উক্তির প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, তৎপর বুরাকীবাকে এক টেলিগ্রাম দ্বারা আলিমদের মতামত জানিয়ে দেয়া হয়, ঐ টেলিগ্রামে এরকমও ইঙ্গিত ছিল যে, এই ধারণার লোক ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

অনুমান করা কঠিন নয় যে, তিউনিসিয়া কোন্ দিকে যাচ্ছে, অথচ তিউনিসিয়া এক সময় ইবন খালদূনের মত মহান ইসলামী চিন্তাবিদ, জ্ঞানী ও আলিম সৃষ্টি করেছিল এবং যেখানে শত শত মুহাদ্দিস, ফকীহ্, মাশায়েখ (সম্মানিত বুযুর্গ) ও আউলিয়া সৃষ্টি হয়েছেন। আমরা জানি বুরাকীবার সে সকল উক্তির বিরুদ্ধে তথায় ইসলামী গ্রুপ তেমন কোন বিশেষ অসন্তুষ্টি ও জোরালো প্রতিবাদ প্রকাশ করেনি। ফলে তিউনিস পাশ্চাত্য নমুনার একটি দেশে পরিচিত হওয়ার আশংকা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ ব্যাপারে আরও দ্রুত গতিতে চেষ্টা চলছে।

আলজিরিয়া

১৯৬২ সালের ৩রা জুলাই লক্ষ লক্ষ মুজাহিদের নজীরবিহীন ত্যাগের ফলে সে দেশ থেকে ফ্রান্সের ক্ষমতা খতম হয়ে যায় এবং মুক্তিযুদ্ধের নেতাদের কাছে দেশের কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয়া হয়। ফরহাত আব্বাস ও আহমদ বিন বিল্লাহ্র নেতৃত্বে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হয় যা বিন খদ্দাএর প্রবাসী সরকারের স্থান গ্রহণ করে। ১৯৬৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর দেশবাসীর ভোট ও অভিমত গ্রহণ করা হয়। এতে আহমদ বিন বিল্লাহ্ আলজিরিয়ায় গণতান্ত্রিক সরকারের নিয়মিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। আহমদ বিন বিল্লাহ্ জামাল আবদুন নাসেরের বন্ধুদের একজন ছিলেন এবং তাদের দু'জনের চিন্তাধারাও প্রায় এক। আহমদ বিন বিল্লাহ্র নির্বাচনে জামাল আবদুন নাসেরের প্রভাব কিছুটা সহায়ক হয়েছিল। তার ক্ষমতায় আসার ফলে আলজিরিয়া সমাজতন্ত্রের রাস্তা গ্রহণ করেছে এবং তিনিও জামাল আবদুন নাসেরের ন্যায় দীনী মনোভাব সীমাবদ্ধ করতে এবং সরকার হতে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেন এবং কমিউনিস্ট দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক বাড়ালেন।

আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ জিহাদী জোশ, শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও ইসলামের মর্যাদাবোধের ভিত্তির ওপর সংঘটিত হয়েছিল। এতে ত্যাগ ও কুরবানীর এমন এমন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত অতীতে কয়েক শ' বছরের মধ্যে পাওয়া যায় না।[১]

কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এমন সব লোকের হাতে যায় যাদের শিক্ষা দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও আত্মিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হয়নি। তারা ফ্রান্সের সামরিক বিদ্যালয়ে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাদের

১. আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে ১৫ লাখ লোক শহীদ হয়েছেন, الاصالة الجزائر।

মধ্যে কয়জন তো এমনও ছিলেন যাদের আরবী ভাষার জ্ঞান ছিল না এবং তারা বহু দিন যাবৎ কারাগারে অথবা অনৈসলামী পরিবেশে থাকার কারণে ইসলামের নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন! তারা দেশ গঠনের কাজে ইসলামী আবেগের সাহায্য নিলেন না, বরং দেশ গঠন অনৈসলামী ভিত্তির ওপর করতে চেষ্টা করলেন।[১]

এই অবস্থার কিছুটা ধারণা পাওয়া যবে যার বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার ইসলামী রূহ ও শহীদগণের রক্ত বিক্ষোভ করছে– আলজেরিয়ার আলেমদের এক বিবৃতি হতে যা আমার নিকট লন্ডনের এক ইয়াহুদী পত্রিকা (Jewish Observer)-এর মাধ্যমে পৌঁছেছে। উল্লিখিত সংবাদপত্রে ১৯৬২ সালের ৩১ আগস্টের সংখ্যায় আলজেরিয়ার এক পত্র লেখকের বরাত দিয়ে লেখা হয়েছে :

আলজেরিয়ার দীনী পরিচালকগণ ঘোষণা করেছেন যে, আলজেরিয়াতে ইসলাম ও আরবী ভাষা প্রধান্য লাভ করবে। তারা এক বিবৃতিতে ঐ সকল জাতীয়তাবাদী নেতার সম্পর্কে ভীষণ আপত্তি করেছেন যারা বর্তমান যুগের অনুসরণে এক আধুনিক সমাজতান্ত্রিক আলজেরিয়া রাষ্ট্রের পক্ষপাতী যাতে ধর্মের প্রশাসনিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না।

আলেমদের এই বিবৃতিতে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের সঙ্গে ওয়াদা খেলাপ করা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে এবং ঐতিহাসিক উদ্দেশে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়েছে বলে বোঝা যাবে যদি ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ও আরবী ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গণ্য করা না হয়।

যুদ্ধ বন্ধের ইরিয়ান চুক্তিতে পরিষ্কারভাবে একথা প্রকাশ রয়েছে যে, আলজেরিয়ার ভবিষ্যত সংবিধানে একটি ধারা থাকবে ধর্মের স্বাধীনতা সম্পর্কে। আর একটি ভাষা সম্পর্কে ফরাসী ও আরবী উভয় ভাষাই রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা । দেশের প্রতিনিধিগণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ৯ই সেপ্টেম্বর তারা একত্র হবেন এবং দেশের সংবিধানের খসড়া তৈরি করবেন। এই বৈঠক কয়েক দফা মুলতবি

---

১. ১৯৬২ সালের ৫ই এপ্রিল ভারতের ইংরেজী সংবাদপত্রে দিল্লীর এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, ভারতে আলজিরিয়ার অস্থায়ী প্রতিনিধি জনাব বকর অদ্য এখানে এক প্রেস কনফারেন্সে বললেন, স্বাধীন আলজিরিয়া একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ হবে। অবশ্য এর কালচার আরব ও ইসলাম হবে। সমস্ত দেশবাসীর অধিকার ও বিধি-বিধান এক প্রকার হবে এবং জাতিসংঘ অনুমোদিত মানবিক অধিকারসমূহ আলজিরিয়াতে কার্যকর হবে।

রাখা হয়েছিল এবং সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের দ্বন্দ্বের কারণে এই তারিখেও বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

এখন আলজিরিয়ার আলিমগণ ফ্রান্সের ক্ষমতা খতম হওয়ার পর এই প্রথমবার প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছেন যে, শুধু স্বাধীনতা ও দেশে জীবিকা অর্জনের পার্থিব উন্নয়ন আলজিরিয়া বিপ্লবের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তারা বিবৃতিতে বলেছেন যে, প্রতিটি স্বাধীন জাতি নিজের একটি ভিন্ন অস্তিত্ব রাখে। যদি তা না হয়, তাহলে বিশ্বে জাতিসমূহ একে অপরের সঙ্গে এভাবে মিলেমিশে যেত, যেমন পানিতে মাছ। আলজিরীয়, ফরাসী ও স্পেনীয়দের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকবে না। যদি এরূপ হয়, তাহলে এর অর্থ এই হবে যে, আলজিরিয়া একটি সুস্পষ্ট আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আমরা এ ধরনের অবস্থার সঙ্গে মতবিরোধ রাখি।

আমরা আলজিরিয়াবাসী, আমাদের এক বিশেষ স্বাধীন ও দেশীয় স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। আর তা হলো আমাদের এই দীন ইসলাম, আমাদের ভাষা, আমাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস। এগুলোই হল এই রাষ্ট্রের স্পষ্ট সর্বজনবিদিত নিদর্শন ও আদর্শ।

আলিমদের এই বিবৃতিতে এও ছিল যে, ইসলামকে রাষ্ট্র হতে পৃথক করার চেষ্টার অর্থ বিপ্লবের উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, খোদ মুসলিম মিল্লাতের ঘরে ইসলামের ওপর আক্রমণ এবং তা আলজিরীয় জাতির মানহানির তুল্য বলে গণ্য হবে।[১]

১৯৬৫ সালের সামরিক বিপ্লবের পর হুয়ারী বুমেদীন ক্ষমতায় আসলেন। আহমদ বিন বিল্লাহকে বন্দী করা হলো। বুমেদীন আহমদ বিন বিল্লাহ্র মোকাবিলায় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার চেয়ে পরিচালনার বুদ্ধি বেশি রাখতেন। এ কারণে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে আরবী ভাষার প্রচার ও প্রসারে মনোযোগ দিলেন এবং দেশকে নতুনভাবে গঠন করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করলেন। আহমদ বিন বিল্লাহর ন্যায় মাঠে নেমে চিৎকার করে কাজ উদ্ধার করা হতে বিরত রইলেন। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের দিকে তিনি মনোযোগ দিলেন। কিন্তু নিজের বিশেষ স্বভাব ও আলজিরিয়ার স্থানীয় বিষয়সমূহের জটিলতার কারণে ইসলামী বিশ্বের বিষয়সমূহের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেননি। এ কারণে আলজেরিয়া যেখানে অন্য দেশসমূহের জন্য সাহস ও বীরত্বে, দীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ও দীনের জন্য আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে

১. المسلمون। সংখ্যা ৯ই জমাদিউল উলা ,১৩৮২ হি. (অক্টোবর ১৯৬২ খ্রী.)।

দৃষ্টান্ত ও প্রেরণা হতে পারত তা হতে পারেনি। তারা এই কর্তব্য পালনে আকৃতকার্য হয়েছে।

আলজিরিয়ায় যে রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপিত হয়েছে তাতে সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের রীতিনীতি গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাদের সৃষ্টি সমাজতন্ত্র প্রয়োগের দিকেই অধিক নিবদ্ধ হয়েছে। সমাজতন্ত্র গ্রহণ ও তাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে আলজিরিয়াতে চিন্তার বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে যা অন্য ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহেও দেখা যায়।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে আলজিরিয়া প্রাচ্য আরবের ঐ সমস্ত দেশের সঙ্গে বেশি সম্পর্ক ও সম্বন্ধ স্থাপন করেছে যারা সমাজতান্ত্রিক মনোভাব পোষণ করে। সমাজতান্ত্রিক চিন্তা করার কারণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে ও ইসলামকে পুনরুজ্জীবন দান করার প্রচেষ্টাকারী দলের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে। আলজিরিয়াতে শাসন, পরিচালনা, শিক্ষা প্রদান ও রাজনৈতিক সংগঠনের দায়-দায়িত্ব কেবল ঐ সমস্ত লোককে দেয়া হয়েছিল যারা সমাজতান্ত্রিক মনোভাব রাখত। রাবেহ বেতাত রাষ্ট্রপতি বুমেদীনের ইন্তিকালের পর কিছুকাল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

তিনি রাজনৈতিক সংগঠন "হিজবুত জিহাতিত তাহরীরিল-ওতনী"-এর সমাবেশে স্পষ্ট ভাষায় পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন যে, দেশে সমাজতন্ত্র ঐ সময় পর্যন্ত আসতে পারবে না, যে পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে ঐ সমস্ত লোক নিযুক্ত হবে না, যারা সমাজতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। রাষ্ট্রপতি এতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যারা একমত নয় তাদেরকে প্রসাশন হতে অপসারণ করা হয়েছে এবং তাদেরকে খতম করে দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব হলো জাতির মনোভাব সৃষ্টি করা এবং ভবিষ্যতের জন্য জাতির পরিচালক সরবরাহ করা। তাই প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। জাতীয় কর্মসূচি অনুযায়ী একমুখী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে দীনী শিক্ষা পার্থিব যুগোপযোগী শিক্ষার অধীন হয়েছে। এই অবস্থার দরুন যে ক্ষতি হয়েছে তার উল্লেখ করে আলজিরিয়ার চিন্তাবিদ ও আলিম শেখ আহমদ হাম্মানী ইসলামী কাউন্সিলের সভাপতি "হিজবুত জিহাতিত তাহরীরিল ওতনী"-এর

৪র্থ বৈঠকে অভিযোগ ব্যক্ত করেছেন। উক্ত সভায় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি রাবেহ্ বেতাত ও নতুন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আশ্‌শাযিলী বিন জদীদ উপস্থিত ছিলেন।

"দীনী শিক্ষা আলজিরিয়ায় গুরুত্ব সহকারে সব সময় পরিচালিত হয়েছে। আলজিরিয়া এই সম্মানে সম্মানিত যে, উমর বিন আবদুল আযীয (র) দশজন ফকীহকে এখানে শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। পুরাতন যুগে দীনী শিক্ষার এমন কেন্দ্র ছিল যেখানে ইউরোপ হতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছাত্র আসত এবং এখান হতে এই সমস্ত জ্ঞান ইউরোপ আমদানী করত। দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জিহাদের আন্দোলনকালেও তার কাজ চালিয়ে গিয়েছে এবং জাতি গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি মুতাবিক শিক্ষার জন্য যে সাধারণ একমুখী পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে তা দ্বারা দীনী শিক্ষাকেন্দ্র ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমাদের ধারণা ছিল, এই শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীনী শিক্ষা প্রচলিত হবে এবং দীনী শিক্ষাই সাধারণ শিক্ষার রূপ নেবে, কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি বিপরীত ফলাফল প্রদান করেছে।"

শেখ হাম্মানী এই আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, কিছুদিন পর ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ উচ্চ শিক্ষা হতে বঞ্চিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যে দীনী শিক্ষার বাধ্যতামূলক ও সংকুচিত ব্যবস্থা রয়েছে তা দীনী মনোভাব সৃষ্টি করার ও দীনী জ্ঞান সুচারুরূপে প্রদানের যোগ্যতা রাখে না। এই শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা যে মানুষ সৃষ্টি হবে তারা দীন ও নিজ সংস্কৃতির সঙ্গে অপরিচিত থাকবে। তিনি এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দাবি করলেন যে, আকীদা, ইবাদত, মুআমেলা (পার্থিব কাজ-কারবার) ও নৈতিক বিষয়ে ইসলামী শিক্ষা প্রতিটি স্তরে দাখিল করা হোক! স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি স্তরে ইসলামী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হোক, যেভাবে অন্যান্য বিভাগে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এর উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য ঐ সমস্ত উপায় গ্রহণ করা হোক যে সমস্ত উপায় অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী কলেজ স্থাপন করা হোক! ঐ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ মনোভাবের শিক্ষক নিয়োগ করা হোক যারা ঐ সমস্ত বিষয়ে যোগ্যতার অধিকারী এবং দীনী জ্ঞান ও অনুভূতি অনুযায়ী আমলও রাখেন।

কুরআন পাককে হিফজ করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হোক এবং হাফিযদেরকে উৎসাহিত করা হোক! মাদ্রাসা-মসজিদসমূহকে পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা চাঁদার মাধ্যমে সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা উঠিয়ে দেয়া হোক, যাতে এ সকল প্রতিষ্ঠান স্বাবলম্বী হতে পারে। আলিম ও ইমামদের দীনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক যাতে বাইরে থেকে কোন শিক্ষক আমদানী করার প্রয়োজন না হয়।

টেলিভিশন, রেডিও ও তথ্য প্রচারের মাধ্যমসমূহে দীনী বিষয় প্রচার ও শিক্ষা দান সংক্রান্ত সম্প্রচারসমূহের জন্য সময় বৃদ্ধি করা হোক এবং এজন্য ধার্মিক ও শিক্ষিত লোক নিয়োগ করা হোক! ইসলামী শিক্ষার কদর করতে হবে। ঐ শিক্ষার প্রতি হাসি-তামাশাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ফিল্ম ও রেডিও'র এমন প্রোগাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার বড় বড় নিদর্শন ও ইসলামী রীতিনীতির অবমাননা বোঝা যায়।[১]

শেখ আহমদ হাম্মানীর দাবিসমূহ দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে, আলজিরিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা দীন ও নৈতিক বিচারে কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষানীতি, যা ভবিষ্যতের নেতা তৈরি করার দায়িত্বে নিয়োজিত ও প্রচারের মাধ্যমসমূহ যা বর্তমান প্রজন্মকে শিক্ষা দিচ্ছে তা দেশের জন্য নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য না জানি আরো কী কী বিপদ ডেকে আনে।

এর সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আলজিরিয়ার নেতাগণ সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ ও সমাজের প্রতিটি স্তরে এর সামাজিক, চারিত্রিক ও চিন্তাগত মূল্যবোধসমূহ রেওয়াজ দেয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার শিথিলতা ও কোমলতা প্রদর্শন করতে সম্মত নয়, বরং তারা তা পরিষ্কারভাবে ঘোষণাও করে থাকেন। যদিও তারা এর সঙ্গে ইসলামেরও নাম নিয়ে থাকেন। এ দ্বারা দেশের নেতৃত্ব ও দেশের জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে ও দীনী নেতৃত্বর মধ্যে চিন্তাগত বৈরিতা সৃষ্টি হওয়া নিশ্চিত।[২]

এই স্বাধীনতা লাভকারী আরব দেশসমূহে তার জাতীয়তাবাদী পরিচালকগণ সব সময় ইসলামের সঙ্গে যুক্ত থাকার চিত্তাকর্ষক কথা প্রকাশ করে থাকেন। তারা এই

---

১. الاصالة আলিজিরিয়া।

২. ওজিহ রাশীদ নদভী লিখিত আলজিরিয়ার নতুন অবস্থার ওপর এ বিশদ বর্ণনা।

সত্য সম্পর্কে অনবহিত নন যে, এখনও ইসলাম তাদের ও জনসাধারণের মধ্যে সর্ববৃহৎ বন্ধন ও ইসলামের নাম নেয়া ছাড়া লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোকের হৃদয়ের ওপর শাসন করা যায় না। কিন্তু তাদের হৃদয়ে ইসলামের যে অর্থ বিদ্যমান তা এ যাবত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মন ও মগজে যে ইসলাম রয়েছে তা থেকে ভিন্ন। তাদের নিকট ইসলামের অর্থ ঐ সংশোধিত (Reformed) ধর্ম যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও মূলবোধসমূহের অনুরূপ এবং তাদের জাতীয়তা-বাদিতার সাথী ও সহযোগী হতে পারে।

তদুপরি তাদের ইসলাম আকীদা ও চারিত্রিক বিষয়সমূহে সীমাবদ্ধ একটি ব্যবস্থা যা তাদের আইন প্রণয়ন, রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধাসমূহে ও যাবতীয় কার্যকলাপে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। এক বিজ্ঞ লেবাননী আরব এই চিত্রের এক বিবরণ দিয়েছেন যা অতিরঞ্জিত নয় এবং প্রকৃত অবস্থা হতে দূরেও নয়। বিবরণটি আমেরিকার প্রসিদ্ধ পত্রিকা Muslim World-এ বর্তমানে প্রকাশ পেয়েছে। ড. সালেম, Nationalism and Islam নামক তার প্রবন্ধে লিখেছেন :

এই উদ্দেশে জাতীয়তাবাদ ইসলামের সাথে পূর্ণ ঐক্য সৃষ্টি করেছে, কিন্তু যে ইসলামকে জাতীয়তাবাদ নিজস্ব করে নিয়েছে তা সেই পুরাতন শুদ্ধ ইসলাম নয়, বরং তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আধুনিক ইসলাম। আধুনিকতার এই উপহারের ওপর ইসলামের কেবল গেলাফ চড়ানো হয়েছে। মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন পাকের নাম অবশ্য নেয়া হয়। নেয়া হয় এ কারণে যেন প্রতিটি ঐ সমস্ত জিনিসের জন্য যা জাতীয়তাবাদিগণ গ্রহণ করতে চায় তার আইনগত সনদ হস্তগত হয়। আরব জাতীয়তাবাদ এই ইসলামের আবরণে আবৃত থাকার কারণে জনগণের নিকট গ্রহণীয় হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এ কথাই বলা চলে যে, আরব জাতির জন্য একটি নতুন আকৃতি উদ্ভাবন করার জন্য আরব জাতীয়তাবাদ ইসলামের নামের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছে। আরবী জাতীয়তাবাদীর ইসলামী ও আরবীয় এই উভয়ের মিলিত দ্বাপের প্রয়োগ দ্বারা পূর্ণ জয় অর্জন করেছে।[১]

১. মুসলিম ওয়ার্ল্ড পত্রিকার প্রবন্ধ Nationalism and Islam, পৃ. ২৭, অক্টোবর ১৯৬২, সিদকে জদীদের অনুবাদ, ৩০ নভেম্বর ১৯৬২।

সমাজতন্ত্র ও তার মিত্র

আলিজিরিয়ার সাবেক রাষ্ট্রপতি বুমেদীন নিজের সমসাময়িক আরব নেতাদের মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রীতিতে ও রাজনৈতিক ব্যাপারে রাশিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করার কাজে অগ্রণী ছিলেন। যখন ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে রাশিয়া এমন পন্থা অবলম্বন করলো, যা পরাজিত আরবগণ কখনও আশা করেনি। এর ফলে সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল আরব দেশসমূহে অসন্তুষ্টি ও নৈরাশ্যের তরঙ্গ প্রবাহিত হলো এবং রাশিয়ার নিষ্ঠা ও বন্ধুত্বের ওপর তাদের বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে উঠল, এমন সময় রাষ্ট্রপতি বুমেদীন আরব দেশ ও আরব জাতিসমূহের মধ্যে রুশ প্রীতির নতুন সূত্র আবিষ্কারের ব্যাপারে নতুন করে তার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এভাবে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের সীমায় নতুন নতুন প্রবেশকারী কিছু দেশে ইসলামী নিয়ম-পদ্ধতির পরিবর্তন করার এবং দ্রুত গতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার উন্মাদনা প্রবল আকারে দেখা দেয়। এই পর্যায়ে বুমেদীন কোন কোন সময় মৌলিক মানবিক অধিকার ও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহকে পদদলিত করতেও দ্বিধা করেননি। তাদের নেতাদের দ্বারা কোন সময় পশু প্রকৃতির বর্বরতা ও অত্যাচার প্রকাশ পেয়েছে যার তুলনা বর্তমান সভ্য জগতে পাওয়া কঠিন। তদ্রূপ গণপ্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ ইয়ামন হতে ইসলামী রীতিনীতি উৎখাত, দীনী আলিমদের অবমাননা ও দীনকে হেয় প্রতিপন্ন করার অনেক সংবাদ আসে। তা দ্বারা তাদের অপটু মনোভাব, প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা ও দীনের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়।

সংবাদদাতা এজেন্সিগুলো ও ইউরোপীয় সংবাদপত্রসমূহ এই সংবাদ প্রচার করেছে যে, আলিমদের একটি দল (১০ জন ছিল) সুমালিয়াতে এই কারণে অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছিল যে, তারা এমন কতক আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন যা কুরআনের প্রকাশ্যে আদেশ ও ইসলামের স্বীকৃত নিদর্শনের বিপরীত ছিল, যেমন মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি পুরুষ ও নারীর সমান সমান পাওয়া, মহিলাদেরকে তালাকের অধিকার দেয়া ইত্যাদি।

লিবিয়া[১]

উত্তর আফ্রিকার প্রসিদ্ধ দেশ লিবিয়া। এর সীমা পূর্বে মিসর ও সুদান, দক্ষিণে চাদ ও নাইজিরিয়া, পশ্চিমে আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়া এবং উত্তরে ভূমধ্যসাগর। গত কয়েক বছর হতে অধিক পরিমাণ পেট্রোল পেয়ে যাওয়ার ফলে এই দেশের গুরুত্ব খুবই বেড়ে গেছে।

সায়্যিদ মুহাম্মদ বিন আলী আস-সনোসী (১৭৯১-১৮৫৯ খ্রী.) একজন প্রসিদ্ধ তরীকতপন্থী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি তার তরীকতের শিষ্যদের শিক্ষা দানের জন্য এখানে ১৮৪৩ সালে অবস্থান করেছিলেন। তার দ্বারা সুদানে, আফ্রিকার মরু অঞ্চলে ও পশ্চিম আফ্রিকায় মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের অনেক প্রচার হয়েছে। তিনি মুসলমানদের দীনী বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে তাদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। তার দাওয়াত ও জিহাদের আন্দোলনের প্রভাব লিবিয়া ও মধ্যআফ্রিকায় দ্রুত গতিতে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

১৮৫৯ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্র সায়্যিদী মেহদী আস্-সনোসী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন অতি যোগ্য ব্যক্তি। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সাহাবাই কিরাম (রা) ও প্রথম যুগের মুসলিমদের নমুনায় আত্মিক শিক্ষা, শারীরিক প্রশিক্ষণ, মুজাহাদা ও জিহাদ, এই বিষয়গুলোর মধ্যে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে মিলন ঘটান। তাঁর প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং জ্ঞান ও কর্মের পরিপূর্ণতা মরুভূমিকে বাগানে, রূহানী ইবাদতখানাকে মাদ্রাসা ও মাহফিলে এবং ছাত্র ও তরীকতপন্থীদেরকে ত্যাগী মুজাহিদে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁর ভাতিজা সায়্যিদী আহমদ আশ-শরীফ (যিনি ইমাম সনোসী নামে বিশ্ব প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন) তার পরে এই আন্দোলনকে আরো উজ্জ্বল করেছেন এবং বরকা ও ত্রিপোলির যুদ্ধে ইটালি ও ইউরোপকে নিজের ও নিজ মুজাহেদীনের বীরত্ব, দৃঢ়তায় ও নিজ নেতৃত্বের যোগ্যতায় স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য করেছেন। সনোসী মুজাহেদীন পূর্ণ ১৩ বছর ইটালির মজবুত ও বৃহৎ রাজত্বের মুকাবিলায় যুদ্ধ করতে থাকেন। অবশেষে ইটালি লিবিয়া ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

---

১. এই শিরোনামের প্রবন্ধটি মাও: ওয়াযেহ রশীদ নদভী রচিত।

১৩৫১ হি. মুতাবিক ১৯৩২ সালে সায়্যিদী আহমদ আশ-শরীফ মদীনা মুনাওয়ারাতে ইন্তিকাল করেন।[১]

১৯৫১ সালে লিবিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং সায়্যিদী মুহাম্মদ ইদ্রীস আস-সনোসী ১৯৫২ সালে প্রথম শাসক নির্বাচিত হন। তিনি সায়্যিদ মেহেদীর পুত্র ও ইমাম সনোসীর চাচাত ভাই ছিলেন।

সনোসী শেখদের আত্মিক শিক্ষা, দাওয়াত ও জিহাদী কর্মতৎপরতায় লিবিয়ার জনসাধারণের ওপর দীনের প্রভূত প্রভাব পড়েছিল। তাদের দাওয়াতের ফলে এমন মজবুত ভিত্তি তৈরি হয়েছিল যাকে কোন নেতৃত্ব সহজে টলাতে পারেনি। এ কারণেই লিবিয়ার জনসাধারণ প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল পাওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের শিল্প ও সংস্কৃতির গভীর প্রভাব হতে বহুল পরিমাণে রক্ষা পেয়েছে।

১৯৬৯ সালে লিবিয়াতে সামরিক বিপ্লব ঘটে। কর্নেল মুহাম্মদ (মুআম্মার) গাদ্দাফী যার বয়স ঐ সময় কেবল ৩৭ বছর ছিল, বিপ্লবী কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন। সভাপতি হিসেবে তিনি দেশের নেতৃত্ব নিজ হাতে নিলেন। কর্নেল গাদ্দাফী বিপ্লবী সরকারের ভিত্তি আরব জাতীয়তা ও পাশ্চাত্যের দাসত্ব হতে পূর্ণ মুক্তির ওপর রাখলেন, বৃটিশ ও আমেরিকার সামরিক ঘাঁটির চুক্তি রহিত করলেন এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের স্থলে আরব বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়োগ করলেন। আরবী ভাষার প্রচার ও উন্নতির জন্য আদেশ দিলেন, মদ নিষিদ্ধের আদেশ জারি করলেন এবং কোন কোন শরীয়তী আইন প্রয়োগ করলেন।

বৃটিশ ও ইটালি শাসনকালে খৃস্টানদের যথেষ্ট প্রভাব লিবিয়ায় ছিল। কর্নেল গাদ্দাফী ঐ সব অপসারণ করার জন্য খৃস্টান মিশনারীদের প্রতি বিধিবদ্ধ কিছু আইন জারি করলেন। লিবিয়ার সামরিক শক্তি বাড়াবার জন্য অনেক রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন এবং ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক চুক্তি করলেন। শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। পূর্ণ বয়স্কদের শিক্ষার জন্য রাত্রিকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন।

কর্নেল গাদ্দাফীর এই সমস্ত সংশোধনী পদক্ষেপ ও প্রাথমিক আমলে ধর্মীয় প্রবণতার কারণে পাশ্চাত্য প্রেসসমূহ তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়। তারা

---

১. সনোসীদের জীবনী, বিশেষ করে আহমদ শরীফ সাহেবের জিহাদী কার্যকলাপ যা জানতে হলে حاضر العالم الاسلامی ২য় খণ্ড পড়ুন। আমীর শকীব আরসলানের বিস্তারিত প্রবন্ধ সায়্যিদী আহমদ ও সনোসিয়া, ১৪০-১৬৫ পৃ. ও মুহাম্মদ ফুয়াদ শুকরীর কিতাব আস-সনোসীয়া, দীন ও দাওলাহ দেখুন।

গোঁড়া ধর্মীয় নেতা হিসেবে পাশ্চাত্য সংবাদপত্রসমূহে তাকে পেশ করতে শুরু করে। ফলে তার দ্বারা ইসলামের পুনর্জীবন লাভ করেছে এমন সব বিবরণ খুব জোরে প্রচার হতে থাকে।

এটা এক আশ্চর্যের কথা যে, খৃস্টানদের বিরুদ্ধে কর্নেল গাদ্দাফীর ব্যবস্থাপনাও কোন কোন পাশ্চাত্য দেশ, বিশেষ করে বৃটিশ ও আমেরিকার সঙ্গে সামরিক চুক্তি রহিতকরণ সত্ত্বেও পাশ্চাত্য প্রেসে তার বিরুদ্ধে ঘৃণা অথবা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়নি বরং এর পরিবর্তে তার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে ও ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে তার গুরুত্ব বাড়াতে পাশ্চাত্য প্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কোন কোন পাশ্চাত্য সংবাদ পরিবেশক তাকে এই সময়ের মুহাম্মদ পর্যন্ত বলতে কুণ্ঠিত হয়নি।

কর্নেল গাদ্দাফী স্বভাবজাত কারণে প্রথম থেকেই ভারসাম্যহীন চূড়ান্ত ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি প্রেসের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত ধারণা অনুযায়ী ইসলামকে জীবিত করায় অসাধারণ উৎসাহ ও তার পতাকাধারী হওয়ার দাবি করার কারণে তিনি বিভিন্ন বিশ্ব কনফারেন্স, খৃস্টান ও মুসলমানদের সেমিনারে অংশ গ্রহণ ও পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এই কারণে অতি সত্বর তার বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রভাব রাজনীতি হতে শুরু করে দীনের বিপ্লব সৃষ্টি পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যায়।

রাজনৈতিক ময়দানে যে সমস্ত পদক্ষেপ তার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে সে সব থেকে তার ভারসাম্যহীন অস্থির মনোভাবের প্রমাণ মেলে। ১৯৭১ সালে মিসর ও সিরিয়ার সঙ্গে একত্র হওয়ার কাজে শরীক হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে মিসর ও লিবিয়ার মধ্যে পূর্ণ একতা স্থাপিত হয়। এই একতার প্রস্তাব গাদ্দাফী নিজেই করেছিলেন।

জামাল আবদুন নাসের সম্পর্কে কর্নেল গাদ্দাফীর ধারণার প্রকাশ ঐ সময় হয়েছে, যখন আনওয়ার সাদাত অতীতের কোন কোন কাজ ও সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তখন মিসরের কিছু পত্রিকায় নাসেরের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং নাসেরের কোন কোন বিশ্বস্ত লোককে সরিয়ে দেয়া হয়। মুআম্মার গাদ্দাফী তখন নাসেরের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও সংযোগের কথা বললেন এবং তিনি নিজেকে নাসেরের শিষ্য বলে ঘোষণা করলেন। শেষ পর্যন্ত মিসর ও ইসরাইল যুদ্ধের সময় দুই দেশের মধ্যে ভীষণ মত বিরোধ দেখা দিল। নাসেরের

পর মিসরে ইখওয়ানের ব্যাপারে কিছু বাধা-নিষেধ সহজ করা হলো এবং ইসলামী সাহিত্যের প্রচার হতে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হলো। তখন লিবিয়াতে ইসলামী সাহিত্যের প্রচারের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হলো। ইসলামী লেখকদের প্রচারধর্মী কিতাবসমূহের ওপর কিছু বাধা-নিষেধ প্রবর্তন করা হলো।

মিসর-ইসরাইল যুদ্ধের পর রাশিয়া ও লিবিয়ার সম্পর্ক বৃদ্ধি হলো এবং রাশিয়া মিসরের স্থলে লিবিয়াকে মিত্র করে নিল। কর্নেল গাদ্দাফীর চিন্তাধারা প্রথম হতে বিপ্লবী ভাবাপন্ন ছিল। তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা বিপ্লবী উৎসাহে উজ্জীবিত ছিল। জামাল আবদুন নাসেরের ইন্তিকালের পর হতে বিশেষভাবে তিনি আরব জগতে শূন্যতা অনুভব করলেন। ঐ শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য তিনি কেবল নিজেকেই যোগ্য ব্যক্তি মনে করলেন। এই উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করার জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট রইলেন।

কর্নেল গাদ্দাফী প্রথম থেকে এই অনুমান করেছেন যে, এটা ইসলামের পুনর্জাগরণের কাল। এ কারণে তিনি প্রথম থেকে নিজেকে এ ভাবধারার নেতা ধারণা করলেন। কিন্তু বিপ্লবী মনোভাব, শিক্ষা-দীক্ষার স্বল্পতা, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব (যার ছায়ায় তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন), লিবিয়ার সম্পদ ও এর রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, আর্থিক গুরুত্ব ও সীমাহীন আত্মবিশ্বাস তার মনে এ ধারণার জন্ম দেয় যে, ইসলাম যা কুরআন ও সুন্নাহ হতে গৃহীত হয়েছে তা বিপ্লবী যুগের সাথী হতে পারে না বা তা এই যুগের কাজকর্মের যোগ্য নয়। এ কারণে তিনি ইসলামকে বিপ্লবী মনোভাবের ছাঁচে ঢালাই করার চেষ্টা করলেন যেন এ দ্বারা তিনি এমন ইসলামের সংস্করণ প্রস্তুত করতে পারেন যা এ যুগের পাশ্চাত্য পদ্ধতির সাথে সমভাবে চলতে পারে। এই বিপ্লবী চেষ্টার ফলে তাকে কোন কোন পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ এ যুগের নবী পর্যন্ত গণ্য করেছেন। আর কোন কোন বিপ্লবী মুসলমান তাকে এ যুগের মহান চিন্তাবিদ উপাধি দিয়েছেন।

কর্নেল গাদ্দাফী কতক পুঁজিবাদীর সৃষ্ট পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও কতক সমাজতন্ত্র মূল্যবোধ গ্রহণ করলেন। ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে তিনি লিবিয়াকে শিল্প পণ্যোৎপাদীদের শ্রেণীতে উন্নীত করার উদ্দেশে বিদেশীদেরকে অবাধ ছাড়পত্র দিলেন। ফলে ধর্মীয় বিবেচনার তোয়াক্কা ছাড়াই লিবিয়াতে বিদেশীদের বিপুল সংখ্যায় প্রবেশ ঘটে। ফলে লিবিয়ার সমাজ জীবনে মন্দ প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা ছিল তার প্রগতিপ্রিয়তা এবং শাসক মনোভাবের ফল।

কর্নেল গাদ্দাফী জামাল আবদুন নাসেরের ইন্তিকালের পর বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী মতবাদ প্রচার ও তথায় প্রতিষ্ঠিত শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবার কাজ নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। তিনি পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্ম ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করলেন। এ পর্যায়ে কতক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন এবং এমন কিছু বিবৃতিও দিলেন যা ইসলামের মীমাংসিত চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত ছিল। তার বিবৃতিসমূহ হতে জানা যায় যে, তিনি ইসলামকে কেবল কিছু অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রাখতে চান, ইবাদত ও সাধারণ জীবন সম্পর্কে তার ধারণা তিউনিসিয়ার হাবীব বুরাকীবার ধারণার বহু নিকটবর্তী। আর এই চিন্তাধারা পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদদের পক্ষ হতে সৃষ্টি করা সন্দেহ, দ্বিধা ও আপত্তিসমূহের ফল।

হাবীব বুরাকীবা কুরআনুল করীম সম্পর্কে নিজের সন্দেহ ও দ্বিধা প্রকাশ করেছিলেন এবং নামায, রোযার সময় ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিজের বিশেষ খেয়ালসমূহ পেশ করেছিলেন যা উম্মতে ইসলামিয়ার মীমাংসিত ব্যবস্থার বিপরীত ছিল। গাদ্দাফী ইসলামী জীবনের ওপর আক্রমণ করার জন্য হাদীসকে বাছাই করলেন। তার মত হলো হাদীসকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। অবশিষ্ট জীবন সম্পর্কে হাদীস এই যুগে সামঞ্জস্যহীন। গাদ্দাফীর এসব কথার স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামকে কেবল ইবাদত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা যাতে খৃস্ট ধর্মের মত ইসলামও জীবন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি এক সভায় আলিমদের সম্মুখে হাদীস সম্পর্কে এমন মত প্রকাশ করলেন যার ফলে ইসলামী গ্রুপ প্রতিবাদমুখর হলো। তার চিন্তাধারা কেবল হাদীসের অস্বীকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, তিনি বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-র আনুগত্য হতে অবাধ্যতার ধারণাও প্রকাশ করেন।

তিনি আলাপ-আলোচনায় দাবি করেন, হাদীসের শুদ্ধতা সন্দেহজনক। কারণ হাদীস সম্পাদনকালে তার মতানুসারে বহু জাল হাদীস হযরত ﷺ-র প্রতি আরোপিত হয়েছে। তিনি হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য প্রকাশ করতেও চেষ্টা করেছিলেন। যেভাবে তার পূর্বে তিউনিসের বুরাকীবা কুরআন পাকের মধ্যে বৈপরীত্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তৃতীয়ত তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, হুজুর ﷺ-এর প্রায় কথা সময়ের চাহিদা বা প্রয়োজন মুতাবিক ছিল। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এ কারণে দুনিয়ার কাজ-কর্মের সঙ্গে ঐ সমস্ত কথার বা

বাক্যের সমন্বয় করা হবে না। "انتم أعلم بأمور دينا كم" অর্থাৎ তোমাদের পার্থিব কাজ-কারবার সম্পর্কে তোমরাই ভাল জান। তার নিকট ঐ হাদীসের মর্মও তাই।

গাদ্দাফীর ধারণা এই যে, হাদীসের ওপর কার্যের ভিত্তি রাখা ঠিক নয়। কেননা এই হাদীস সহীহ্ কি বানোয়াট তা নির্ধারণ করা কঠিন। এ কারণে কেবল কুরআন পাকের ওপর নির্ভর করা উচিত।

গাদ্দাফীর সঙ্গে যখন আলিমগণ এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তিনি নিজ মতামতের ওপর জেদ করলেন। কোন কোন সংবাদপত্রের রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, তিনি আলিমগণকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, যদি আলিমগণ তার সংশোধনী পদক্ষেপে বাধা সৃষ্টি করেন, তা হলে তাদের সঙ্গে ঐ ব্যবস্থা করা হবে যা মুস্তফা কামাল আলিমদের সঙ্গে করেছিলেন। এই আলোচনায় তিনি মুস্তফা কামালের কার্যকলাপকে গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই আলোচনা হতে স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি মুস্তফা কামাল দ্বারা পূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। জামাল আবদুন নাসেরের শিষ্য হওয়ার কথা তিনি প্রায়ই প্রকাশ করতেন। ইবাদত ও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে হাবীব বুরাকীবার সাথে তার মতৈক্যের কথা এখন আর গোপন নেই। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনিও ঐ এক শিকলের কড়িবিশেষ এবং তিনিও ঐ একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রমাত্র। তিনি নিজের চিন্তা-কল্পনাকে একটি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন যে যা আল-কিতাবুল আখযার (সবুজ গ্রন্থ) নামে প্রসিদ্ধ। তাতে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তার চিন্তাধারা পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

হিযবুত তাহরীর নামে এক প্রসিদ্ধ আরব জামাআতের এক প্রতিনিধি দল গাদ্দাফীর সঙ্গে দেখা করে তার চিন্তাধারা ও ধারণার সংশোধন করার[১] চেষ্টা করলেন। তা ছাড়া রাবেতা আলমে ইসলামীর একটি সম্মানিত প্রতিনিধি দল যাতে বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধি ছিলেন, তার সাথে দেখা করেন এবং তার সঙ্গে তার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু এই আলোচনা দ্বারা তার ধারণা ও মতামতের কোন পরিবর্তন আসেনি।

প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গাদ্দাফী বললেন, নামায, রোযা, হজ্জ্ব আদায় সম্পর্কিত হাদীসসমূহকে তিনি মেনে নেবেন। অবশ্য অপর বিষয় তিনি কেবল ঐ সমস্ত

---

১. এর রিপোর্ট অথবা এর উর্দূ অনুবাদ تعمير حيات ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, ১৫ই মার্চ ১৯৭৯ দেখা যেতে পারে।

হাদীসকে মানবেন যা তার কাছে শুদ্ধ বলে গণ্য হয় অথবা বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গে খাপ খায়। প্রতিনিধি দল তাকে হাদীসের শুদ্ধতা সঠিক হওয়া ও পূর্ণ জীবনের ওপর হাদীসের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি কুরআন পাকের আলোকে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং তাকে নিজ ধারণা হতে ফিরে আসতে ও তওবা করতেও চাপ দিয়েছিলেন। কথাটির উত্তরে বললেন, তিনি তার বক্তব্য ও অভিমত বিস্তারিতভাবে একটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশ করবেন।

ইসলামী বর্ষপঞ্জীর ওপর আপত্তি

হাদীসের বিষয়ে জনসাধারণের মতের সঙ্গে বিরোধিতা করার পর গাদ্দাফী হিজরী সন সম্পর্কে এক বক্তৃতায় আপত্তি করলেন। তিনি বললেন, হিজরতের সময় হতে বর্ষপঞ্জীর গণনা করা ভুল। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো হুজুর ﷺ-র ইন্তিকাল; কাজেই ইন্তিকালের তারিখ হতে বর্ষপঞ্জীর আরম্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আলিমদের বোঝাবার পরও লিবিয়ায় গাদ্দাফীর মতানুযায়ী সংশোধিত ক্যালেন্ডার চালু হয়েছে।

তাছাড়া সংবাদপত্রের কোন কোন সংবাদ হতে এ কথাও জানা যায় যে, কুরআন ও নামাযের নিয়ম-পদ্ধতির ওপরও গাদ্দাফীর ধারণা ও চিন্তা স্বীকৃত ও গৃহীত ইসলামী আকীদার বিপরীত যা তিনি বিভিন্ন সভায় প্রকাশ করেছেন। এতে প্রকাশ পায় যে, তার ধারণা ও খেয়ালের উৎস হলো পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের ও ইসলামের শত্রুদের কথা ও দৃষ্টিভঙ্গি। এতে তাঁর নতুন কিছু করার মনোভাব ও অন্যের সাথে তাঁর মতপার্থক্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

লিবিয়া ও মরক্কো

লিবিয়া ও মরক্কো দু'টি মুসলিম দেশ। আরব মুসলিমগণ সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই দু' আরব দেশ দীনের দাওয়াত, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ ও ইসলামের জন্য ত্যাগ ও উৎসর্গের এক অতুলনীয় নমুনা পেশ করে স্বাধীনতা এনেছে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করেছে। উভয় দেশে ঐ সমস্ত পরিবার শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছে, যাদের বংশাবলীর ভদ্রতায় ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক পর্যায়েও উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। ঐ দু' দেশের মুসলমানগণ (আরব ও বরবর) তাদেরকে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে দেখতেন এবং তাদেরকে দেশের রাজনৈতিক নেতা ও পরিচালক মনে করতেন, তদুপরি তাদেরকে আধ্যাত্মিক গুরু ও দীনের পৃষ্ঠপোষক বলে জানতেন এবং মানতেন।

মরক্কোতে শত শত বছর পর্যন্ত সায়্যিদী ইদ্রীস ও সায়্যিদী আলী আশ-শরীফের পরিবারবর্গ শাসন পরিচালনা করেন। লিবিয়া সায়্যিদ আহমদ আশ-শরীফ আস-সনোসী ও তার বন্ধুদের জিহাদী কার্যকলাপ ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে ইতালির দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ করেন এবং স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের সুযোগ পায়, কিন্তু বর্তমানে এই দু' দেশ সভ্যতা, সামাজিকতা ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ও জীবনের বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনার কাজে পাশ্চাত্যকেই কার্যত নিজেদের ইমাম মানে। রেডিও, টেলিভিশন ও আধুনিক শিক্ষা সেখানে এমন এক বংশ তৈরি করেছে, যাদের অনুভূতি, আবেগ, উদ্যম, মর্যাদা ও মান ঐ বংশ হতে মৌলিকভাবে ভিন্ন হতে চলেছে, অথচ তাদের পূর্বপুরুষদের ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে এই সমস্ত দেশে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছিল এবং তারা সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিল।

বর্তমানে উভয় দেশে সমাজতন্ত্রের প্রবণতা পাওয়া যায়। দু' দেশে ইসলামী চিন্তাবিদ ও দাওয়াতের পতাকাবাহকদেরকে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। লিবিয়া যে দর্শন ও পন্থা অবলম্বন করেছে তা ইসলাম, সমাজতন্ত্র ও আরবীয় জাতীয়তার সংমিশ্রণ। সে দেশের নেতা গাদ্দাফী মিসরের সাবেক রাষ্ট্রপতি জামাল আব্দুন নাসেরকে সর্বদা নিজের শিক্ষক, গুরু ও এক আদর্শ ব্যক্তিত্বরূপে মেনে নিয়েছেন। উভয় দেশের নেতাদের উদ্দেশ্য এবং ঘোষণা পরিষ্কার না হওয়া সত্ত্বেও এত দূর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, উভয় দেশ পাশ্চাত্যকে চিন্তা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে নিজেদের নেতা ও পরিচালক মেনে নিয়েছে এবং তারা খুব সাবধানতার সঙ্গে খুব ধীর গতিতে ঐ মঞ্জিলের দিকে অগ্রসর হতে উৎসাহী।

ভাঙ্গা ও বিধ্বস্ত করার কর্ম এবং পুরাতন খড়-কুটার অপসারণ

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও দর্শনের এই বৃক্ষের লালন-পালন ও ক্রমবিকাশের জন্য ইউরোপের পানি ও বাতাস খুবই উপযোগী। তার আহার্য ও প্রতিপালনের প্রচুর উপাদান ইউরোপে প্রস্তুত ছিল। এখন তা পাশ্চাত্য হতে ইসলামী ভূমিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, মাটি সমতল করা হয়েছে। অতঃপর খুব ভালরূপে মাটি খনন করে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে যাতে খুবই দৃঢ়তার সাথে তা স্থায়ী হয়। অতঃপর এই বৃক্ষ রোপণকারিগণ ভাঙ্গন ও বিধ্বস্ত করার কাজ আরম্ভ করে দেন। অতঃপর তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঐ পুরাতন চিন্তা ও স্তূপীকৃত আবর্জনাকে সরাতে আরম্ভ করেন যা তার চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত ছিল। এই বিধ্বস্ত ও ভাঙ্গার কাজে

এই পরিমাণ মানবীয় শক্তি, কর্মোদ্যম ও মূল্যবান সময় ব্যয় হচ্ছে যদি তা কোন প্রয়োজনীয় গঠনমূলক কাজে ব্যয় হতো এবং ঈমান, দ্বীনের দাওয়াত ও চারিত্রিক সংশোধন দ্বারা মুসলিম জাতির সুপ্ত শক্তি ও গোপন যোগ্যতাসমূহকে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হতো, তা হলে দেশ ও জাতির নিশ্চিতভাবে বড়ই উপকার হতো।

প্রগতিবাদীদের সনাতনী কর্মকাণ্ড

এই আধুনিকতাবাদীদের (Modernist) কোন কোন সময় আধুনিকতা ও প্রগতির আবেগে পাশ্চাত্যের এমন দর্শন নীতি এবং এমন সম্বন্ধ ও সংযোগের সাহায্য অনুসন্ধান করতে থাকে যা পাশ্চাত্য সমাজে বহু পূর্বে গুরুত্ব ও মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে তা পশ্চাদ্‌পদতা ও সনাতনী প্রীতির চিহ্ন ও পুরাতন অভিজ্ঞতার অবশিষ্ট হিসেবে কিছুটা বাকি রেখেছে। পাশ্চাত্যের নেতাগণ নিজেদের সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাকে এক সীমিত সময়ের জন্য গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার অপকারিতা ও ক্ষতিসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এখন তার চেয়েও উত্তম ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের ছায়ার আশ্রয় নিয়েছেন।

এর সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত হলো জাতীয়তা (Nationalism) যাকে ইউরোপ বর্তমানে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু ইসলামী প্রাচ্যের কোন কোন নেতৃত্ব তাকে এখনও বুকে জড়িয়ে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং একে মানব চিন্তাধারার গৌরব ও উন্নতির চরম শিখর মনে করেন। অথচ তা সীমাবদ্ধ গোত্রীয় জীবন ও উপজাতীয় চিন্তাধারার বহু প্রশস্ত ও উন্নত এক আকার। প্রকৃতপক্ষে এটা এমন এক পুরাতন পোশাক যাকে পাশ্চাত্য জনগণ খুলে ফেলে দিয়েছে। বর্তমানে তা তাদের নিকট বিধ্বস্ত ও ধ্বংসকারী উৎস ও শক্তি যা মানব সমাজের একত্বকে ছিন্নভিন্ন করেছে এবং মানব প্রজন্মের আকৃতি ও প্রকৃতি বিগড়িয়ে ফেলেছে।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অভিজ্ঞ পারদর্শী ও স্বাধীন চিন্তাবিদগণ বর্তমানে জাতীয়তাবাদকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন। তারা তাকে প্রাচীন কালের এক পুরাতন ফ্যাশন ও প্রগতির পথ হতে পশ্চাৎ গতির ও পুরাতন প্রীতির একটি চিহ্ন মনে করেন এবং একে মানবতা ও বিশ্বের শক্তির পক্ষে সর্ববৃহৎ অনিষ্ট ও ধ্বংসকারী উৎস বলে ধারণা করেন। এটা মানব একতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের

দু'জন বড় চিন্তাবিদ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা পেশ করা যাচ্ছে। একজন পাশ্চাত্য জ্ঞানী আরনল্ড টয়েনবী এবং দ্বিতীয় জন ভারতের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও চিন্তাবিদ ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণ।

টয়েনবী এক প্রবন্ধে লিখেছেন, মানবতার ভবিষ্যৎ সেই আত্মিক ভ্রাতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল যা ধর্মই কেবল প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। মানব জাতির বর্তমানে এরই প্রয়োজন। কম্যুনিজমের দাবি হলো যে, ওটা মানব জাতিকে একতাবদ্ধ করতে পারে। ইসলাম আফ্রিকায় নিজেকে মানব জাতির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিকারী এক শক্তি বলে প্রমাণিত করেছে। খৃস্ট ধর্মও এ কাজ আদায় করতে পারে। কিন্তু শর্ত হলো যে, ধর্মীয় রীতিনীতিকে পালন করে তাদের দেখাতে হবে জাতীয়তাবাদ মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে না, বরং তাকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেয়। অতএব, এর কোন ভবিষ্যৎ নেই। এটা মানব জাতিকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। কোন পরিত্যক্ত স্থানে নিজেকে দাফন করে দেয়া ছাড়া আর কিছুই এর করার নেই। আণবিক যুগে আমাদেরকে দুই চূড়ান্ত অবস্থা হতে একটি বেছে নিতে হবে: যদি আমরা নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতিতে নিপতিত হওয়া হতে বাঁচতে চাই তবে সমস্ত মানব জাতিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ মানব পরিবার হিসেবে বেঁচে থাকার পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা করতে হবে।[১]

গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণ ১৯৬৩ সালের ১০ই জুন জাতিসংঘের সভায় (U. N. O.) বিশ্বের জাতিসমূহের সম্মুখে বক্তৃতায় বিশ্বের সকল মানুষ এক পরিবার এই একটি চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার উপদেশ দেন, তা হলে বিশ্ব সামরিক জাতীয়তাবাদীর হস্ত হতে রক্ষা পেতে পারবে। তিনি বলেন :

বিপজ্জনক আণবিক বোমা পরীক্ষা বন্ধ করা হতে মানুষের অপারকতার অতি বড় ভ্রান্ত ধারণার নির্দেশ করে। ইতিহাস সাক্ষী যে, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, জাতিগত বৈষম্য, অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ মানুষকে যুদ্ধের আগুনে নিক্ষেপ করেছে। বর্তমানে আপনারা যদি এই রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও জীবিকা অর্জনে বিশেষ সুযোগের নীতির মাধ্যমে চতুর্দিকে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সৃষ্টি করতে পারেন এবং জাতিগত বৈষম্যের বিলুপ্তি সাধন করতে পারেন তাহলে আপনারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

---

১ Islamic Review, March 1961.

দেশপ্রেম মানুষের শ্রেষ্ঠ ধারণা নয়, বরং আসল বস্তু হলো বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ধারণা। আমরা বসবাস করি এক আধুনিক জগতে কিন্তু আমাদের চিন্তা-ভাবনা অতি প্রাচীন।[১]

আধুনিকতার প্রবক্তাদের অনুকরণপ্রিয়তা

পাশ্চাত্য জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহকে প্রাচ্যে একটি মুসলিম দেশে পুনরাবৃত্তি করার বাস্তবিকতা ও হঠকারিতাপূর্ণ চেষ্টা করার কথা এ ইঙ্গিত দেয় যে, ঐ সমস্ত দেশের পরিচালকগণ যুগোপযোগী প্রচুর পরিমাণ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা এবং তারা বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও দূরদর্শিতা ও অনুভূতির দিক দিয়ে এখনও শৈশব অবস্থায় রয়েছেন। ফলে তারা তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষকদের ভক্ত শিষ্য হিসেবে পাশ্চাত্যের অনুসরণ ও অনুকরণ করেন। তারা স্বাধীন চিন্তা, নতুন কোন গবেষণা বা গঠনমূলক কার্যকর যোগ্যতা, সাহস ও উৎস হতে বঞ্চিত। তারা নিজ জাতির প্রকৃতি, শক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত। শুধু তাই নয়, বরং পাশ্চাত্য চিন্তার উন্নতি ও পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতেও অক্ষম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা যে অশান্তি, বিশ্বাসহীনতা ও উদাসীনতার শিকার হয়ে ঈমান ও আত্মিক শক্তির জন্য লালায়িত তার খবরও তারা রাখেন না।

ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার প্রচারকদের নীতি

ধর্মহীনতা, আধুনিকতা ও প্রগতির উৎসাহী প্রচারকগণ যারা মুসলিম বিশ্বে আধুনিকতার পতাকা উত্তোলন করেছেন তাদের প্রভাবের পরিধি কত দূর বিস্তৃত ও স্ব স্ব পরিবারে তাদের কর্ম পদ্ধতি কি এবং তারা তাদের শাসনাধীন রাষ্ট্রের সীমা রেখায় ধর্মহীনতা প্রয়োগে কি সফল হয়েছেন, নাকি যখন অসুবিধা হয় তখন তারা গোঁড়া ধার্মিক, পশ্চাৎপদ ও দীনের পুনর্জীবন দানকারী হিসেবে আবির্ভূত হন; এ ব্যাপারে খৃস্টান জগতের সাথে সম্পর্ক রাখেন যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ও যে সকল দেশ তাদের সম্পর্কে তো অনেক কিছু লেখা হয়েছে।[২]

খৃস্টান প্রাচ্যবিদদের লেখায় মিশনারী স্পিরিট, ক্রুসেড যুদ্ধের তিক্ত স্মৃতি, তুরস্কের সাথে গোঁড়ামি ও তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের সংকল্প স্পষ্টভাবে প্রকাশ

---

১. The National Herald।

২. আমীর শাকীব আরসালানের কিতাব, حاضر العالم الاسلامي, ৩য় খণ্ড, শিরোনাম দীনকে নৈতিকতা হতে ভিন্ন করার বিষয়, পৃ. ৩৫৩-৩৬৪ দেখুন।

পেয়ে আসছে। এগুলো এতই সুস্পষ্ট যে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দৃষ্টি এড়াতে পারে না। ঐ সমস্ত প্রাচ্যবিদদের মধ্যে (যারা মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচার করে, ইসলামী শরীয়ত ও আইনের বিরোধিতা করে এবং অশান্তি চায়) সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো ইহুদীদের। তারা নিজেদের ধর্মের পুনর্জীবনে বিশ্বাসী ও আপসহীন। ইসরাঈল রাষ্ট্র খাঁটি ধর্মীয় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়েছে। তারা রাজ্য চালনার আইন হতে দৈনন্দিন জীবন যাপন পর্যন্ত এবং ধর্মীয় আবশ্যকীয় কর্তব্য ও আদেশাবলী হতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তর পর্যন্ত সব কিছুতে তাওরাতের শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়িত করছে এবং তারা এ সম্পর্কে কট্টর সনাতনী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এই তথ্য মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয় শুধু নয়, বরং লজ্জার চাবুকও বটে। এ কথাও নিশ্চিত সত্য যে, আধুনিকতাবাদীদের মুখে দু'টি জিহ্বা আছে। একটি হলো অপরের সঙ্গে কথা বলার জন্য, অপরটি হলো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার জন্য। ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার সমস্ত প্রচার কেবল সহজ-সরল মুসলিম দেশসমূহের জন্য, যারা নতুন নতুন স্বাধীনতা লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে জনৈক সাবেক আরব কমিউনিস্টের প্রবন্ধের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা যাচ্ছে। এই লেখক ইহুদী কমিউনিস্টদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বহু দিন কাজ করেছেন।

তিনি লিখেছেন, আরব জগতের মধ্যস্থলে তাওরাতের এক নবীর নামে একটি রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে। এর কোন সংবিধান নেই। কেননা সমস্ত ধর্মীয় পার্টি তাওরাতকেই সংবিধান হিসেবে গণ্য করার জন্য অনমনীয় ভাব পোষণ করেন। সে দেশে শনিবার দিন কাজ করা আইনত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে এর সম্পর্কের কোন বাধার সৃষ্টি হয় না, যদিও তাদের ছুটি রবিবারে, বরং তারা এর ওপর জেদ করে যে, গির্জার সাপ্তাহিক সভা রবিবারেই হোক। এই রাষ্ট্রে প্রতি শনিবার সৈনিকদের জন্য খাদ্য পাক করা হারাম।

মোশেদায়ান তার পুস্তক 'এক সৈনিকের জীবন কাহিনী'-তে লিখেছেন :

আমরা শনিবার (৩রা জুন) হাখাম আকবরের বিশেষ অনুমতিতে পাক করা খাদ্য খেয়েছি। ইসরাঈলী সৈনিক যারা অতি সত্বর আণবিক বোমার মালিক হতে যাচ্ছে (বর্তমানে আণবিক বোমার মালিক) তারা শনিবার খাদ্য পাক করা হতে বিরত থাকে। বেন গোরিয়ান ও শাযার সাবেক বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মি. চার্চিলের জানাযায় দেড় মাইল রাস্তা পদব্রজে চলেন। কেননা ঐদিন ঘটনাক্রমে শনিবার ছিল

এবং তাওরাতে শনিবার দিন সওয়ারীর ব্যবহার নিষিদ্ধ। তখন বেন গোরিয়ানের বয়স ৭৮ বছর আর শাযারের বয়স ছিল ৭৬ বছর।

কিন্তু বৃটিশ প্রেস ও জনসাধারণের অভিমতে এতে বিদ্রূপ করার মত কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হয়নি, বরং তা তাদের কাছে অসীম সম্মানের বস্তু। এভাবে আল-খালীল শহরে হযরত ইব্রাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরাতন মসজিদে (যাকে বর্তমানে ইহুদীগণ নিজেদের উপাসনাগৃহ বানিয়েছে) উপাসনাকারীদের মধ্যে অর্ধ সংখ্যক ইহুদী সৈনিকদের জন্য সাইরেন দ্বারা রোযার ইফতারের ঘোষণা করা হয়। ইসরাঈলী বিমান লাইন "আল-আ'ল"-এর বিমানসমূহে ও ইসরাঈলী নৌ-পরিবহন যীম'-এর জাহাজসমূহে শূকরের মাংস দেয়া হয় না।

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইসরাঈলী ধর্মীয় পার্টিসমূহ স্থাপিত আছে এবং খুব প্রভাবের সাথে আছে। সেখানে সিভিল ম্যারেজ আইনবিরোধী কাজ এবং এতে এত কঠোরতা রয়েছে যে, বেন গোরিয়ানের পৌত্রের ইসরাঈলী নাগরিকত্ব এ কারণেই পাওয়া যেতে পারেনি যে, তার মাতা ইহুদী ছিল না। হিব্রু ভাষা ইসরাঈলের সরকারী ভাষা এবং ঐ ভাষায় তারা রকেট ও রাডারকে অকেজো করা ও বিমান ধ্বংস করার টেকনিক ও কারিগরি শিক্ষা লাভ করেছে এবং ঐ ভাষায় এমন সাহিত্য সৃষ্টি করেছে যা নোবেল পুরস্কারের যোগ্য।

কিন্তু ঠিক এমন সময় আমাদের সংস্কৃতিতে তারা এজেন্ট আমদানি করেছে যাদের সমস্ত কার্যকলাপ, সমস্ত চেষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে বিচ্ছেদ করা। যখন তারা শোনে যে, কোন ইসলামী দেশে আইনগতভাবে ইসলামকে রাষ্ট্রের সরকারী ধর্ম হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে তখন তাদের শরীরে কাঁপন আরম্ভ হয়ে যায় এবং জাতীয় উন্নতি ও উৎপাদনে রমযান মাসের ক্ষতিসমূহের বর্ণনা দিয়ে পুস্তিকা ও সংবাদপত্রে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কাল করে ফেলে।

অপর দিকে কোন কোন ইসলামী দেশের অবস্থা এই যে, তারা আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আবেগে যুদ্ধের সময় 'আল্লাহু আকবর'-এর আওয়াজকে বেআইনী সাব্যস্ত করেছিল। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পনের মাস পর একে পুনরায় জারি করেছে।

এর বিপরীতে ইসরাঈলের কর্ম পদ্ধতি কি? তার আন্দাজ এ থেকে করা যেতে পারে যে, প্রথম যে ট্যাংকটি সিনা উপত্যকায় প্রবেশ করেছিল তার ওপর তাওরাতের একটি আয়াত লেখা ছিল।

ভাষা সম্পর্কে আমাদের অবস্থা এই : আমাদের জন্য আরবী ভাষার জটিলতা ও তার লিপি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা কখনও ল্যাটিন বর্ণমালা গ্রহণ করার কথা বলি, কখনও আরবী ভাষাকে পশ্চাৎপদ ভাষা সাব্যস্ত করে তা শিক্ষা ও শিক্ষাগার হতে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি, অথচ যে হিব্রু ভাষা দু' হাজার বছর পূর্বে লোপ পেয়েছিল বর্তমানে তা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্যে, সংবাদপত্র ও রাজনীতির ভাষায় পরিণত হয়েছে।[১]

শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসরাঈলের নীতি ও তাদের কর্ম পদ্ধতি কি? সেটা নিম্নের তথ্যসমূহ হতে কিছুটা জানা যাবে যা মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের প্রামাণ্য পুস্তকাবলী ও রিপোর্টসমূহ হতে গৃহীত হয়েছে :

ড. রোডর মাথিয়োয ও ড. মতীআ'করাভী তাদের 'আততরবিয়তু ফিশ শরকিল আরবী'-তে লিখেছেন :

ফিলিস্তিনের ইসরাঈলী স্কুলসমূহের অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বিষয় এই যে, সমস্ত বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যম (ইংরেজী, ফরাসী ও আরবী) ছাড়া হিব্রু ভাষা ও শিক্ষার প্রতিটি স্তরে ধর্মীয় শিক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা। ধর্মীয় শিক্ষাকে ইহুদীবাদের ভিত্তি ও এর উন্নতির সোপান সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এর পর তারা যা লিখেছেন তা হতে জানা যায় :

'ইসরাঈলের প্রতি প্রকারের স্কুল ও তার কার্যক্রম ঐ পার্টির অধীন হয় যে পার্টির সঙ্গে ঐ সমস্ত স্কুলের পৃষ্ঠপোষকদের সম্পর্ক রয়েছে। তাদের সমস্ত পার্টির শিক্ষানীতিতে ধর্মের স্থান স্বীকৃত, রাজনৈতিক কর্ম ও প্রবণতার ব্যাপারে কিছু মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও মৌলিক নীতিতে তারা সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। আর তা হলো ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া। কোন কোন পার্টির ধারণা হলো, ইহুদীদের ধর্মীয় রীতিনীতির আলোতে শিক্ষানীতি গ্রহণ করা উচিত। কোন কোন পার্টির চিন্তাধারা এই যে, শিক্ষকদের ইহুদী ধর্মীয় ঐতিহ্য ও রীতির অনুসারী হওয়া প্রয়োজন।

"ফিলিস্তীন পত্রিকা"য় ফিলিস্তীন উচ্চ কমিটির রিপোর্টের গবেষণা ও পর্যালোচনা বিষয়ক অংশ হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করে "ইসরাঈলে উচ্চ শিক্ষা" শিরোনামের রচিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : ইসরাঈলে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত ইহুদী আকীদার প্রতিপালন ও উন্নতি। এ দ্বারা সত্যতা রক্ষা

---

১. البعث الاسلامی। পত্রিকা, এপ্রিল ১৯৭০।

করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসরাঈলের জন্য প্রচার ও নতুন নতুন মিত্র যোগাড় করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া। এই প্রবন্ধে তার চমকপ্রদ বিশদ বিবরণ ও সংখ্যাতত্ত্ব পেশ করা হয়েছে। তা হতে স্পষ্ট হয়, ইসরাঈল কিভাবে হিব্রু ভাষাকে জীবিত ও উন্নত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক সাহায্য-সহায়তার জন্য ও তাকে শক্তিশালী করার জন্য অপরিমিত অর্থ ব্যয় করা হয়।

এ দ্বারা অতি সহজে তাদের এই দু'মুখো বাস্তব পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। অমুসলিম বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকগণ নিজের দেশ, নিজের জাতি, মুসলিম দেশ ও মুসলিম জাতি সম্পর্কে দু'টি বিপরীত নীতি অবলম্বন করে রেখেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সেই সঙ্গে মুসলিম দেশসমূহের সহজ-সরল শাসক ও বুদ্ধিজীবিগণ ধর্মহীনতা ও আধুনিকতার কপটতায় ও ভণ্ডামিপূর্ণ প্রচারের শিকার হয়ে গেছেন। সম্ভবত ঐ সমস্ত ইহুদী, খৃস্টান বুদ্ধিজীবী ও প্রাচ্যবিদ লেখক ও সাংবাদিকদের এই ধারণা ছিল না যে, মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও বুদ্ধিজীবিগণ এত সহজে ও এত দ্রুত গতিতে এই শিক্ষার প্রতি বিশ্বাসী হবেন এবং নিজ নিজ দেশে এর উৎসাহী আমন্ত্রণকারী সেজে যাবেন এবং এই স্পষ্ট বিষয়টিও তাদের নিকট গোপন থেকে যাবে। সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, বিশ্বের চিন্তার ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নেতৃত্বের এমন দেউলিয়াপনা ও প্রতারিত হবার এরূপ নজীর খুব কমই পাওয়া যাবে যা মুসলিম নেতৃত্বে এই বিংশ শতাব্দীতে পেশ করেছে।

দরিদ্র মুসলিম দেশসমূহে রাজকীয় ব্যয়

মুসলিম দেশসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণত নড়বড়ে। তারা অন্য দেশের দিকে সাহায্যের জন্য তাকিয়ে থাকে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্যও অন্য দেশের মুখাপেক্ষী। বিশেষ করে এ সমস্ত দেশের জনগণ জীবনোপকরণ ও জীবনের মানের দিক দিয়ে বহু নিম্ন স্তরে রয়েছে। যে সমস্ত দেশের জনসংখ্যা অধিক, তাদের জীবনের মান আরও নীচু এবং সেই সব দেশে জীবনোপকরণের অবস্থা আরও খারাপ ও দুর্বিষহ, অথচ ঐ দেশসমূহের সরকার পাশ্চাত্যের উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের পূর্ণ অনুকরণ করার চেষ্টা করে।

প্রতিটি দেশে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে মুসলিম দেশের দূতাবাসসমূহ ঐ সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করে যা পাশ্চাত্য দেশসমূহের (যা দীন ও চারিত্রিক সীমা ও বন্ধন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত) দূতাবাস গ্রহণ করে। মুসলিম ও আরব দেশসমূহের দূতাবাসের পক্ষ

হতে বিভিন্ন উৎসবের জন্য রাজকীয়ভাবে আমন্ত্রণ ও ককটেল পার্টির (Cocktail Parties) ব্যবস্থা করা হয়। আর দরিদ্র ও অর্থহীন লোকদের নিকট হতে সংগ্রহ করা অর্থ এ সব অনুষ্ঠানে পানির মত ভাসিয়ে দেয়া হয়। মুসলিম ও আরব দেশসমূহের দূতাবাসের পক্ষ হতে ঐ সমস্ত উৎসবে সুরা সাধারণভাবে ও কোন কোন স্থানে শূকরের মাংস সরবরাহ করা হয়। সাধারণত ঐ সমস্ত দূতাবাসে ইসলামের চারিত্রিক নীতি ও মূল্যবোধের প্রকাশ হয় না। ঐ সমস্ত দেশের মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা ও দীনের পথ দেখানোর ব্যাপারে মুসলিম দেশের দূতাবাসের কোন অবদান থাকে না। ফলে তাদের দ্বারা জ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে তেমন কোন উপকার পাওয়া যায় না।

অনেক মুসলমান দেশের নেতারা (এমন কি যারা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে নীতি ও সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে) যথেষ্ট ব্যয়বহুল জীবন যাপন করেন, তাদের ব্যয় রাজকীয়। তাদের আমল কায়সর (রোম সম্রাটের উপাধি), কিসরা (ইরানের বাদশাদের পদবী) ও রাশিয়ার বাদশাহ জার-এর আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের জীবনযাত্রা ও সংসারের জাঁকজমক দেখে "আলিফ লায়লার" যুগ মনে পড়ে যায়। কদাচ এটা বিশ্বাস হয় না যে, তারা দরিদ্র ও অভাবী দেশের নেতা ও শাসনকর্তা এবং সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের আহ্বায়ক ও পতাকাধারী।

এখানে নমুনাস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক ও গণপ্রজাতন্ত্রী ইন্দোনেশিয়ার[১] সাবেক রাষ্ট্রপতি সুকর্নোর কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে কেবল একটি পরিচয় পেশ করা হচ্ছে। লন্ডনের The Sunday Talegraph-এ লিখেছে :

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্নো টোকিওতে অবস্থান করা কালীন সময়ে দৈনিক ৫ হাজার পাউন্ড (৭০ হাজার টাকা) ব্যয় করেন। তার সাথে ছয়জন অফিসার ছিলেন। বারাঙ্গনা ও অন্যান্য মহিলা তার আমোদ, প্রমোদ ও আনন্দের জন্য আনা হতো। যেখানে রাষ্ট্রপতি সুকর্নো অবস্থান করতেন সেখানে ছিল ৫৫ পাউন্ড দৈনিক হোটেল ভাড়া। তার নিরাপত্তার জন্য ৫০ জন্য পাহারাদার নিযুক্ত ছিল। তারা বারাঙ্গনাদের আসা-যাওয়ার কারণে ভীষণ পেরেশান হতো।

---

১. ইন্দোনেশিয়ার অধিক জনসংখ্যা ও ঘন বসতির কারণে একটি গরীব দেশ। বর্তমানে জাভার সহকারী গভর্নরের বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে যে, মধ্যজাভায় আনুমানিক দশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষপ্রাপ্ত। তিনি আরো বলেন : বর্তমানে সরকারী হাসপাতালে ১২ হাজার লোক খাদ্যের [illegible] রোগগ্রস্ত হয়ে ভর্তি হয়েছে, তাদেরকে শক্তির ঔষধ দেয়া হয়েছে।

জাপানের পররাষ্ট্র দফতর এ কারণে চিন্তিত যে, রাষ্ট্রপতি সুকর্নো প্রায় টোকিওতে ভ্রমণে যান এবং আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু জাপান ইন্দোনেশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ হতে উপকৃত হতে চায়। তাই এ পর্যন্ত তারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি।[১]

সরকার ও জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব

এই মুসলিম নেতাগণ মুসলিম জনগণের কারণে বড়ই অসুবিধায় ও বিপদে আছেন। যেহেতু তারা নিজেদের রাজনীতি, ঈমানী সম্পদ ও নিজেদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার এবং জীবন ও শক্তির বৃহৎ উৎস হতে সম্পর্ক ছিন্ন করতে প্রস্তুত নয় যা ইসলাম তাদেরকে দান করেছে। উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ -এর মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকগণ এ সমস্ত অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নজীরবিহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এর জন্য তাদের এক দীর্ঘ সময় ও বহুল পরিমাণ ভাঙ্গা-গড়ার কার্যকলাপের প্রয়োজন হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার সাথে মুকাবিলা করতে বাধ্য হয়েছে।

অপর দিকে মুসলিম জাতি ঐ সমস্ত নেতা ও সরকারদের দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও পেরেশান হয়েছে। কারণ তাদেরকে নেতাদের স্বভাব ও স্বার্থের সাথে সব সময় যুদ্ধরত থাকতে হয়। নেতাগণ এমন সব ধ্বনি ও ঘোষণা দ্বারা নেতৃত্ব করতে চান, যা জনসাধারণ গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় এবং যা তাদের মধ্যে আবেগ, উদ্যম ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে না। রাজনৈতিক কোন লক্ষ্যে তাদের জন্য মৃত্যুকে সহজভাবে ও কঠিন জীবন গ্রহণ করতে প্রস্তুত করে না। এর জন্য জানমালের কুরবানী, হিজরত ও দেশান্তর জীবন গ্রহণ করা, খাহেশাত ও আত্মঅহমিকার ওপর বিজয় লাভ করার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারে না। জাতির উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে উদ্দীপ্ত করা এবং তাদের আবেগকে বৃদ্ধি করার জন্য ঐ সমস্ত ধ্বনি ও দাবির কোন প্রভাব নেই, বরং এগুলো সম্পূর্ণ অকৃতকার্য। এই সমস্ত বিষয়ই নেতাদের সম্যক জানা আছে।

তাই কঠিন ও সঙ্গিন সময় এবং প্রাণান্তকর যুদ্ধে তারা সব সময় দীনী আওয়াজ, ইসলামের রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদত বরণের স্লোগানের আশ্রয় নেন। আর যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় এবং দেশের চাবি তাদের হাতে এসে যায়, তখন তারা ঐ পুরাতন ধারার চিৎকার ও দেশীয় বুলির পুনরাবৃত্তি করতে আরম্ভ করেন এবং তারা এমন ধারণা করেন যে, তারা এমন এক জাতির ওপর শাসনকার্য

১. The Sunday Talegraph, London, 21 January 1964,

চালাচ্ছেন যারা এমন কোন ধর্মের সঙ্গে সংস্রবই রাখে না যে ধর্মের সঙ্গে তাদের গাঢ় ভালবাসা রয়েছে এবং তারা ঐ রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত আছে। তাদের এমন কোন ধর্মীয় আবেগ, উদ্যমও নেই যা অল্প শিক্ষা ও অল্প প্রশিক্ষণের পর জগতে সর্ববৃহৎ শক্তিতে পরিণত হতে পারে এবং যাদের মধ্যে বড় বড় সম্ভাবনা লুক্কায়িত রয়েছে।

গুপ্ত শক্তি ও গুপ্তধনের অসম্মান

এভাবে এ সমস্ত জাতির শক্তি, যোগ্যতা ও উন্নতির সম্ভাবনাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে যা ভালভাবে যদি ব্যবহার করা যেত তাহলে তা হতে ভালভাবে উপকৃত হওয়া যেত। যদি এই নেতাগণ বাহ্যিক চাকচিক্য নয়, বরং প্রকৃত বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করত তা হলে এ দ্বারা আশ্চর্যজনক কীর্তি স্থাপন সম্ভব হতো। বর্তমান ইসলামী ব্লক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৃহৎ শক্তিগুলোর তুলনায় এক-তৃতীয় বৃহৎ শক্তি হয়ে যেত এবং একটি কার্যকর ব্লক হিসেবে আর্বিভাব ঘটত। কেবল এ সমস্ত নেতার অদূরদর্শিতা, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও নিজেদের দেশে তাকে হুবহু প্রয়োগ করার সংকল্প এদেশ সমূহের দুর্বল ও সাহসহারা হওয়ার কারণ। মুসলিমদের অধঃগতির পেছনে কাজ করছে ঐ বিদেশী সভ্যতা যা তারা দেশের বাইরে থেকে অর্জন করে এসেছেন অথবা নিজ দেশে থেকে একে ভালভাবে আত্মস্থ করেছেন এবং তারা এর সম্মুখে সম্পূর্ণভাবে মাথা নত করেছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণের ফলাফল

সংস্কৃতি, সমাজ ও সামাজিক জীবনে পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুকরণ এবং তাদের জীবন পদ্ধতি ও সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী সমাজে সুদূর প্রসারী ফলাফল রাখছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য এক নৈতিক ক্যান্সারে আক্রান্ত। এতে শরীর পচে গলে যাচ্ছে এবং এর দুর্গন্ধ চতুষ্পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। এই ক্যান্সারের কারণ, (যা প্রায় চিকিৎসাবহির্ভূত রোগ) তাদের অনৈতিক যৌনাচার ও নৈতিক বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হওয়া যা পশুত্বের পর্যায়ে উপনীত।[১]

কিন্তু এই অবস্থার প্রকৃত ও প্রাথমিক কারণ হলো মহিলাদের সীমাহীন স্বাধীনতা, পূর্ণভাবে পর্দাহীনতা, পুরুষ ও মহিলাদের সীমাহীন সংমিশ্রণ ও মদ্য পান। কোন ইসলামী দেশে যদি মহিলাদের এভাবে স্বাধীনতা দেয়া হয়, যদি পুরোপুরিভাবে

---

১. যার একটি নমুনা (যা কেবল রাজনৈতিক কারণে প্রকাশিত হয়েছে) প্রোফিয়মুর বিশ্বজোড়া এক অপমানিত ঘটনা। John Profumo Scandal ও ডাক্তার ওয়ার্ড-এর মুকদ্দমার ব্যাপারে দেখা যায়।

পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয়, মহিলা ও পুরুষের স্বাধীনভাবে মিলিত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়, সহশিক্ষা প্রচলিত হয়, তবে এর পরিণতি চারিত্রিক বিশৃঙ্খলা ও জাতীয় অধঃপতন, সিভিল ম্যারেজ ও সমস্ত নৈতিক ও দীনী বিধান প্রায়শ লজ্ঘিত হওয়া। মোটকথা ঐ নৈতিক ক্যান্সারের কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলো মন্দ পরিণতি ভোগ করতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত ইসলামী দেশে উৎসাহের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করা হচ্ছে, পর্দা একেবারে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে, পুরুষ ও মহিলাদের স্বাধীন মেলামেশার সুযোগ রয়েছে, আবার সংবাদপত্র, সিনেমা, টেলিভিশন, সাহিত্য ও শাসকশ্রেণীর জীবনে উৎসাহ বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে, বরং এইগুলোর প্রচারক ও প্রবর্তক তারাই, সেই সব দেশে এ ক্যান্সারের চিহ্ন ও লক্ষণ পূর্ণভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। এটা আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তির স্বাভাবিক আইন ও নিয়ম। আল্লাহ্র এই আইন হতে পালাবার কারও শক্তি নেই।

আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য প্রীতির কারণ ও তার চিকিৎসা

ইতিপূর্বে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বের (১৯২৪-১৯৩৮ খ্রী.) ফলে মুসলিম বিশ্বে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ও পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তারের ঘটনাবলীর প্রারম্ভ হতে এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। সম্মানিত পাঠকবর্গ দেখেছেন যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ইসলামী দেশসমূহের অথবা নতুন প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণ অল্প-বিস্তর কামাল আতাতুর্কের চিন্তা ও কর্মধারার সঙ্গে একমত পোষণ করেন অথবা এ দ্বারা তারা প্রভাবিত। আরও লক্ষণীয় যে, প্রতিটি দেশের প্রতিভাসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও ক্ষমতাধর শ্রেণীর দৃষ্টি কামাল আতাতুর্কের সংস্কার, প্রগতি, আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য পদ্ধতির দিকেই নিবিষ্ট। আমাদের এই বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে তা কি আকস্মিক, না ঘটনাক্রমে হয়েছে অথবা এটা কামাল আতাতুর্কের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের ফল অথবা কি এর গোড়াতে আরো অধিক নিবিড় প্রভাবশালী বিশ্বজোড়া কারণ রয়েছে? মুসলিম বিশ্বে দেশ ও সমাজের নতুন গঠন ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে কেউ দাঁড়ায় সে কামাল আতাতুর্কের পদানুসরণ করে এবং দেশের উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্য আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যের পদ্ধতি অবলম্বন করার ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করে।

আমাদের কাছে এর কতক গভীর, নিবিড় ও গুরুত্বপূর্ণ হেতু প্রতিভাত হয়েছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে পৃথক পৃথকভাবে ঐ সমস্ত হেতু ও ক্রিয়াসমূহের (Factors) পর্যালোচনা করব।

পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি

জ্ঞানীরা জানেন যে, মানব অস্তিত্বের মত শিক্ষা পদ্ধতিরও একটি প্রাণ ও অন্তর আছে। এই প্রাণ ও অন্তর প্রকৃতপক্ষে তার নির্মাতা ও বিন্যস্তকারীদের আকীদা, মানসিকতা ও জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বজগত সম্বন্ধে তাদের অধ্যয়ন, শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে উক্ত জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আখলাক-চরিত্রের প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রতিফলিত হয় যা শিক্ষানীতিতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, প্রাণ ও অন্তর দান করে। এই প্রাণ তার পূর্ণ কাঠামো, সাহিত্য দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, এমন কি জীবনোপকরণ ও রাজনৈতিক বিষয়ের মধ্যে এভাবে প্রবেশ করে যে, একে ঐ সমস্ত হতে ভিন্ন করা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

এটা বড় জ্ঞানী উচ্চ মানের গবেষণা ও পর্যালোচনা করার যোগ্যতা রাখে তেমন লোকের কাজ। তিনি এর উপকারী অংশকে অপকারী অংশ হতে পৃথক

করে নিতে সক্ষম। আরবী ভাষায় যাকে বলে "خذ ما صفا ودع ما كدر" অর্থাৎ "যা ভাল তা গ্রহণ কর, যা মন্দ তাকে ছেড়ে দাও।" এই নীতির ওপর কর্মরত হলে একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন সম্ভব। তদ্রূপ মহৎ ব্যক্তিরাই মৌলিক ও অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে প্রভেদ করে এর সারভাগ ও প্রাণকে গ্রহণ করতে পারে। বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ (সাইনটিফিক) জ্ঞানসমূহের মধ্যে এ কাজ বেশি কঠিন নয়। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা খুবই জটিল ও কঠিন, বিশেষ করে যখন এমন কোন জাতি হয় যে জাতি এক নির্দিষ্ট ও মজবুত আকীদার মালিক, স্থায়ী জীবন দর্শন ও জীবনের নীতি রাখে এবং স্থায়ী ইতিহাসের মালিক হয় যা কেবল অতীতের এক আবর্জনা (debris) নয়, বরং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য পথনির্দেশক হয়। তাদের জন্য পয়গম্বর ﷺ-এর ব্যক্তিত্ব ও তার যুগই আদর্শ হয়ে থাকে। নুবুয়তের আলোকে আলোকিত কোন এক জাতি যদি এমন এক যুগের শিক্ষানীতি গ্রহণ করে, যার ভিত্তিমূল, দৃষ্টান্ত ও মানদণ্ড তা হতে কেবল ভিন্নই নয়, বরং বিপরীত হয়, তাহলে কদমে কদমে পরস্পর সংঘাত সংঘর্ষ লেগে যায়। একটির গঠন অন্যটির ধ্বংস, একটির বিশ্বাস অপরটির অস্বীকৃতি, একটির সম্মান অপরটির জন্য অপমান করা ছাড়া সম্ভব নয়।

এ অবস্থায় প্রথমে মানসিক দ্বন্দ্ব, তৎপর আকীদায় সংশয়; এরপর ধর্ম ত্যাগ, পুরাতন চিন্তা ও মূল্যবোধের স্থলে নতুন চিন্তা ও মূল্যবোধের আগমন অপরিহার্য। এ সমস্ত ব্যাপারই একটি স্বাভাবিক কার্য ও প্রাকৃতিক নিয়মে নিশ্চিতভাবে প্রকাশ পায়। কোন প্রকার ভাল ইচ্ছা, অন্তরের ব্যাকুলতা, নেতাদের সংকল্প, বাহ্যিক ও আংশিক ব্যবস্থাপনা, এই কাজের স্বাভাবিক সমাধানে বাধা দিতে পারে না। এর গতিকে মন্থর ও এর প্রকাশকে বিলম্বিত করা যেতে পারে, মুলতবি করা যায় না। যেমন গাছ যদি নিজ স্বাভাবিক রীতিতে বেড়ে ওঠে তাহলে তা নিজের পাতা ও ফুল নিশ্চিতভাবে সৃষ্টি করবে এবং সময়মত ফলও দান করবে। মানুষের এই অধিকার আছে যে, সে বৃক্ষ রোপণ করবে না অথবা রোপণ করে এতে পানি দেবে না অথবা যখন বৃক্ষ সতেজ হলো একে সমূলে খতম করে দেবে। কিন্তু মানুষের এই ক্ষমতা নেই যে, একটি বলিষ্ঠ, সুস্থ, শ্যামল, সুন্দর বৃক্ষকে নিজ জাতীয় অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশে এবং সময়মত ফল, ফুল প্রদান করা হতে বিরত রাখবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারটিও পুরোপুরি অনুরূপ। এর নিজস্ব একটি প্রাণ আছে, একটি স্বতন্ত্র অন্তর আছে, যা তার গ্রন্থকার ও সংকলনকারীদের আকীদা ও মনোভাবের বিকাশ, হাজার বছরের স্বাভাবিক উন্নতির ফল এবং পাশ্চাত্য

নাগরিকদের অবধারিত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমষ্টি ও ব্যাখ্যা। এই শিক্ষা পদ্ধতি যখন কোন ইসলামী দেশে বা কোন মুসলিম সমাজে প্রয়োগ করা হবে, তখন প্রথমে তার মনোভাবে দ্বন্দ্ব, তৎপর আকীদায় সন্দেহ, এরপর চিন্তাগত অস্থিরতা এবং পরে (لا ما شاء الله। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেন সে ব্যতীত) দীনের পরিবর্তন অর্থাৎ দীনত্যাগী হয়ে যাওয়া। এটাই এই অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি।

জনৈক সুষ্ঠু স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তি[১] যিনি পাশ্চাত্যের শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রাচ্যে এর ফলাফলের পূর্ণ অভিজ্ঞতা রাখেন, তিনি লিখেছেন : আমরা পূর্বের পৃষ্ঠাসমূহে এ কথার সমর্থনে কতক কারণ ও প্রমাণ পেশ করেছি যে, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা জীবনের দু'টি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর স্থাপিত। তারা পরস্পর মিলেমিশে থাকতে পারে না। যখন ব্যাপার এই, তখন আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, নতুন মুসলিম প্রজন্ম পদ্ধতি ও রীতিতে শিক্ষা সম্মিলিতভাবে ইউরোপের জ্ঞান ও সভ্যতার অভিজ্ঞতালব্ধ ও তাদের চাহিদার ওপর প্রতিষ্ঠিত লাভ করে ইসলামবিরোধী প্রভাব হতে মুক্ত থাকতে পারবে?

আমাদের এ আশা করার জন্য কোন সম্ভাব্য কারণ নেই। যদি আমরা এমন অসাধারণ অবস্থাসমূহ বাদও দিয়ে দিই যাতে কোন অতিশয় মেধাবী, উজ্জ্বল ও উপযুক্ত মস্তিষ্কের জন্য তা সম্ভব হয়েছে যে, তিনি নিজ পাঠ্যের বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হননি, তা হলেও সাধারণ নীতি এই থাকবে যে, তারা নিজেদেরকে ঐ বিশেষ খোদায়ী সভ্যতার প্রতিনিধি বুঝতে অক্ষম হবে যা ইসলাম নিয়ে এসেছে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, ঐ সমস্ত আধুনিক ধারার লোকদের মধ্যে দীনের আকীদা বরাবর শিথিল হয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা পাশ্চাত্য রীতিনীতিতে প্রতিপালিত ও বিকশিত হয়েছে।[২]

তিনি পাঠ্য তালিকার বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করে লিখেছেন, বর্তমানে পাশ্চাত্য সাহিত্যসমূহের পঠন-পাঠন প্রায় সকল মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্ব সহকারে প্রচলিত আছে । এর ফল এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, মুসলিম যুবকদের নিকট ইসলাম এক অপরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত সাহিত্যের চেয়ে অধিক গুরুত্বের বিষয় হলো ইউরোপের ইতিহাসের দর্শন। কারণ এই দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, জগতে দু'টি দলই আছে।

---

১. মুহাম্মদ আসাদ, পূর্ব নাম– Leopold Weiss.

২. Islam at the Cross Roads, p. 83-84.

রোমক (Romans) ও অসভ্য বর্বর জাতি (Barbarians)। ইতিহাসকে এভাবে পেশ করার একটি গোপন উদ্দেশ্য আছে। তা এই যে, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ও তাদের সভ্যতা কৃষ্টি অন্য সব হতে অধিক উন্নত যার অস্তিত্ব বর্তমানে আছে অথবা ভবিষ্যতে কোন সময় দুনিয়াতে অস্তিত্বে আসবে। এ দ্বারা পশ্চিমা নাগরিকদের ক্ষমতা লাভের চেষ্টা ও বস্তুবাদী শক্তির প্রভাবশালী হওয়ার নৈতিক বৈধতা সাব্যস্ত হচ্ছে এবং তা ন্যায়সংগত বলে প্রমাণিত হচ্ছে।[১]

তিনি আরও লিখেছেন :

এভাবে ইতিহাস শিক্ষা দেয়া যুবকদের মন-মস্তিষ্কে অপরিহার্যরূপে হীনমন্যতা সৃষ্টি করবে এবং নিজস্ব সভ্যতা ও নিজস্ব ঐতিহাসিক স্বর্ণযুগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করবে এবং ভবিষ্যতে তাদের জন্য কর্তৃত্ব ও উন্নতির যে সমস্ত উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে, এর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। এভাবে তারা এমন এক সুচিন্তিত শিক্ষা অর্জন করবে যার ফলে তাদের নিজেদের অতীতের প্রতি ঘৃণা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হবে। তাদের নিকট তাদের ভবিষ্যতের সফলতা কেবল এতেই নিহিত হয় যে, তারা পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের অনুসারী হবে।[২]

তৎপর তিনি আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন :

যদি মুসলমানগণ অতীতে জ্ঞানার্জনে ও গবেষণার কাজে অবহেলা করে ভুল করে থাকেন তবে তার প্রতিকার নিশ্চয় এ নয় যে, তারা পাশ্চাত্যের শিক্ষানীতি যেভাবে আছে সেভাবে গ্রহণ করবে। আমাদের শিক্ষার পূর্ণ পশ্চাৎগতি ও জ্ঞানের পুঁজিহীনতা খুবই ক্ষতিকর সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মুকাবেলায় অধিক ক্ষতিকর পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির অন্ধ অনুকরণ, যা ইসলামের গুপ্ত দীনী শক্তিসমূহের ওপর আবরণ বিস্তার করবে। আমরা যদি ইসলামের মূল সত্তাকে এ বিশ্বাসে রক্ষণাবেক্ষণ করতে চাই এবং ইসলামী জ্ঞান একটি স্থায়ী সভ্যতার উৎস বলে বিশ্বাস করি তবে আমাদের প্রয়োজন হবে যে, আমরা যেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চিন্তাগত পরিবেশ হতে অনেক দূরে সরে থাকি। কারণ এ পরিবেশ আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে প্রস্তুত রয়েছে। পাশ্চাত্য রীতিনীতি, পাশ্চাত্য পোশাক ও

---

১. Islam at the Cross Roads, p. 95.

২. ঐ, '৯৭ পৃ.।

জীবন ধারা গ্রহণ করে নিলে মুসলমান ক্রমশ পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।কেননা বাহ্যিক অবস্থার অনুকরণ অন্তরের ইচ্ছা ও সংকল্প পর্যন্ত প্রবেশ করে।[১]

এই ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ঐ সমস্ত চিন্তাবিদ যারা এশিয়া ও প্রাচ্যের দেশসমূহে এ শিক্ষা পদ্ধতি রেওয়ায দেয়ার চেষ্টায় ছিলেন।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক লর্ড মেকালে ১৮৩৫ সালে এ শিক্ষা কমিটির সভাপতি ছিলেন, যে কমিটি এই কথা মীমাংসা করার জন্য বসেছিলেন যে, ভারতবাসীকে প্রাচ্য ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দেয়া হোক। নিজের রিপোর্টে তিনি লিখেছেন:

আমাদের এমন একটি দল সৃষ্টি করতে হবে, যে দল আমাদের কোটি কোটি প্রজাদের মধ্যে দোভাষী হবে। সে দলটি এমন হওয়া চাই যারা রক্ত ও বর্ণে ভারতীয় হবে কিন্তু রুচি, অভিমত, শব্দ ও বুদ্ধিতে ইংরেজ হবে।[২]

এই পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য ও ইসলামী দেশসমূহে এক গভীর কিন্তু নীরব বংশ হত্যার (GENOCIDE) সমতুল্য ছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞানীরা একটি পূর্ণ বংশকে সশরীরে বিনাশ করার প্রাচীন ও কুখ্যাত প্রথাকে ছেড়ে একে নিজ ছাঁচে ঢালাই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেয়। আর এ কাজের জন্য স্থানে স্থানে বহু কেন্দ্র স্থাপিত হয়, যাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কলেজের নামে নামকরণ করা হয়েছে। কবি আকবর মরহুম এই গভীর ঐতিহাসিক সত্যকে নিজের বিশেষ কৌতুক ও বিদ্রূপাত্মক প্রথায় বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তার প্রসিদ্ধ শ্লোক এই :

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

অর্থাৎ সে ছেলেদেরকে হত্যা করে কুখ্যাত হতো না, হায় আফসোস! ফের'আউনের কলেজের পদ্ধতি বোধগম্য হয়নি।

অপর এক কবিতায় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাসকদের মধ্যে পার্থক্য এভাবে নির্ণয় করেছেন :

---

১. Islam at the Cross Roads, p. 100.
২. মেজর বাসু : শিক্ষার ইতিহাস, ৮৭ পৃ.।

مشرقی تو سر دشمن کو کچل دیتے ھیں
مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ھیں

অর্থাৎ প্রাচ্যরা শত্রুর মাথাকে পিষ্ট করে দেয়। পাশ্চাত্যগণ শত্রুর স্বভাব পরিবর্তন করে দেয়।

এর কয়েক বছর পর ডক্টর ইকবাল (যিনি এই শিক্ষা পদ্ধতির আঘাতপ্রাপ্ত ছিলেন) এই সত্য আরও গভীর পদ্ধতিতে এভাবে পেশ করেছেন :

مباش ایمن ازاں علمے کہ خوانی
کہ ازوے روح قومے می تواں کشت

তুমি যে জ্ঞান শিক্ষা করছ তার উপর নির্ভর করোনা কারণ তা দ্বারা জাতির প্রাণ কর্তন করা যেতে পারে।[১]

শিক্ষা যে আসল ও মূল পরিবর্তন করে যেভাবে এক ছাঁচ ভেঙে অপর ছাঁচ তৈরি করে তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন :

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو
ھو جائے ملائم توجد ھرچاھے اسے پھیر

অর্থাৎ শিক্ষার এসিডের মধ্যে এর ব্যক্তিত্বকে নিক্ষেপ কর, কোমল হয়ে যাবে, তখন যেদিকে ইচ্ছা হয় সেদিকে পরিবর্তন করবে।[২]

تاثیر میں اکسیر سے بڑہ کر ھے یہ تیزاب
سونے کا ھمالہ ھو تو مٹی کا ھے اك ڈھیر

অর্থাৎ ফলাফলের দিক দিয়ে এ শিক্ষার প্রভাব এসিডের চেয়েও অধিক, এটা এমন যে, স্বর্ণের হিমালয় পর্বতও এ দ্বারা মাটির একটি স্তূপে পরিণত হয়।[৩]

তিনি পাশ্চাত্যের এই শিক্ষা পদ্ধতিকে দীন ও চরিত্রের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র বলে গণ্য করেন। তিনি বলেন:

اور یہ اھل کلیسا کا نظام تعلیم
ایك سازش ھے فقط دین ومروت کے خلاف

---

১. আরমুগানে হেজায, ১৪৪ পৃ.।

২. যরবে কালীম ।

৩. যরবে কালীম ৮৪ পৃ.।

অর্থাৎ গির্জায় উপাসকদের এই শিক্ষানীতি দীন ও মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মাত্র।[১]

ইকবাল ঐ অল্প সংখ্যক ভাগ্যবান লোকদের মধ্যে গণ্য যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির সাগরে ডুব দিয়ে ভেসে উঠেছেন। কেবল তাই নয়, বরং সুস্থ ও নিরাপদে নদীর তীরে পৌঁছেছেন এবং নিজের সঙ্গে বহু মুক্তা সাগরের তলদেশ হতে আহরণ করে এনে আমাদের দিয়েছেন। সেই শিক্ষায় তাঁর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলাম সর্বকালের জীবন ব্যবস্থা হওয়ার বিষয়ে তার অভিমত দৃঢ় হয়েছে এবং ইসলামের প্রশস্ত ও গোপনীয় ক্ষমতার প্রতি তার বিশ্বাস আরো বেশি মজবুত হয়েছে। যদিও একথা বলা কঠিন যে, তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ক্রিয়া মোটেই গ্রহণ করেননি। তার দীনী বোধ, কিতাব ও সুন্নাহর প্রতি অটল বিশ্বাস বিগত উম্মতের অনুরূপ।[২] কিন্তু এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, নমরূদের এ আগুন হাজার হাজার সমসাময়িকদের মত তার আত্মা ও ব্যক্তিত্বকে জ্বালিয়ে ছাই করেনি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর এ কথা বলার অধিকার রয়েছে :

طلسم علم حاضر را شکستم
ربودم دانه ودامش گستم

অর্থাৎ বর্তমান যুগের জ্ঞানের ভোজবাজিকে ভেঙ্গে ফেলে বীজ ছিনিয়ে নিয়েছি এবং এর ফাঁদকে চুরমার করে দিয়েছি।

خدا داند که ما نند برا هیم
بنار اوچه بے پروا نشستم

আল্লাহ্ জানেন যে, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মত এর আগুনে কিভাবে নিরাপদে বসে রইলাম !

এই নতুন শিক্ষা ও এর প্রভাব সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আলী মরহুমের সাক্ষ্য বড়ই মূল্যবান। কারণ তিনি এক পরিপক্ক দীনী পরিবেশে শিক্ষা লাভ করেছেন। তৎপর পাশ্চাত্য শিক্ষার ভারতীয় উত্তম কেন্দ্রে তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়, যিনি নিজ হস্তে লিখিত জীবনচরিতে লিখেছেন :

---

১. Reconstruction of Religious Thought in Islam

২. এর নমুনা তার মাদ্রাজের ভাষণসমূহে পাওয়া যেতে পারে যা (Reconstruction of Religious Thought in Islam) নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং দার্শনিক বর্ণনার স্পষ্ট রং চমকাচ্ছে।

বৃটিশ রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষপাতী এবং এর পতাকাধারী ছিল। ধর্মীয় শিক্ষা, এমন কি নৈতিক শিক্ষাকেও সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে তার ঐ নীতিকে কার্যকর করেছে। কেবল যে সমস্ত ধর্মীয় জ্ঞানের কথা ছাত্র নিজ ইংরেজ ও প্রাচ্য ভাষার পুস্তক হতে সংগ্রহ করতে পারে তাই রয়ে গেছে।

অপর দিকে যে শিক্ষানীতি সরকার ভারতীয় যুবকদের জন্য সরবরাহ করেছিল তা আধুনিক ছিল, কিন্তু তার সকল ধ্বংসকর যোগ্যতার সাথে ছিল। তার প্রধান শক্তি এই দিকে নিবদ্ধ ছিল যে, সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার একটি ধারণা ছাত্রদের মধ্যে অন্যায়ভাবে সৃষ্টি হোক এবং শত শত বছরের পুরাতন কুসংস্কার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্য প্রমাণ্য বিষয় ও স্বীকৃতবস্তু সমূহের মহত্ব বিলুপ্ত হোক! এতে সন্দেহ নেই যে, যুগের গতির সঙ্গে এই শিক্ষা সত্যের অন্বেষণ ও সন্ধানের আন্তরিকতাপূর্ণ উদ্যমকে জাগ্রত করার কারণ হয়েছিল, কিন্তু এর প্রথম আক্রমণের মধ্যেই এটা যে বিশেষভাবে ধ্বংসকারী তা সাব্যস্ত হয়েছে এবং উচ্ছেদকৃত কুসংস্কারের পরিবর্তে তা যে অল্প-বিস্তর দিয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা অমূলক আকীদা ও সন্দেহের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এটা সত্য যে, এই অল্প-বিস্তর যা দেয়া হয়েছে তা ছিল আধুনিক।[১]

Islam in Modern History-এর গ্রন্থকার (W.C. Smith) যিনি মুসলিম দেশের বিভিন্ন প্রবণতা ও মুসলিম দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ইসলামী দেশে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তার কেন্দ্রসমূহের গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবের কথা স্বীকার করেন। তিনি মুসলিম দেশসমূহের স্বাধীন চিন্তা আন্দোলনের বিষয় উল্লেখ করে লিখেছেন :

মুসলিম দেশসমূহে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনতার আগ্রহের যে আন্দোলন চলেছে এর গুরুত্বপূর্ণ এক কারণ পাশ্চাত্যের অনুপ্রবেশ। ইউরোপে স্বাধীনভাবে জীবন পরিচালনার আগ্রহ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময় হতে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত খুব প্রবল ছিল। এটা ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নতির যুগ। বহু মুসলমান যুবক পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছে এবং ইউরোপের সাহস, উদ্দীপনা ও এর মূল্যবোধ সম্পর্কে তারা জ্ঞাত হয়েছে এবং তাদের কিছু অংশ এর প্রেমিকও হয়েছে। এ কথা ঐ সমস্ত ছাত্রদের প্রতি প্রযোজ্য যারা প্রচুর পরিমাণে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা অর্জন করেছে। তাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের বহু জিনিস মুসলিম বিশ্বে প্রবেশ

১. My Life A fragment, P. 23-24.

করেছে। এ কাজে ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অগ্রবর্তী ছিল যারা এ প্রজন্মকে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে তাদেরকে পাশ্চ্যত্যের জীবন পদ্ধতির হাতে তুলে দিয়েছে। পশ্চিমাদের পক্ষ হতে এমন সব বিষয় এসেছে যার মাঝে অসংখ্য নিত্য নতুন চিন্তাধারা, অত্যন্ত নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ আবেগ-অনুভূতি, নতুন নতুন উদ্দীপনার বস্তু ছিল যা প্রচার-প্রসার করার ক্ষেত্রে ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে।

এছাড়া পাশ্চাত্যের অন্যান্য আইনগত, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য প্রকারের নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধিত প্রভাব ও অনুপ্রবেশ, যাদের কোন কোনটি জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আর কোনটির জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। কোন কোন মুসলমান এর মোকাবেলা করেছে আর কেউ কেউ একে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। কতককে এরূপ শিক্ষা দেয়া হয়েছে অথবা তারা ক্রমশ একে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বহু মুসলমান এ সকল নীতি ও এ প্রতিষ্ঠানকে বাস্তব ও অবধারিত বলে বুঝতে আরম্ভ করেছে। এভাবে পাশ্চাত্যপন্থী হওয়ার কার্যকলাপ দ্রুত বেগে দাপটের সঙ্গে জারি রয়েছে।[১]

কিন্তু কতক অসাধারণ ব্যক্তি যেমন ইকবাল ও মুহাম্মদ আলীগণ ছাড়া যাদের ইব্রাহীমী প্রকৃতি অথবা বাহ্যিক প্রভাব ও ঘটনা তাদের ঈমানের নূর ও ইসলামের বোধকে রক্ষা করেছে অথবা তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ভীষণ কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত আরব ও অনারব দেশসমূহের মেধাবী মুসলিম যুবকদেরকে যারা জাতির মণিমুক্তা ও পুঁজি ছিল, এই শিক্ষা পদ্ধতির এসিড গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। ফলে তারা ইসলাম, তার সঠিক আকৃতি ও আকারের সাথে তাদের আধুনিক মনোভাবের সাথে গ্রহণ করতে পারে না এবং তারাও সাধারণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারে না।

ডক্টর ইকবালের কথায়

فرنگی شیشه گرکے فن سے پهتر هو گئے پانی

অর্থাৎ ইউরোপীয় কাচ তৈয়ারকারীদের কৌশলে পাথর হয়ে গিয়েছে পানি।

ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার হওয়ার ওপর জেদ করা, যার রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশাধিকার নেই। দীন ইসলামের সঙ্গে খৃস্টীয় গির্জার মত আচরণ

১. Islam in Modern History, P. 64.

করা। ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার ধারণা, ধর্মকে উন্নতি, আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের রাস্তায় বাধা দানকারী ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী মনে করা, ইসলামী আলিমগণকে খৃস্টীয় গির্জার প্রতিনিধিদের শ্রেণীতে দাঁড় করানো, যারা মধ্যযুগে লাগামহীন ক্ষমতার মালিক ছিল, মহিলাদেরকে পুরুষের সম্পূর্ণ সমান সাব্যস্ত করে তাদেরকে জীবনের সমস্ত ময়দানে গমন ও অংশ গ্রহণ করার যোগ্য ও অধিকারী মনে করা, পর্দাকে (যে কোন আকারে হোক) প্রাচ্যের পুরাতন অন্দর মহলী নীতির চিহ্ন ও পুরুষদের শ্রেণী বিদ্বেষ ও অত্যাচারের চিহ্ন মনে করা এবং এর খতম করে দেয়াকে সংস্কারের ও উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ বলে ধারণা করা।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন , নিকাহ্ ও তালাকের রীতিনীতিকে মধ্যযুগের মুসলমান ফকীহ্দের (মুসলমানী আইনের অভিজ্ঞ ব্যক্তি) ইজতিহাদ এবং ঐ সীমাবদ্ধ প্রাথমিক সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক ফল বলে মনে করা, যা খৃস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। একে পরিবর্তন ও সংশোধন করা এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতি ও পাশ্চাত্য মানের অনুরূপ করার কাজকে সময়ের এক প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে করা; মদ, সুদ, জুয়া ও কামাচারের স্বাধীনতা ও অবাধ ব্যবস্থাকে বেশি দূষণীয় মনে না করে মুক্ত করে দেয়া, জাতীয়তাবাদ, পুরাতন (প্রাক ইসলাম) সভ্যতাসমূহ ও ভাষাসমূহকে জীবিত করার উদ্যোগ, ল্যাটিন বর্ণমালার উপকারিতা ও গুরুত্বের প্রতি বিশ্বাস করা। এ ধরনের আরও বহু প্রবণতা এই আধুনিক শিক্ষিত প্রজন্মের নিকট স্বাভাবিক ও মীমাংসিত বস্তুর তুল্য এবং আধুনিকতা ও প্রগতির লক্ষ্য। আর এসব কিছুই ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি ও মনোভাব চিন্তার ও পরিবেশের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের ফল যেমনটি মুহাম্মদ আসাদ মনে করেন :

তুরস্ক হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলমান দেশসমূহের যত নেতা ও পরিচালক আপনার দৃষ্টিগোচর হবে, তারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষার উৎপাদিত ফসল। তাদের মধ্যে যাদের সরাসরি কোন পাশ্চাত্য দেশ অথবা ইউরোপের কোন প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পাবার সুযোগ হয়েছে, আর যাদের তথায় যাবার সুযোগ হয়নি, তারা নিজ দেশে থেকে এই শিক্ষানীতির নিষ্ঠাবান প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ণভাবে উপকৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক লোক সামরিক কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে, যেখানে পাশ্চাত্য পদ্ধতির শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত রয়েছে।

এ কারণে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে দু' প্রকারের মনোভাব, দু' প্রকারের দর্শন, দু' প্রকারের মান, দু' অভিমুখী পথ ও মতের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে। তার সাধারণ প্রকাশ ঘটেছে এভাবে যে, যারা বেশি শক্তিশালী, উপায়-উপকরণে সুসজ্জিত ও ক্ষমতাশালী, সফলতা তাদের হাতে এবং এটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কিন্তু তা যতই দুঃখজনক হোক, আশ্চর্যের কথা নয়। কারণ আশ্চর্যের কথা তখন হতো যদি এই প্রতিযোগিতা ও আধুনিকতায় পাশ্চাত্য পাওয়া না যেত।

বিষের প্রতিষেধক

এর একমাত্র চিকিৎসা হলো এ শিক্ষা পদ্ধতিকে নতুনভাবে ঢালাই করতে হবে, একে মুসলমান জাতির আকীদা ও স্বীকৃত বিষয়সমূহ এবং উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের অনুরূপ করে গড়তে হবে। তার সমস্ত শিক্ষা ও শিক্ষণীয় বিষয় হতে বস্তুবাদ, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদার সঙ্গে বিদ্রোহ ও দেহপূজারীর আত্মা বের করে এতে আল্লাহ্‌পূজারী, আল্লাহ্-সন্ধানী, পরকালের চেষ্টাকারী, তাকওয়ার পতাকাবাহী ও মানবীয় প্রাণ সৃষ্টি করতে হবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, মনোবিদ্যা, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক জ্ঞান পর্যন্ত সব কিছুকে এক নতুন ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করে দিতে হবে। তাদের নির্ভুল হওয়া ও নেতৃত্বের বিষয়টি অস্বীকার করে এর শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাধীনভাবে সমালোচনা করার ও নির্ভীক চিত্তে ব্যাখ্যা (পোস্ট মর্টেম) করার সুযোগ দিতে হবে।[১] পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের কারণে মানব সমাজের যে অসাধারণ ক্ষতি হচ্ছে ঐ সমস্ত চিহ্নিত করা হোক। যদিও তা বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন এবং এর ফলাফল দেরীতে প্রকাশ পাবে।

মোটকথা, পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নিজস্ব ধারায় শিক্ষা দেয়া হোক এবং তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাঁচা মাল (Raw Materials) মনে করে নিজেদের প্রয়োজন নিজেদের দেহের গঠন, নিজস্ব আকীদা ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী তৈরি করা হোক!

ড. রফিউদ্দিন সাহেবের জ্ঞানপূর্ণ কিতাব " কুরআন ও আধুনিক জ্ঞান"-এর ভাল নমুনা, মুহাম্মদ আসাদ সাহেবের "Islam at the Cross Roads", মাওলানা আবুল আলা মওদূদীর 'তনকীহাত' ও 'পর্দা', সায়্যিদ কুতুবের "العدالة الاجتماعية فى الاسلام"-এর মধ্যেও পাশ্চাত্য চিন্তা ও পাশ্চাত্য মর্যাদার ওপর সমালোচনামূলক উপকরণাদি পাওয়া যায়।

এ বৃহৎ কাজে যত জটিলতাই হোক এবং এতে কিছু বিলম্ব হলেও মুসলিম বিশ্বে আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যের এই বিশ্বব্যাপী ছোঁয়াচে রোগকে প্রতিরোধ করার এ ছাড়া এর অন্য কোন চিকিৎসা নেই। এটা ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব ও তার সামাজিক কাঠামোর জন্য চ্যালেঞ্জস্বরূপ এবং এটা ইসলামের জন্য কেবল বিপদই নয় বরং জীবন ও মৃত্যুর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার পরিণতি এই হয়েছিল যে, মুসলমান জনসাধারণের আন্তরিকতা, তাদের ত্যাগ, উদ্যম ও কার্যকর শক্তি এই আধুনিকতা ও নতুনত্বের আগুনের ঘৃণিত ইন্ধন হয়ে গিয়েছে এবং সরলমনা, ভাষাহীন, উদ্যমশীল ও নিষ্ঠাবান জনগণ ঐ সমস্ত নেতা ও শাসকদের হাতে ভেড়া ও ছাগলের পাল হয়ে রয়েছে। তারা জনগণকে যেভাবে নিয়ে যেতে চায় নীরবে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, অথচ তাদের আত্মত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে ঐ সকল দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভারতে ইংরেজ শাসনের সফলতা ও স্থিতিশীলতার পশ্চাতে ছিল এই সিভিল সার্ভিসগোষ্ঠী এবং তাদের পাশ্চাত্য প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা ও আনুগত্য। তারাই এ দেশের শাসন কাঠামো তৈরি করেছেন এবং শত বছর যাবৎ সফলতার সাথে বিদেশী শাসকদের বাসনা ও স্বভাবের অনুরূপ এই দেশকে পরিচালিত করেছেন। এখনও মুসলিম দেশসমূহের লক্ষ্য পরিবর্তন এবং ইসলামী চিন্তা ও ইসলামী জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র পন্থা এটাই যে, এই গোষ্ঠীর ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণভাবে চেষ্টা করা যাদের হাতে পরিচালনার ভার ও দেশের দায়িত্ব অর্পিত এবং যে শিক্ষা পদ্ধতি এই গোষ্ঠীর প্রস্তুতকারক তাকে প্রথমে ঠিক করা ও পূর্ণ সংশোধন করা।

শিক্ষা পদ্ধতির এই মৌলিক পরিবর্তন ও এর ইসলামী আকৃতি দান যদিও খুবই প্রয়োজন, কিন্তুএর জন্য দীর্ঘ কর্মপন্থা ও লম্বা সময়ের প্রয়োজন। এর জন্য প্রশস্ত ও প্রচুর যোগ্যতা ও উপকরণের দরকার। নতুন ইসলামী প্রজন্মের ব্যাপারটি একদিনের জন্যও বিলম্ব করা ও অল্প সময়ের জন্য মুলতবি রাখা সমীচীন নয়। উল্লিখিত কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত (এবং তা চলতে থাকাকালীন) প্রকৃতপক্ষে এ কাজ ইসলামী ছাত্রাবাসসমূহ (Muslim Hostels) দ্বারা নেয়া যেতে পারে। যে সকল কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে মুসলিম ছাত্ররা অবস্থান করে সে সমস্ত ছাত্রাবাসে ইসলামী জীবন ও ইসলামী পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করা এবং ভাল মনোভাব সৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার বিশেষ চেষ্টা করা যেতে পারে। ছাত্রাবাস ছাত্রদের জীবন, স্বভাব, তাদের চরিত্র ও মন-মানসিকতা গঠনে গভীর প্রভাব রাখে

তা ঐ সমস্ত সুধীও জ্ঞাত আছেন যারা এই প্রজন্মের কিছু অভিজ্ঞতা রাখেন। যে সকল ইসলামী কলেজ ও ইসলামী স্কুলের জন্য মুসলমানের বহু পুঁজি ও মনোযোগের মূল্যবান অংশ ব্যয়িত হয়েছে, তা অনেক স্থানে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে জনকল্যাণকর কর্মধারা হারিয়ে ফেলেছে। অতঃপর তা প্রায় 'পর্বত খনন করে হাড় বের করার মত অবস্থায় উপনীত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। এর বিপরীত এরূপ ছাত্রাবাস স্থাপন ও বন্দোবস্ত করা যাতে জটিলতা কম ও উপকার অধিক। যেখানে শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা দয়ালু মুসলমান সরকার ও নেতাদের হাত হতে বের হয়ে গেছে এবং তাকে সহসা ফিরিয়ে আনবার কোন আশাও নেই, সেখানে এ ছাত্রাবাসই শিক্ষাধীন মুসলমান যুবকদের চরিত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও দীনী মনোভাবের প্রতিপালনের কেন্দ্র হতে পারে এবং বহু সরলপ্রাণ উত্তম স্বভাবের ছাত্রদের বিকৃত পরিবেশ ও কদাকার মন্দ শিক্ষানীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষাক্ত আবহাওয়া হতে নিরাপদে রাখতে পারে।[১]

এ ধরনের ছাত্রাবাসের প্রয়োজনীয়তা মুসলিম দেশসমূহ ছাড়া পাশ্চাত্য দেশেও রয়েছে, যেখানে মুসলিম যুবকগণ অধিক সংখ্যায় শিক্ষা পাচ্ছে। যারা বুদ্ধিমত্তা ও কর্মশক্তিতে জাতীয় মূলধন ও প্রকৃত শক্তি এবং যাদের জন্য সাধারণত (তাদের বুদ্ধিমত্তার যোগ্যতা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান, ভাষা ও রাজনীতির অভিজ্ঞতার কারণে মুসলিম দেশসমূহের নেতৃত্ব এবং কমপক্ষে এর পদসমূহ নির্ধারিত রয়েছে) এ সমস্ত কেন্দ্রে তাদের প্রবণতাসমূহের সংশোধন ও ইসলামী মনোভাব গঠনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তা হলে এই নীরব কাজ দ্বারা মুসলিম দেশসমূহে নীরবে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে, যার নেতৃত্বে দেরিতে হোক অথবা সত্বর হোক, এই যুবকদের হাতে আসবে। এ পদ্ধতি অন্য সমস্ত পদ্ধতি হতে বেশি সহজ ও সংরক্ষিত বলে মনে হচ্ছে যা বহুদিন হতে প্রত্যক্ষভাবে ঐ সকল দেশে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

প্রাচ্যবিদগণ এবং তাদের গবেষণা ও চিন্তাধারার প্রভাব

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের পরিচালক ও শাসকশ্রেণীর মস্তিষ্কের মধ্যে ইসলামের অতীত কালের ব্যাপারে কুধারণা, ইসলামের বর্তমান সময় সম্পর্কে অসন্তুষ্টি,

---

১. ইসলামী ছাত্রাবাস স্থাপনের প্রস্তাব সর্বপ্রথম মাওলানা সায়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী (র) করেছেন। তৎপর এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় আহ্বায়ক তাঁর বন্ধু ও আমাদের শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা আবদুল বারী নদভী ছিলেন যিনি এই বিষয়ে সব সময় প্রবন্ধ লিখতেন এবং মুসলমানদেরকে এর প্রতি আকৃষ্ট করতেন।

ইসলামের ভবিষ্যৎ হতে নৈরাশ্যে, ইসলাম, পয়গম্বরে ইসলাম ও ইসলামী উৎস (Resources)-সমূহ সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধা সৃষ্টি করা এবং ধর্মের সংস্কার, ইসলামী আইনের সংস্কারের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে (যার নমুনা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে) ঐ সমস্ত পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদদেরই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রভাব। কারণ তারা সাধারণত উচ্চ শিক্ষা লাভ করছে পাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা তারা ইসলামী জ্ঞান লাভ করেছে পাশ্চাত্য ভাষায়, এই প্রাচ্যবিদগণ ইসলাম সম্পর্কে পুস্তকাদি পাঠে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদেরকে সাধারণত Orientalist বলা হয়। তারা জ্ঞানের প্রসারতা, গবেষণার গভীরতা। প্রাচ্যের জ্ঞানী ও রাজনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন এবং প্রাচ্যে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে তাদের গবেষণা ও মতামতকে শেষ কথা ও চূড়ান্ত ফয়সালা মনে করা হয়।

এই প্রাচ্যবিদগণের ইতিহাস বহু পুরাতন। তারা প্রকাশ্যভাবে খৃস্টীয় ১৩ শতাব্দী হতে কাজ শুরু করে। তাদের আন্দোলন ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তিন প্রকারের ছিল। ধর্মীয় আন্দোলন অতি স্পষ্ট। তাদের বড় উদ্দেশ্য ছিল খৃস্ট ধর্মের প্রচার-প্রসার ও ইসলামের এমন ছবি অংকন করা যাতে খৃস্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য আপনাআপনিই প্রমাণিত হয় এবং আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে খৃস্ট ধর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, খৃস্ট ধর্মের প্রচার এক সাথেই কর্মতৎপর রয়েছে। এদের বেশির ভাগ মূলত পাদরী, তাদের অধিক সংখ্যক বংশে ও ধর্মে ইহুদী।

রাজনৈতিক আন্দোলন এই যে, এই প্রাচ্যবিদগণ সাধারণত প্রাচ্যে পাশ্চাত্য শাসন ও ক্ষমতার অগ্রদূত (Pioneers)। পাশ্চাত্য শাসনসমূহকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহায্য ও উপকরণ সরবরাহ করা তাদেরই কাজ। তারা এই সমস্ত প্রাচ্য জাতি ও প্রাচ্য দেশসমূহের রীতি, রেওয়াজ, স্বভাব-প্রকৃতি, বসবাসের প্রণালী, ভাষা ও সাহিত্য, এমন কি আবেগ, উদ্যম, মনোভাব প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ তথ্যাদি পৌঁছে দেন, যাতে প্রাচ্য দেশসমূহ পাশ্চাত্য নাগরিকদের শাসন করা সহজ হয়। এর সাথে সাথে তারা প্রাচ্যের ঐ সমস্ত অবস্থা, আন্দোলন, আকীদা ও কল্পনাকে ধূলিসাৎ করে দেন যা ঐ পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকদের জন্য চিন্তা ও মাথা ব্যথার কারণ হয় এবং এমন মনোভাব ও বৃত্তিজনিত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয় যার ফলে সরকারের বিরোধিতার কল্পনাও যেন মনে সৃষ্টি হতে না পারে। এর বিপরীত তাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও তাদের খিদমতের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হয় এবং প্রাচ্যের অধিবাসীদের মধ্যে দেশের সংশোধন ও উন্নতিকল্পে পাশ্চাত্যের

অনুসরণ ও অনুকরণের এমন আবেগ সৃষ্টি হয় যাতে ঐ সমস্ত পাশ্চাত্য সরকার চলে যাওয়ার পর তাদের মনোভাব ও সভ্যতার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

এ কারণে পাশ্চাত্য সরকারসমূহ এই প্রাচ্যবিদদের গুরুত্ব ও উপকারিতার কথা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিল। পাশ্চাত্যের নেতাগণ পূর্ণভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই উদ্দেশে বিভিন্ন দেশের প্রাচ্যবিদগণ মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত পুস্তিকা ও পত্রিকাসমূহ প্রচার করেন যার মধ্যে মুসলিম বিশ্বের অন্তরের প্রবণতার ওপর বিশদ বর্ণনা ও পর্যালোচনা অতি নিপুণতার সঙ্গে প্রচারিত হয়। বর্তমানেও মধ্যপ্রাচ্য নামে (Journal of Near East) ও মুসলিম বিশ্ব নামের পত্রিকা (The Muslim World) আমেরিকা হতে ও (Le Monde Musalmans) নামে একটি প্রত্রিকা ফ্রান্স হতে প্রকাশিত হচ্ছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও স্বাভাবিক এই প্রাচ্যবিদদের একটি উদ্দেশে অর্থনৈতিকও বটে। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি একে এক সফলকাম ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেন। অনেক প্রকাশক এই পুস্তকাদি প্রাচ্যের বিষয়বস্তু ও ইসলাম সম্পর্কিত পুস্তকাদি এ কারণে প্রকাশ করেন যে, ইউরোপ ও এশিয়ায় এগুলোর বিরাট চাহিদা আছে। সে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ কাজের জন্য উৎসাহিত করে এবং এদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। খুব দ্রুত গতিতে ইউরোপ ও আমেরিকার এই সমস্ত বিষয়ের ওপর পুস্তকাদি প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে। কারণ এ কাজে খুবই আর্থিক লাভ ও ব্যবসার উন্নতি সাধিত হয়।

এ সমস্ত উদ্দেশ্য ছাড়াও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাচ্যের বিষয়বস্তু ও ইসলামের ব্যবস্থাপনাকে জ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে আনন্দ লাভের জন্যও গ্রহণ করে এবং তারা এত বেশি অধ্যয়ন, মস্তিষ্ক পরিচালনা ও কষ্ট স্বীকার করেন, যার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ না দেয়া চারিত্রিক সংকীর্ণতা ও অবিচার হবে। তাদের প্রচেষ্টায় প্রাচ্যের ও ইসলামী জ্ঞানের অনেক মণিমুক্তা আশ্চর্যজনকভাবে পর্দার আড়াল হতে সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে এসেছে এবং বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা পেয়েছে। অনেক শ্রেষ্ঠ ইসলামী উৎস ও ঐতিহাসিক দলিলপত্র রয়েছে যা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়র ফলে প্রথমবার প্রচারিত হয়েছে।[১]

---

১. তবকাতে ইবনে সাদ, তারীখে তাবরী, তারিখে কামেল, ইবনুল আছীর, আনসাবে ছমআনী, বালাযুরীর ফতুহুল বুলদান, আল-বিরোনীর কিতাবুল হিন্দ ইত্যাদি প্রথমবার ইউরোপ হতে প্রচারিত হয়েছে। পরে ঐ সমস্তের বহু সংস্করণ মিসর হতে প্রকাশিত হায়েছে।

আর প্রাচ্যের জ্ঞানিগণ তা দ্বারা নিজ চক্ষুকে আলোকিত করেছেন।

জ্ঞানের এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও এ কথা বলতে কোন ভয়-ভীতি নেই যে, প্রাচ্যবিদগণ সাধারণত জ্ঞানীদের ঐ দল, যারা কুরআন, হাদীস, নবী করীম ﷺ-র জীবন-চরিত, ইসলামী ফিকাহ ও নৈতিকতা ও তাছাউফ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণা দ্বারা প্রকৃত লাভ অর্জন করেননি এবং এ দ্বারা তাদের মন ও মস্তিষ্কের ওপর কোন বিপ্লবী প্রভাব পড়েনি। এর বড় কারণ এই যে, ফলাফল সব সময়ে উদ্দেশ্যের অধীন হয়। সাধারণত ঐ সমস্ত প্রাচ্যবিদদের উদ্দেশ্য হলো দুর্বলতার সন্ধান করা ও ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যাবলীর অধীনে তাকে প্রকাশ করা ও চমক লাগিয়ে দেয়া। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরিদর্শক যেমন ফুলের বাগান ও বেহেশ্‌তের নমুনার শহরে কেবল অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন স্থানগুলো দেখে তদ্রূপ প্রাচ্যদিগণও মুসলমানের দুর্বল দিকগুলোই দেখে।

প্রাচ্যবিদদের প্রভাব কেবল তাদের ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। যদি কেবল তা-ই হতো, তাহলে আমাদের মনোযোগের কেন্দ্র ও এই আলোচনার বিষয়বস্তু হতো না। বিষয়ের বেশি ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী দিক হলো এই যে, তারা তাদের সমস্ত যোগ্যতাকে যৌক্তিক ও অযৌক্তিকভাবে ঐ সমস্ত দুর্বলতাকে চিহ্নিত করতে এবং তা অত্যন্ত ভয়ানক আকারে পেশ করতে ব্যয় করেন। তারা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখেন এবং পাঠকবর্গকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখান। সরিষাকে পর্বত বানানো তাদের একটি ক্ষুদ্র কাজ। তারা ইসলামের অন্ধকার ছবি পেশ করার ক্ষেত্রে এত চতুর, চালাক ও এত ধৈর্য অবলম্বন করেন যে, যার উদাহরণ পাওয়া কঠিন। তারা প্রথমে একটি উদ্দেশ্য ঠিক করে নেন এবং একটি সিদ্ধান্ত করে নেন যে, একে প্রমাণিত করে নিতে হবে।

তৎপর ঐ উদ্দেশ্যের জন্য প্রতি প্রকারের ভাল, মন্দ, ধর্ম ও ইতিহাস, সাহিত্য, গল্প, কবিতা, অকৃত্রিম, কৃত্রিম সম্পদ হতে উপকরণ যোগাড় করেন যা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের যৎকিঞ্চিৎও সুবিধা পাওয়া যায়। তা শুদ্ধতা ও সনদ হিসেবে যতই ক্ষত-বিক্ষত ও সন্দিগ্ধ ও মূল্যহীন হোক তাকে বড়ই দীপ্তি উজ্জ্বলতার সাথে পেশ করেন এবং বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা একটি কল্পিত বিষয়ের পূর্ণ কাঠামো তৈরি করেন, যার পূর্ণ অস্তিত্ব কেবল তাদের অন্তরেই রয়েছে। তারা প্রায়ই একটি মন্দ দিক বর্ণনা করেন এবং তাকে মস্তিষ্কের মধ্যে বসিয়ে দেবার জন্য বড়ই উদারতার সাথে

আলোচিত বিষয়ের বা ব্যক্তির দশটি সৌন্দর্যের বর্ণনা দেন, যেন পাঠকদের মন তার বিচার, অন্তরের প্রশস্ততা ও পক্ষপাতিত্বহীনতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার একটি সন্দহ সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়ার মত গ্রহণ করে নেয়।

তারা কোন ব্যক্তিত্ব অথবা দাওয়াতের পরিবেশ, ঐতিহাসিক পটভূমি, প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক কার্যক্রম ও উদ্দেশ্যের নকশা অত্যন্ত সুন্দর ও বিজ্ঞোচিত রীতিতে অঙ্কিত করেন (যদিও তা কেবল কাল্পনিক হয়)। ফলে অন্তর এটাকে গ্রহণ করতে থাকে এবং এর ফলে তারা ঐ ব্যক্তি ও দাওয়াতকে ঐ পরিবেশের স্বাভাবিক কর্মের পরিণাম অথবা তার স্বাভাবিক ফল বুঝতে আরম্ভ করে। অতঃপর তার শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা এবং অপর কোন অবিনশ্বর সত্তার সঙ্গে এর সংযোগ ও সম্পর্কের অস্বীকারকারী হয়ে যায়। প্রায় প্রাচ্যবিদগণ তাদের রচনায় 'বিষ'-এর এক পরিমিত পরিমাণ অংশ রাখেন এবং চেষ্টা করেন যেন তা ঐ পরিমাণ হতে বৃদ্ধি হতে না পারে এবং পাঠকবর্গের মনে ঘৃণা, বিরক্তি ও সন্দেহের সৃষ্টি না করে। এই অবস্থায় তাদের এ লেখাগুলো বেশি বিপজ্জনক প্রমাণিত হয় এবং একজন মধ্যম পর্যায়ের শিক্ষিত লোকের জন্য এর কবল হতে বেঁচে বের হওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে, বরং অসম্ভব হয়ে ওঠে।

কুরআন, নবী করীম ﷺ-র জীবন চরিত, ফিকহ্ (ইসলামী শরীয়তের আইন), কালাম (দর্শন), সাহাবীগণ (হযরত মুহাম্মদ ﷺ-র সহচরগণ), তাবেয়ীন (যাঁরা সাহাবীগণকে দেখেছেন), মুজতাহিদ ইমামগণ (ইসলামী ধর্মজ্ঞানে যাঁরা সুপণ্ডিত), মুহাদ্দিসীন (হাদীস বর্ণনাকারিগণ), ফকীহ্গণ (ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি), মশায়েখ ও সূফীগণ (যাঁরা সূফীদের অভিজ্ঞ সাধক), হাদীস বর্ণনাকারিগণ, হাদীসের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারিগণ, হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন, হাদীস দলিল হওয়া, হাদীস সম্পাদনা করা, ইসলামী ফিকহের উৎস, ইসলামী ফিকহের উন্নতি—এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের পুস্তকাবলী ও তাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধাদিতে এত সন্দেহ সৃষ্টিকারী তথ্যাদি পাওয়া যায়, যা একজন বুদ্ধিজ্ঞান ও অনুভূতিপরায়ণ ব্যক্তিকে যিনি এই বিষয়ে প্রশস্ত ও গভীর জ্ঞান রাখেন না তাকে ইসলাম হতে পূর্ণভাবে ফেরাবার জন্য যথেষ্ট। এগুলোর পরীক্ষা করা, তাদের পরিবর্তন করা, তাদের কৌশলী ভুল-ভ্রান্তি, তাদের প্রতারণা, ছলনা প্রভৃতি প্রকাশ করা আমাদের আলোচনার সীমার বাইরে। এটা এক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের বিষয় এবং বৃহৎ ধর্মীয় খেদমত যার জন্য এক বৃহৎ ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

এখানে আমি খুবই সংক্ষেপে তাদের এই দাওয়াত ও শিক্ষার সার পেশ করছি যা তারা শিক্ষিত, উৎসাহী ও উন্নয়নকামী যুবক পাঠকদের সম্মুখে বারবার ও বিভিন্ন শিরোনামে পেশ করতে থাকে এবং যাকে ঐ সমস্ত যুবক যথাযথ মনে করে একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়রূপে গ্রহণ করে যাকে। এই দাওয়াত ও শিক্ষার সাথে মুসলিম দেশসমূহের সংস্কার ও উন্নতির আন্দোলনের নিকটতম সংযোগ রয়েছে। এই বিষয় ভালভাবে জানা ব্যতীত এই কর্মপ্রণালীর অনুমান করা সম্ভব নয়। এ স্থলে আমি মিসরের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ড. মুহাম্মদ আল'বহী এর[১] জ্ঞানগর্ভ কিতাব الفكر الاسلامي الحديث। হতে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি। এই উদ্ধৃতি অধিকাংশ প্রাচ্যবিদের পুস্তকের সারাংশ ও তাদের চিন্তাধারার একটি সঠিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্ক ইসলামের সাথে কেবল অল্প সময়ের জন্য বিদ্যমান ছিল। আর সেই ঐতিহাসিক সময়ে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ছিল প্রাথমিক অবস্থা ও শৈশবের যুগ যাতে জীবন ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক সময় খতম হতেই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও ইসলামের মধ্যে একটি পর্দা পড়ে যায়। ফলে ইসলামী জীবনের নিয়মিত শক্তি আর থাকেনি। সভ্যতা, রাজনৈতিক, আর্থিক ও অন্যান্য বহিরাগত কোন কারণ ও কার্যক্রমের ফলে ইসলামী সমাজ জীবন যতই পরিবর্তিত হতে ও উন্নত হতে লাগল ততই ইসলাম ঐ পরিবর্তিত ও উন্নত জীবনের সাথী হতে অক্ষম হলো। ফলে এই পর্দা বরাবর প্রশস্ত হয়ে চলল, এমন কি ইসলামী খিলাফতের শেষ কেন্দ্র (নতুন তুরস্ক) ঘোষণা করে দিল যে, এখন আর ইসলাম সাধারণ জীবনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এখন ইসলামের স্থান ব্যক্তিবর্গের অন্তরেই হবে এবং এই ব্যক্তি কোন ঘোষণা ও উদ্যম ছাড়াই শুধু নিজের জন্য তা প্রকাশ করতে পারবে।[২]

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করতে না পারা সামাজিক প্রয়োজনের চাহিদারই পরিণতি। এ কারণে দিন দিন পরিবর্তিত হওয়া জীবনের অবস্থাসমূহকে ইসলাম নিজ শিক্ষার আলোতে নিজের মত করে পরিচালিত করতে পারেনি এবং ঐ সমস্ত অবস্থা ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে সমতা আনতে বা সমন্বয় সাধন করতে পারেনি। তাই একথা বলা যায় যে, ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করার ওপর জোর

---

১. মিসর সরকারের ইসলামী সভ্যতা বিভাগের সাবেক ডাইরেক্টর ও সংযুক্তগণ আরাবিয়ার ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী।

২. الفكر الاسلامي الحديث, ১৮১-১৮৪ পৃ.।

দেয়ার অর্থ এই যুগে এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, জীবন হতে আলাদা হয়ে যাওয়া। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা উপকৃত না হওয়ার অর্থ মুসলমানের দুনিয়া হতে পেছনে পড়ে থাকা, মুসলিম দেশে দারিদ্র, রোগ ও অজ্ঞতাকে খুশির সাথে সহ্য করা। যেমন বর্তমান সউদী রাষ্ট্রের অবস্থা। এটি একমাত্র ইসলামী দেশ যেখানে সরকারীভাবে ইসলামী শরীয়া কার্যকর করা হয়েছে। এ কারণে তা এই কথার দৃষ্টান্ত যে, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করলে কি ফল হয়।[১]

পরিবর্তন ও উন্নতি জীবনের এমন এক সাধারণ নিয়ম যা হতে পালাবার কোন উপায় নেই। মুসলমানগণকে ইসলাম সম্পর্কেও এই নীতি অবলম্বন করা উচিত, যেন তারা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের অনুসরণ করতে পারে এবং দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলার নাগপাশ হতে মুক্তি পেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন হলো তারা নিজেই ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ এবং ইসলামকে যুগোপযোগী করে পরিবর্তন ও উন্নতির চেষ্টা করে। ইসলামী সমাজকেও পরিবর্তন ও উন্নতির এই স্বাভাবিক ও স্থায়ী নীতির অনুসরণে পাশ্চাত্য আদর্শে (Ideal) গড়ে তোলে। সময়ের তালে তালে একে বদলায় এবং এর উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়। কারণ চিন্তাধারা ও জীবনের ময়দানে পাশ্চাত্য নাগরিকদের নীতি ও প্রবণতা দীর্ঘ মানবীয় অভিজ্ঞতার ফল। পাশ্চাত্য নাগরিকগণ এই সমস্ত প্রবণতা অর্জন করতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। এই পদ্ধতি কুসংস্কার, কল্পকাহিনী ও অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, এর উদ্দেশ্য মানব কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নয়।[২]

প্রায় দেড় দু' শতাব্দীর দীর্ঘ ও ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার পর প্রাচ্যবিদগণ অনুভব করলেন যে, তাদের কাজের প্রণালীর মধ্যে মৌলিক ভুল রয়েছে যার কারণে তাদের চেষ্টা-তদবিরের পূর্ণ ফল পাওয়া যাচ্ছে না, বরং কোন কোন সময় এর বিরুদ্ধে মুসলিমদের মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে যা দাওয়াত ও প্রচারের কার্যের দৃষ্টিতে বিপজ্জনক ছিল। তারা সব সময় তাদের চেষ্টা ও ক্রিয়ার ফলাফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন। এখন ঐ ফলাফলের আলোতে তারা সিদ্ধান্ত করলেন যে, রীতিনীতি ও কাজের পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করা প্রয়োজন এবং মুসলমানদের পরিবর্তন করার চেষ্টার পরিবর্তে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা করা ও কর্মের সংস্কার (Reform) করার আন্দোলন চালানো উচিত। যেখানে যেখানে আধুনিকতা গ্রহণ ও ধর্মের সংস্কারের আন্দোলন চলছে তাদের

১. الفكر الاسلامى الحديث ১৮১-১৮৪ পৃ.
২. ঐ, ১৮৪ পৃ.।

সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত। এ নতুন পদ্ধতির পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতি হতে সুন্দরভাবে জানা যাবে Harry Gaylord Dorman-এর গ্রন্থ Towards Understanding Islam-এ লিখেছেন :

সংস্কার আন্দোলনসমূহের বর্তমান ধর্মীয় শিক্ষার অভিজ্ঞতার আলোতে নতুন করে ব্যাখ্যা করার আন্তরিকতাপূর্ণ চেষ্টা চলছে অথবা এ দ্বারা নতুন অভিজ্ঞতাকে ধর্মীয় শিক্ষার আলোতে বোঝাবার চেষ্টা চলছে। এই কারণে তা একজন খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারকের জন্য বেশি গুরুত্ব রাখে। এর অর্থ কখনও এই নয় যে, প্রতিটি নতুন আন্দোলন যাকে কতক বিকৃত মস্তিষ্ক, উন্মাদ লোক আরম্ভ করে দেয়, তা এই অধিকার রাখে যে, একে মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। আমার উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত আন্দোলন, যেগুলোর অবস্থান বর্তমান জীবনের সত্য ধর্মের প্রকাশ ও দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে আত্মিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে এবং যেগুলো বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং যেগুলোতে আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে।

খুব সম্ভব যে, এর মধ্যে একটি সংস্কার আন্দোলন মুসলিমদের মধ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বোঝবার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে, এমন কি এও হতে পারে যে, আগামী কয় বছরের মধ্যে ইসলামী দেশসমূহে খ্রীস্টান প্রচারকের আসল কাজ হবে মুসলমান ব্যক্তিবর্গের সংশোধন ও পুনর্জাগরণ নয়, বরং ইসলামকে আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগীকরণ।[১] যা-ই হোক, এটাই কাজের এক বিশেষ ক্ষেত্র, যাকে চক্ষুর আড়ালে রাখা যায় না এবং যার সাথে অমনোযোগিতাও প্রদর্শন করা যায় না। এই ময়দান খোলা রয়েছে। এটা ঐ সমস্ত ক্ষমাপ্রবণ উদার মনোভাব পোষণকারী লোকদের আচরণ দ্বারা প্রকাশ পায় যারা খৃস্টান ও মুসলমানদের মিলেমিশে কাজ করাকে স্বাগত জানাতে আগ্রহ দেখায়।[২]

এই অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে মুসলিম বিশ্বে সংস্কার ও উন্নতির, বরং প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য পন্থার যত পতাকাধারী সৃষ্টি হয়েছে তাদের চিন্তা-চেতনা, ঘোষণাপত্রে ও তাদের কার্য পদ্ধতির মধ্যে প্রাচ্যবিদদের ঐ দাওয়াত ও শিক্ষার

---

১. এই আধুনিকতা ও পুনর্জাগরণ স্পষ্ট ঐ প্রাচ্যবিদদের নীতি ও মনের মতই হবে এবং এটা প্রকৃতপক্ষে নতুনত্বের স্থলে পরিবর্তন হবে যা প্রায় সমস্ত ইসলামী দেশে আরম্ভ হয়ে গেছে।

২. Harry Gaylord, Towards Understanding Islam., p. 125.

প্রতিকৃতি পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, এমন কি প্রাচ্যবিদদের ঐ সমস্ত ধারণাই সংস্কারপন্থী নেতাদের চিন্তা ও কার্যক্রমের ভিত্তি বলা যেতে পারে এবং একে তাদের কর্মসূচির মুখপাত্র (Manifesto) বলা যেতে পারে।

এই সমস্ত প্রাচ্যবিদ একদিকে ইসলামের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও মূল্যবোধসমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং খৃস্টীয় পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছে। তারা ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী রীতিনীতির এমন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যাতে ইসলামী মূল্যবোধের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। একজন শিক্ষিত মুসলমানের সম্পর্ক ইসলামের সঙ্গে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সে যেন ইসলাম সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে যায়! কমপক্ষে এ কথা বুঝতে বাধ্য হয় যে, ইসলাম বর্তমান জীবন ও স্বভাবের অনুকূল নয়, বরং যুগের প্রয়োজন ও চাহিদাসমূহকে পূর্ণ করতে অক্ষম। তারা পরিবর্তনশীল জীবন ও পরিবর্তন উপযোগী ও প্রগতিশীল সময়ের নাম নিয়ে আল্লাহ তা'আলার শেষ ও স্থায়ী ধর্ম ও স্থায়ী বিধান মোতাবেক আমল করাকে প্রাচীনত্ব পশ্চাৎগামিতা ও সেকেলে হওয়ার সমতুল্য বলে অপবাদ দেয়।

অপর দিকে এর সম্পূর্ণ বিপরীত তারাই ঐ সমস্ত পুরাতন সভ্যতা ও পুরাতন ভাষাসমূহকে পুনরুজ্জীবন দান করার দাওয়াতও দিয়েছে, যা বাঁচার যোগ্যতা ও জীবনের প্রতিটি প্রকারের কর্মের জন্য কল্যাণকর কর্মশক্তি হারিয়ে অতীতের খড়্গের নীচে শত বছর পর নয়, বরং হাজার বছর ধরে প্রোথিত রয়েছে এবং যাকে জীবিত করার ফল একমাত্র মুসলিম সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, ইসলামী একতাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া, ইসলামী সভ্যতা ও আরবী ভাষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং পুরাতন অন্ধ যুগকে জীবিত করা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। যেমন তাদের লেখার প্রভাবে ও তাদের সুযোগ্য শিষ্যদের দ্বারা মিসরে ফেরআওনী, ইরাকে আশুরী, উত্তর আফ্রিকায় বরবরী, ফিলিস্তিন ও লেবাননের উপকূলে ফিনীকী সভ্যতা ও ভাষার পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে এবং এদের শক্তিশালী আমন্ত্রণকারীরও আবির্ভাব হয়েছে।

প্রাচ্যবিদগণ ও তাদের শিষ্যগণ তীব্রভাবে বলতে শুরু করেছে যে, কুরআনের আরবী ভাষা বিশুদ্ধ সনাতনী ভাষা যা এ কালের প্রয়োজনসমূহকে পূর্ণ করতে পারে না। এর স্থলে কথ্য ও স্থানীয় ভাষার রেওয়াজ দেয়া উচিৎ এবং এ সকল ভাষাকে সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার ভাষা বানানো প্রয়োজন। এ কথা তারা এত সুন্দরভাবে

ও এতবার বলেছে যে, মিসরে উচ্চ শিক্ষিত লেখকগণ এ আন্দোলনের সহায়তা করতে শুরু করে দিয়েছেন।[১]

এই নতুন উদ্যোগের ফল এই দাঁড়াবে যে, প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি প্রদেশের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। কুরআন মজীদ ও ইসলামী সাহিত্য হতে আরব জাতির সম্পর্ক কর্তিত হয়ে যাবে এবং কুরআনের ভাষা তাদের জন্য একটি অপরিচিত ভাষা হয়ে যাবে। আরবী ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদা বাকি থাকবে না এবং আরব জাতি এই সম্পূর্ণ দীনী পুঁজি ও দীনী চেতনা হতে বঞ্চিত হয়ে নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা, অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার শিকারে পরিণত হবে।

তদুপরি তারা আরবী লিপির পরিবর্তে (Roman Charater) গ্রহণ করবার আমন্ত্রণও জানিয়েছে এবং তাদের ছাত্রগণ সময় সময় তার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়। এর উপকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব খুব জোরে-শোরে বর্ণনা করতে থাকে। এর ফলও এ ছাড়া আর কিছু হতে পারবে না যে, সম্পূর্ণ আরব জাতি বিশুদ্ধভাবে কুরআন মজীদ পাঠ করা হতে বঞ্চিত ও অক্ষম হয়ে পড়বে এবং ঐ পরিপূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডার (যা প্রশস্ত ও মূল্যবান হওয়ার ব্যাপারে তুলনাহীন) অর্থহীন ও অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে।

এ সমস্ত প্রস্তাব ও পরামর্শসমূহ দ্বারা প্রাচ্যবিদদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, চিন্তাধারা, দূরদর্শিতা ও ইসলামবিদ্বেষী সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়, তাদের অধিকাংশের রচনাবলী ইসলামের ভিত্তির ওপর কুঠারাঘাততুল্য। ইসলামী বিষয়সমূহের উৎসসমূহকে (হাদীস ও ফিকহসহ) সন্দিগ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তারা অগ্রগামী। মুসলিম সমাজে ভীষণ বিশৃঙ্খলা, সন্দেহ, দ্বিধা সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য। ইসলামের বাহক ও ব্যাখ্যাকারিগণ (মুহাদ্দিস, ফকীহ)-এর জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্পর্কে তারা মুসলমানদের সন্দিগ্ধ করে তোলে। স্পষ্ট বিদ্যাগত ভুল, উপহাসযোগ্য ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল অনুভূতি, ভাষা ও ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও কখনও কখনও প্রকাশ্যে পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত তাদের বর্ণনায় ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। তদপুরি তাদের অধিকাংশ রচনা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জগতে গৃহীত ও স্বীকৃত।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ (যাদের মধ্যে পরিণত বয়স্ক জ্ঞানীদের কিছু সংখ্যক অন্তর্ভুক্ত) সেগুলোর সুন্দর বিন্যাস, প্রমাণসিদ্ধ পদ্ধতি ও ফলাফল বের করা

---

১. সালামা মূসা এই আন্দোলনের বিশেষ হোতা ছিলেন। মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল, আহমদ আমীন ও আহমাদ হাসান যযায়্যাতও আংশিকভাবে এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ও পেশ করার বিজ্ঞানসম্মত (সাইনটিফিক) রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত ও মুগ্ধ এবং তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা প্রাচ্যের জ্ঞানীদের লিখিত পুস্তক দ্বারা নিবারিত হয় না। পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ যে পদ মর্যাদা অর্জন করেছে তার ধারণা এটা দ্বারা হতে পারে যে, মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি উচ্চ মানের জ্ঞান পরিষদ (Academies), যথা: মিসরের المجمع اللغوى, সিরিয়ার المجمع العلمى العربى ও বাগদাদের المجمع اللغوى العراقى-এর সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছু প্রাচ্যবিদ রয়েছেন এবং তাদের ধারণা ও মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। মুসলিম বিশ্ব ও আরব বিশ্বের দেউলিয়াত্ব ও ভীরুতার আন্দাজ এ দ্বারা করা যায় যে. খাঁটি ইসলামী ও আরবী বিষয়ের ওপরও দীর্ঘ সময় হতে প্রাচ্যবিদদের পুস্তক ও রচনার ওপর নির্ভর করা হচ্ছে এবং সেগুলো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর এক প্রকার পবিত্র পুস্তক (Gospel)-এর মর্যাদা রাখে। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর নিকলসন (R. A. Nicholson)-এর পুস্তক A Literary History of the Arabs ও আরব ও ইসলামী ইতিহাসের উপর ড. হিট্টি (P. K. Hitti)-এর পুস্তক History of the Arabs, ইসলামী সাহিত্যের ইতিহাসের উপর ব্রোক্যালম্যানের পুস্তক Geschichtie Der Arabischen, জার্মান ভাষায় ও এর ইংরেজী অনুবাদ The History of Arab Literature, ইসলামী ফিকহের উপর শাখতের পুস্তক The Origins of Mohammadan Jurisprudence। এ সমস্ত পুস্তক স্ব স্ব বিষয়ে বিরল বলে মনে করা হয় এবং প্রাচ্যের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী বিষয়সমূহের বিভাগে এগুলো সহায়ক গ্রন্থ (Reference book) ও বিশেষজ্ঞ (Authority) পর্যায়ের বলে মনে করা হয়। প্রাচ্যবিদদের সংকলিত دائرة المعارف الاسلامية (Encyclopeadia of Islam) যার বিভিন্ন সংস্করণ ইউরোপ ও আমেরিকা হতে বের হয়েছে এবং যাতে নামেমাত্র কতক মুসলমান লেখকদের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাকে ইসলামী জ্ঞান ও তথ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রমাণিত সম্পদ মনে করা হয় এবং মিসর ও পাকিস্তানে এটাকে ভিত্তি করে আরবী ও উর্দূতে ইসলামী বিশ্বকোষ অনুবাদ ও রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে।

এই অবস্থার সংশোধন ও প্রাচ্যবিদদের বিধ্বস্তকারী ও সন্দিগ্ধ করার ক্রিয়াকে বাধা দেয়ার একমাত্র পন্থা হলো এই যে, ঐ সমস্ত বিষয়ের ওপর মুসলমান দার্শনিক ও গবেষকগণ লিখতে বদ্ধপরিকর হন এবং প্রাচ্যবিদদের ঐ সমস্ত প্রশংসনীয় বিশেষত্বসমূহের প্রতি কেবল লক্ষ্য রেখেই নয়, বরং তাকে আরও উন্নত মানের করতে হবে যা প্রাচ্যবিদদের কর্ম বলে এতদিন মনে করা হতো। মুসলিম

লেখকগণকে প্রমাণিত ও শুদ্ধ ইসলামী অভিজ্ঞতা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করতে হবে। তাদেরকে এমন পুস্তক ও সাহিত্য রচনা হতে হবে যা মৌলিক (Originality) ও ব্যাপক অধ্যয়নের ফল, দৃষ্টির গভীরতা, পরিচয়ই প্রামাণিতা উৎসের ও তথ্যনির্ভর হওয়ার দিক দিয়ে প্রাচ্যবিদদের পুস্তকসমূহ হতে বহু গুণে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ হবে। এর মধ্যে তাদের সমস্ত সৌন্দর্য-সৌকর্য থাকবে এবং তাদের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হবে।

অপর দিকে প্রাচ্যবিদদের পুস্তকাদির সঠিক পর্যালোচনা করতে হবে এবং তাদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনাকে প্রকাশ করে দিতে হবে। মূল পাঠের অর্থ উদ্ধারে তাদের যে ভুল হয়েছে এবং অনুবাদ ও মর্ম গ্রহণে যে ভুল-ত্রুটি রয়েছে তাকে স্পষ্ট করে দিতে হবে। তাদের উৎসের দুর্বলতা ও তাদের গৃহীত ফলাফলের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরতে হবে। তাদের প্রচারে ও শিক্ষা দানে যে কু-উদ্দেশ্য, ধর্মীয় অভিসন্ধি রয়েছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত আছে একে ভালরূপে জানিয়ে দিতে হবে এবং বলতে হবে, বরং এটা উপলব্ধি করতে হতে যে, এটা ইসলাম, ইসলামী সমাজ ও সভ্যতার বিরুদ্ধে কত বড় একটি গভীর ও হীন ষড়যন্ত্র !

প্রথমটি ইতিবাচক কাজ (ইসলামী বিষয়সমূহের ওপর পুস্তক ও প্রবন্ধ লেখা) এবং অপরটি নেতিবাচক কাজ। পর্যালোচনা ও বিচার এই দু'টি পন্থায় অগ্রসর হতে হবে। নতুবা মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিজীবী ও উচ্চ সাহসী লোকদের যারা ইউরোপ ও আমেরিকার উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় অথবা নিজ দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং পাশ্চাত্য ভাষায় (যে ভাষায় তারা বেশি অভিজ্ঞতা রাখেন) ইসলামী সাহিত্য পাঠ করেন তারা প্রাচ্যবিদদের ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনার বিষক্রিয়া হতে মুক্ত হতে পারবেন না। আর তারা যত দিন এই বিষাক্ত ছোবল হতে মুক্ত হবেন না, ইসলামী দেশসমূহ ততদিন চিন্তার বিশৃঙ্খলা ও বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয়ের বিপদে নিমজ্জিত থাকবে। ফলে ঐ সমস্ত দেশ আধুনিক ও পাশ্চাত্যের সমর্থকরা সব সময় ক্ষতিকর বিভিন্ন চিন্তা ও কল্পনাকে প্রকাশ করতে থাকবে। আর যখন তাদের হাতে ক্ষমতা আসবে তখন তাকে কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করবে যা ইসলামী তত্ত্বের বিপরীত। অতঃপর এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করবে যা কেবল নামে ও পরিচয়ে পুরাতন ইসলামী সমাজের সাথে সাদৃশ্য রাখে, অথচ যার লক্ষ্য পাশ্চাত্য সমাজ, সভ্যতা ও খাঁটি বস্তুবাদ। এই পরিস্থিতিতে নেতাদেরকে কমপক্ষে এ কথা শুনিয়ে দেয়া ঠিক হবে :

ترسم نرسی بکعبه اے اعرابی
کیں رہ کہ میروی بترکستان است

অর্থাৎ হে মরুচারী আরব! আমার ভয় হচ্ছে তুমি কা'বাগৃহে পৌঁছবে না। (কারণ) তুমি যে রাস্তা দিয়ে চলেছ তা তুরস্কের রাস্তা।

ইসলামী জ্ঞানের পতন ও আলিমদের চিন্তা জগতে দীনতা

মুসলিম বিশ্বের আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী, যাদের হাতে শাসন ক্ষমতা ও রাজনৈতিক লাগাম রয়েছে, তাদের বিপথগামিতা, অমূলক সংশয় ও ধর্ম হতে নৈরাশ্যের কতক কারণ ঐ স্থবিরতা ও অস্থিরতা যা ইসলামী জ্ঞানের কেন্দ্রসমূহ ও এর প্রতিনিধিদের ওপর দীর্ঘকাল হতে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। এই স্থবিরতা ও অস্থিরতার কারণে এ সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান যা বিকাশ ও উন্নতির পূর্ণ যোগ্যতা রাখে, স্বীয় যোগ্যতা ও উপকারিতা হারিয়েছে এবং পরিবর্তনশীল জীবনের পরিচালনার গুরু দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উপযোগিতা সৃষ্টি করতে পারছে না। কর্মের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারছে না যা বাঁচা-মরার এই সংগ্রামের যুগে প্রয়োজন ছিল। ইসলামী শিক্ষার পুরাতন পাঠ্য তালিকা অতীতে বরাবর পরিবর্তিত হয়ে জীবনের সহচর হিসেবে বিদ্যমান ছিল।

সেই সময় পরিবর্তন বহু দেরিতে আসত এবং তার পদ্ধতিতে মৌলিক কোন পার্থক্য দেখা দিত না। এ সমস্ত পরিবর্তন ব্যক্তিবর্গ ও শাসক পরিবারের পরিবর্তনের নামেই ছিল মাত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠ্য তালিকা প্রবর্তনকারিগণ ও শিক্ষা বিষয়ের কর্ণধারগণ তাদের প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তির সর্বদা প্রমাণ দিয়েছেন এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দ্বারা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু যখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে শাসক পরিবারের পরিবর্তন নয়, বরং সভ্যতা, চিন্তাধারা, ও মূল্যবোধের পরিবর্তন সূচিত হলো, এই বিপ্লবের প্রসারতা ও তীব্রতা পূর্বের দুই সীমা অতিক্রম করে গেল, কিন্তু এই পাঠ্য তালিকা একই স্থানে থেমে থাকল এবং পাঠ্য তালিকার প্রয়োজনীয় সফল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকে অস্বীকার করা হলো।

বিষয়সমূহ, নির্দিষ্ট কিতাবাদি ও শিক্ষা পদ্ধতি, প্রতিটি ব্যাপারে ঐ পদ্ধতির প্রতি জেদ করা হলো যা ভারতে দরসে নিযামী (প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিযামুদ্দিন লখনভী, (মৃ. ১১১৬ হি.) নামে অভিহিত এবং মধ্যপ্রাচ্যে খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিমদের দ্বারা স্থাপিত ছিল। ফিকহ ও ইসলামী আইনে প্রশস্ততা আনয়ন করা হলো না, যদিও ঐ সমস্ত নতুন বিষয় বা নতুন আবিষ্কার ও নতুন

অর্থনৈতিক বিবর্তন ও নতুন ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করেছিল। তাদের জন্য ইজতিহাদের প্রয়োজন ছিল কিন্তু এই ব্যবস্থা কাজে লাগানো হয়নি। ইজতিহাদ যা গুরুত্বপূর্ণ ও কতিপয় শর্তের সাথে যে কোন অবস্থায় ইসলামী আলিমদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ও পরিবর্তিত সময়ে পথ প্রদর্শনের উপায় ছিল, কার্যত অকেজো ও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জনৈক সমসাময়িক আরব 'আলিম'[১] সুন্দর ভাষায় মন্তব্য করেছেন যে, আলিমদের ইজতিহাদের দরজা খোলা (শরীয়ত অনুযায়ী) নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু যে পরিচয় দিয়ে তারা তা খুলতে পারতেন তা দীর্ঘদিন হতে হারিয়ে গিয়েছিল।

ইসলামী জ্ঞান, কুরআনের জ্ঞান ও ইসলামী শরীয়ত (বিধি-বিধান)-এর জন্য যে শক্তিশালী, মর্মস্পর্শী, হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং এর জন্য আধুনিক যুগের ভাষা ও সাহিত্যের যে বর্ণনা পদ্ধতি ও রচনাশৈলীর প্রয়োজন ছিল, তা যদিও বিরল নয় তবে দুষ্প্রাপ্য নিশ্চয়। এই প্রকার আলিম খুবই কম পাওয়া যায়, যারা এ সমস্ত ধর্মীয় তত্ত্বের চিরন্তন হওয়ার, জীবনের জন্য উপযোগী হওয়ার এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার চিত্র আধুনিক শ্রেণীর লোকদের মন ও মস্তিষ্কের ওপর স্থাপন করতে পারেন। পরিপূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ সমালোচনার সাথে চুলচেরা বিচার দ্বারা আধুনিক সভ্যতার জাদুকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারেন।

ইসলামী আইনের নতুন সূত্রে সম্পাদনার প্রয়োজন

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন বিশিষ্ট ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি সৃষ্টি হয়েছেন, যাঁরা কোন কোন বড় এলাকাকে তাদের শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত করেছেন এবং বড় বড় দলকে ধর্মবিরোধিতা হতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আবার কোন কোন অঞ্চলে ফিক্‌হ ও ইসলামী বিষয়ের ওপর এককভাবে কাজও হয়েছে। ফিক্‌হ ও ইসলামী আইনকে নতুন পোশাকে[২] সজ্জিত করা হয়েছে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে এমন এক শক্তিশালী বিশ্বব্যাপী "শিক্ষা" আন্দোলনের অভাব বরাবর অনুভূত হচ্ছে যা আধুনিক দলের ইসলামের ভাণ্ডারের সঙ্গে সম্পর্ক ও সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে এবং ইসলামী জ্ঞানে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। তারা এই সত্যকে প্রমাণিত করতে পারে যে, ইসলামী আইন ও

---

১. তিনি প্রফেসর মুস্তফা' আহমদ আয-যুরকা, ওমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ফিকহের প্রফেসর এবং সিরিয়া সরকারের সাবেক আইনমন্ত্রী।

২. নমুনা হিসেবে মুস্তফা যুরকার মূল্যবান কিতাব "المدخل الفقهى العام" ড. মুস্তফা সিবাঈ-এর কিতাব "الاحوال الشخصية" (৩ খণ্ডে) মিসরে শেখ মুহাম্মাদ আবূ যুহরার কতক প্রবন্ধ আধুনিক বিষয়ের ওপর পেশ করা যেতে পারে।

ইসলামী ফিক্‌হ্ অত্যন্ত প্রশস্ত ও প্রগতিশীল আইন ও তা এমন চিরস্থায়ী রীতিনীতির ওপর স্থাপিত যা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত ও অকেজো হতে পারে না, যাতে জীবনের যাবতীয় পরিবর্তন ও উন্নতির সহযোগী হওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এবং যার উপস্থিতিতে মানুষের উদ্ভাবিত কোন আইনের আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন নেই। এটা বর্তমান যুগের এমন দরকারী কাজ যা ইসলামী দেশসমূহকে ও বর্তমান ইসলামী সমাজকে চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মবিরোধিতা হতে বাঁচাতে পারে এবং পাশ্চাত্য ঘেঁষা আধুনিকতার এই গতিশীল স্রোতকে বাধা দিত পারে যা বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে পূর্ণ উদ্যমে প্রবাহিত রয়েছে।

আল্লামা ইকবাল এ কাজের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও এর সুদূর প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে ঠিকই লিখেছেন :

আমার বিশ্বাস এই যে, যে ব্যক্তি বর্তমান সময়ের ব্যবহারশাস্ত্র (Juris-prudence) তথা আইনের মৌলিক বিষয়ের ওপর সমালোচনামূলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কুরআনী আদেশাবলী চিরস্থায়ী হওয়া প্রমাণিত করবেন তিনিই ইসলামের মুজাদ্দিদ হবেন এবং তিনিই মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ খাদেম হবেন। প্রায় সমস্ত দেশে বর্তমানে মুসলমানগণ হয়ত নিজেদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে অথবা ইসলামী আইনসমূহ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করছে। মোটকথা এখন কাজ করার সময়। কেননা আমার ক্ষুদ্র মতে ইসলাম ধর্ম বর্তমানে যেন সময়ের কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ খাচ্ছে! সম্ভবত ইসলামী ইতিহাসে এমন সময় ইতিপূর্বে কখনও আসেনি।[১]

ইসলামী ফিক্‌হকে নতুনভাবে সম্পাদনা করা ও পুনঃগঠন করার অর্থ এই নয় যে, নতুন আইনের ভিত্তি রাখা, যা করতে হলে নতুন রীতি প্রবর্তন করতে হয় এবং একটি বস্তুকে অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্বে আনবার প্রয়োজন হয়। ইসলামী ফিক্‌হ আইনশাস্ত্রের বিরাট সম্পদ যা মানব প্রতিভা ও শ্রমের এমন বিস্ময়কর নিদর্শন যার দৃষ্টান্ত জগতের আইন ভাণ্ডারসমূহে পাওয়া কঠিন। এটা জীবনের বহু বড় অংশ ও প্রাচীন যুগের প্রায় সকল অবস্থার পরিবেষ্টনকারী।

কেবল এটা প্রয়োজন যে, ঐ সমস্ত জ্ঞানসম্পন্ন মূলনীতি ও পূর্ণাঙ্গ বিধান হতে (যা সম্পূর্ণ কুরআন ও হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত) নতুন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে আবিষ্কার করা এবং এ দ্বারা বর্তমান জীবনের প্রয়োজন ও পরিবর্তনসমূহের জন্য পথনির্দেশ অর্জন করা। এ ফিক্‌হ সম্পদের বিস্তৃতি ও এর আইনী মর্যাদা ও মূল্যের আন্দাজ

---

১. ইকবালনামা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০-৫১।

করার জন্য প্রসিদ্ধ সিরীয় বিদ্বান ও আইন বিশেষজ্ঞ মুস্তফা আহমদ যুরকার কিতাব "المدخل الفقهى العام الى الحقوق المدنية"-এর ভূমিকা হতে একটি উদ্ধৃতি পেশ করা যাচ্ছে, যাতে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তাহব্যাপী ইসলামী আইন সেমিনারে পাশ্চাত্য আইন বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী ফিক্হ সম্পর্কে যে অভিমত ও ধারণা পেশ করেছে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

সদৃশ আইনসমূহের বিশ্ব একাডেমীর প্রাচ্য আইন শাখা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে ইসলামী ফিক্হের সপ্তাহ উদ্যাপন করেছে এবং এ প্রসঙ্গে একটি বড় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কনফারেন্স প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ফিকহের প্রফেসর মোছিয়্যু (Milliot)[১] সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় আরব-অনারব দেশসমূহের আইন কলেজের শিক্ষকগণ, মিসরের আযহার বিশ্ববিদ্যালয়েরর প্রতিনিধিগণ, আরব ও ফ্রান্সের আইনজীবিগণ ও বহু সংখ্যক প্রাচ্যবিদ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মিসর হতে চারজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। দু'জন ফুওয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় হতে, একজন ইবরাহীম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যক্ষ ও আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের هيئة كبار العلماء[১]-এর একজন প্রতিনিধি আর দামিশক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজর পক্ষ হতে আমি (গ্রন্থকার) ও ড. মারূফ আদ-দওয়ালিবী প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম। প্রতিনিধিগণ দিওয়ানী, ফৌজদারী ও অর্থ সংক্রান্ত আইনের পাঁচটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছেন যা পূর্বেই একাডেমীর পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল, সেগুলা নিম্নরূপ :

১. অধিকার সাব্যস্ত করা, ২. জনকল্যাণের জন্য জনগণের সম্পত্তি দখল করা, ৩. অপরাধের দায়িত্ব, ৪. ইজতেহাদী অভিমত বা সিদ্ধান্তসমূহে একে অন্যের ওপর প্রভাব ও ৫. সুদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি।

এ সমস্ত বক্তৃতা ও আলোচনা ফরাসী ভাষায় হয়েছিল এবং প্রতিটি বিষয়ের আলোচনার জন্য একদিন নির্দিষ্ট ছিল। প্রতিটি মূল বক্তৃতার পর বক্তা ও কনফারেন্সের প্রতিনিধিদের মধ্যে বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্ক হতো যা বিষয় ও প্রয়োজন অনুপাতে কখনও কখনও দীর্ঘ হতো, আর কখনও সংক্ষিপ্ত। এর সারমর্ম লিপিবদ্ধ করে নেয়া হতো। এই প্রকার আলোচনা চলাকালে জনৈক সদস্য যিনি

১. আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিষদ যা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও জ্ঞান বিষয়সমূহ মীমাংসা করে।

প্যারিস বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন তিনি বললেন : আমার বোধগম্য হচ্ছে না যে, সাধারণ ধারণায় ইসলামী ফিক্হ অনমনীয় ও কঠোর এবং এর আধুনিক সভ্যতার প্রয়োজন মেটাবার যোগ্যতা নেই, অথচ এই কনফারেন্সের বক্তৃতা ও আলোচনা দ্বারা যে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা প্রমাণিত হচ্ছে, এখন এই দু'য়ের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সৃষ্টি করা যায়?

সভার শেষে সমস্ত প্রতিনিধি একমত হয়ে একটি প্রস্তাব পাস করলেন, যার অনুবাদ নিম্নে দেয়া গেল :

এই কনফারেন্সে অংশ গ্রহণকারিগণের আলোচনার প্রেক্ষিতে যা ইসলামী ফিকহ্ সম্পর্কে পেশ করা হয়েছে এবং তাদের যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে এ কথা ভালরূপে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে যে,

ক. ইসলামী ফিকহের আইনগত ও বিধানগত এক বিশেষ মূল্য রয়েছে এবং তাতে কোন সন্দেহ করা যেতে পারে না, খ. এই বৃহৎ আইনগত সম্পদের মধ্যে রয়েছে ফকীহ সম্প্রদায়ের মতানৈক্য, অভিজ্ঞতা, প্রামাণ্য তথ্যাদি এবং আইনের মূল তথ্যের বৃহৎ ভাণ্ডার যা স্বীকৃতির ও প্রশংসার যোগ্য। এ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী ফিক্হ নতুন জীবনের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূর্ণভাবে পূরণ করার যোগ্য। আমরা এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছি যে, প্রতি বছর এই সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হোক এবং কনফারেন্সের সেক্রেটারিয়েটকে দায়িত্ব দেয়া যাচ্ছে যে, যেন তাঁরা এই সমস্ত বিষয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত রাখেন, যাকে আগামী সম্মেলনে আলোচনা ও বিবেচনার বিষয়বস্তু করার প্রয়োজন মনে করা হয় যা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

কনফারেন্সের প্রতিনিধিগণ এটাও আশা রাখেন যে, ইসলামী ফিক্হের একটি ডিকশনারী তৈরি করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক, যাতে আইনের পুস্তকাদি হতে উপকৃত ও লাভবান হওয়া যায় এবং উৎসগুলোর সন্ধান লাভে সহজ হয়। এগুলো ফিকহের এমন এক বিশ্বকোষ হতে পারে যাতে ইসলামী আইনের সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নতুন পদ্ধতিতে বিন্যস্ত থাকবে।[১]

---

১. المدخل الفقهى العام، ص، ج، د، ٥ , ৩য় এডিশন, ১৯৫২ খ্রী.।

আশার আলো

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেণী, যারা নিজেদের যুগের বিশেষ শিক্ষার ও নতুন যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব ও পরিচালনার পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তাদের ঐ সমস্ত দুর্বলতা ও স্বভাব সত্ত্বেও যা পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফল, তাঁরা সুস্থ বোধশক্তি ও ন্যায় গ্রহণ করার সামর্থ্য ও যোগ্যতা হতে বঞ্চিত নন, বরং সাধারণত তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি, কার্যক্ষমতা ও সত্য উপলব্ধির দিক দিয়ে অন্যান্য শ্রেণী হতে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর অনেক ব্যক্তি এমনও রয়েছেন যারা যখন কোন কথা ঠিক ও যথার্থ মনে করেন তখন খুব গভীর আগ্রহ ও উদ্যমের সঙ্গে তা অন্য লোকের নিকট পৌঁছাতে ও প্রচার করতে সচেষ্ট হন।

ঐ শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক পাওয়া যায় যারা ইসলামের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখেন এবং ইসলামকে ভালবাসেন। এই শ্রেণী হতে ইসলাম সঠিক মতের অধিকারী, গভীর দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন চিন্তাবিদ, ইসলামের প্রকৃত খাদেম ও প্রাণ উৎসর্গকারী মুজাহিদ পেয়েছে। বহু ধর্মীয় দাওয়াত ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য এই শ্রেণী হতে উৎসাহী ও উদ্যমশীল প্রচারক ও কর্মী পাওয়া গিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী, মুফতী মুহাম্মদ আব্দুহু ও শেখ হাসানুল বান্নার কর্মতৎপরতায় ও ভারতের খেলাফত আন্দোলন হতে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এক কথায় ধর্মীয় আন্দোলনের নেতাগণ এই শ্রেণীর লোক হতে বহু উত্তম কর্মী পেয়েছে।

এখন যদি ধর্মের প্রচারকগণ নিঃস্বার্থভাবে ও আন্তরিকতার সাথে তাদেরকে ধর্মের সঙ্গে পরিচিত করার চেষ্টা করেন , তাদের অন্তরের ঐ সন্দেহসমূহ দূরীভূত করার চেষ্টা করে যা পাশ্চাত্যের বিশেষ ধারার শিক্ষার কারণে তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে. এভাবে তাদের ঈমানের অগ্নিকণাকে উস্কিয়ে দিতে সফলকাম হওয়া যায় যা এখনও তাদের মন ও মস্তিষ্কে ঈমানী আলো প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, তাহলে এখনও এই শ্রেণীর মধ্যে ইকবাল ও মুহাম্মদ আলীর মত চিন্তাবিদ ও কর্মী সৃষ্টি হতে পারে। এটা ধর্মীয় প্রচারকদের জন্য এমন এক আশ্চর্যজনক ও আনন্দদায়ক আবিষ্কার হবে যে, তখন মুখ হতে অতর্কিতে বের হবে :

ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی

অর্থাৎ হে প্রতিপালক! এমন স্ফুলিঙ্গ ছাইয়ের মধ্যে নিহিত ছিল!

বিশ্বব্যাপী অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ও ইসলামী বিশ্বে ব্যাপক বিপ্লব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ধর্ম প্রচারকদের জন্য এ শ্রেণীর লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কারণ এই শ্রেণীর লোকদের ভুল চিন্তা ও পথভ্রষ্টতা মুসলিম বিশ্বকে বিশ্বাসে ও চিন্তায় ধর্মবিরোধিতার বিপদে লিপ্ত করেছে। ইসলামী দেশসমূহের লক্ষ্য খাঁটি ইসলামী হওয়ার পরিবর্তে খাঁটি পাশ্চাত্য হয়ে গেছে। জনগণকে বাকহীন পণ্য বা ভেড়ার পালের মত অনৈসলামী নেতৃত্বের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। এটা একটি বাস্তব সত্য, ঐ শ্রেণীর সংশোধন দ্বারা আবার এই দেশসমূহের লক্ষ্য পাশ্চাত্যের পরিবর্তে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা যায়।

ذرا نم ہوتو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی

অর্থাৎ হে সুরাবাহি! সামান্য কোমল যদি হতে! কারণ এ মাটি বড়ই উর্বর।

মুসলিম বিশ্বে স্বাতন্ত্র্য ও মুজতাহিদমূলক তৎপরতা

তৃতীয় অবস্থান

এখন বিচার্য, তৃতীয় অবস্থান কি? এটা ঐ ভারসাম্যপূর্ণ ও সঠিক অবস্থান যা মুসলিম বিশ্বকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং পাশ্চাত্য ও ইসলামী সভ্যতা,যা এই দু'য়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে ইসলামের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

আমাদের উম্মতে ইসলামিয়ার স্বভাব ও এই বিশ্বে তাদের পদ, মর্যাদা ও জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞান লাভ করা ছাড়া মুসলিম বিশ্বের আবস্থান নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কারণ এগুলো সভ্যতা সৃষ্টি করে।

মুসলিম উম্মাহর পদমর্যাদা ও তার পয়গাম

মুসলিম উম্মাহ শেষ ধর্মীয় বার্তাবাহক এবং এই বার্তা তাদের যাবতীয় কর্ম, গতি ও স্থিতির নিয়ামক। তাদের পদ মর্যাদা হলো নেতৃত্ব প্রদান, পথ প্রদর্শন ও বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের পদ মর্যাদা। কুরআন মজীদ বলিষ্ঠ ও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .

অর্থাৎ (হে ঈমানদারগণ। ইসলামী দাওয়াতের অনুসরণকারিগণ) তোমরা সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমরা মানুষকে সরল পথ দেখানো ও সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছ। তোমরা ভাল কাজের আদেশদাতা, মন্দ কাজে বাধা সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহ্র প্রতি খাঁটি ঈমান আনয়নকারী। [সূরা আলে-ইমরান আয়াত :১১০]

আর এক জায়গায় বলা হয়েছে :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ .

অর্থাৎ এবং এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যম উম্মত (শ্রেষ্ঠ) বানিয়েছি যেন তোমরা জগতের মানুষের ওপর সাক্ষী হও! [সূরা আল-বাকারা : ১৪৩]

এ কারণে এটা হতেই পারে না যে, এই উম্মতের স্থান যাত্রীদলের পেছনে হবে, শিষ্য ও অনুচরের শ্রেণীতে হবে। এই উম্মত অপর জাতির সাহায্যে বেঁচে

থাকবে এবং নেতৃত্ব, পরিচালনা, আদেশ, নিষেধ, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তার স্বাধীনতার স্থলে অনুকরণ, অনুসরণকারী ও হার মানা অবস্থায় আনন্দিত ও শান্ত থাকবে। তাদের সঠিক অবস্থানের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তিটি যে ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী, স্বাধীন মন-মানসিকতার মালিক, যে প্রয়োজন ও অভাবে অপর হতে নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা ঐ বস্তু গ্রহণ করে যা তার অবস্থার অনুরূপ হয় এবং তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাসকে ঘায়েল করে না, এবং ঐ সমস্ত বস্তুকে প্রত্যাখান করে তাদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অনুরূপ হয় না অথবা তাকে দুর্বল করে দেয়। এ কারণেই এ জাতিকে অন্য কোন জাতির রীতিনীতি ও স্বাতন্ত্র্যকে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।[১]

এ জাতি জীবনের এক বিশেষ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রাখে। জগতের জন্য তার নিকট এক পরিপূর্ণ বার্তা রয়েছে। তার সভ্যতা, সংস্কৃতি, তার চেষ্টা, তদবীর, কর্ম, তার সকল প্রকারের উৎসাহ, উদ্দীপনা, তার আকীদা ও উদ্দেশ্যের অধীন। তার নিকট শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞান, শক্তির জন্য শক্তি এবং একতার জন্য একতার কোনই মূল্য নেই। মানব ও জগতের ওপর জয়ী হওয়া, বস্তুজগত ও ব্যক্তিসমূহকে পরাস্ত করা যদি তা নিছক শক্তির সম্পূরক ও জ্ঞান অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তা তার নিকট ক্রীড়া, কৌতুক অথবা সীমাহীন আত্মগৌরব ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন মজীদ তাদের আবেগ, উদ্যম ও মনোযোগকে এই আয়াত দ্বারা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছে :

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থাৎ সেই পরকালের নিবাস ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করছি যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। ভাল ফল মুত্তাকীগণের জন্য। [সূরা কসাস আয়াত : ৮৩]

---

১. আল্লামা হুছাইন বিন মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ত্বীবী (মৃ. ৭৪৩ হি.)। তাঁর কিতাব الكاشف عن حقائق السنن المحمدية (মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা)-তে হাদীস من تشبه بقوم فهو منهم-এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন : এর মধ্যে চরিত্র, আকৃতি-প্রকৃতি ও রীতিনীতি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু যেহেতু রীতিনীতি সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট ও প্রকাশিত, এ কারণে এই অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী (মৃ. ১০১৪ হি.) মিরকাত, মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা কিতাবে লিখেছেন : এই হাদীস দ্বারা রীতিনীতিই উদ্দেশ্য। কারণ বাহ্যিক চরিত্রের মধ্যে تشبه হয়, ভেতরগত চরিত্রের জন্য تشبه শব্দ ব্যবহৃত হয় না, تخلق শব্দের ব্যবহার হয়। এ কারণেই এর মর্ম জাতির বৈশিষ্ট্যসমূহ ও নিদর্শনাদি।

শক্তিশালী, জ্ঞানী, পুণ্যাত্মা ও সংশোধনকারী মুসলমান

প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত ও মানব কল্যাণের উদ্দেশে ইসলাম জাগতিক জীবন ও জ্ঞানের রাস্তায় পরিশ্রম ও চেষ্টাকে অনুচিত বা বেআইনী সাব্যস্ত করেনি, বরং কোন কোন সময় এর জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিশালী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, পুণ্যাত্মা ও সংশোধনকারী মু'মিনের বর্ণনা দিয়েছেন। তারা জাগতিক ও পার্থিব শক্তিসমূহকে পরাস্ত করে, উপায়-উপকরণ, অর্থ-সম্পদ জমা করে। সে নিজের বিজয় ও প্রয়োজনীয় বড় বড় কাজের সীমা বরাবর প্রশস্ত করতে থাকে। কিন্তু শক্তি, প্রশাসনিক ক্ষমতা ও নেতৃত্বের যৌবনকালে ও বাহ্যিক সার-সরঞ্জামের ব্যবহারের পরও নিজেদের মা'বুদের ওপর ঈমান রাখে, আল্লাহ্র সম্মুখে মাথা নত করে, পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে এবং এর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, নিজ দুর্বলতা স্বীকার করে। তারা মানবতার সহায়ক ও দুর্বল জাতিসমূহের ওপর সদয় হয়, সত্যের পৃষ্ঠপোষক হয়, নিজের সমস্ত শক্তি, চেষ্টা, ক্ষমতা, নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহ তা'আলার নামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনার জন্য ও মানব পূজা হতে আল্লাহ্র পূজার দিকে ফেরাবার জন্য ব্যয় করে। এই চরিত্র ও কর্মেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন হযরত সুলায়মান বিন দাউদ আলাইহিস সালাম, যুলকারনায়ন, খুলাফায়ে রাশেদীন ও ইসলামের ইমামগণ তাঁদের যুগে ও সময়ে।

ইহজীবন পরকালের জন্য একটি ক্ষণস্থায়ী মনযিল

এই জীবন সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও পন্থা এই যে, এই জীবন সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য নয় এবং উন্নতি ও সফলতার সোপানও নয়। এটা এমন এক মধ্যবর্তী ক্ষণস্থায়ী বিরতি স্থান যা পার হয়ে যাওয়া মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজন। ইসলাম এই স্বল্প মেয়াদী জীবনকে সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা, চিরস্থায়ী ও আনন্দে পরিপূর্ণ জীবনের এক অছিলা ও মধ্যস্থ মনে করে মাত্র। কুরআন মজীদ এই জগতের অস্থায়িত্ব ও পরকালের মোকাবেলায় এর অর্থ যথার্থ হীনতার কথা বর্ণনা দিয়ে বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে :

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ـ

অর্থাৎ (স্মরণ রাখ) জগতের জীবন পরকালের মুকাবিলায় (কিছুই নয়) কিঞ্চিৎকর। [সূরা তাওবা আয়াত : ৩৮]

অন্য স্থানে ইরশাদ হয়েছে :

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ এবং প্রকৃত জীবন পরকালের জীবনই, যদি তাদের এর জ্ঞান থাকত (তা হলে এরূপ করত না)। [সূরা আন কাবুত, আয়াত: ৬৪]

অপর এক স্থানে আছে :

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ لا وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ـ

অর্থাৎ তোমরা ভালমতে জেনে রাখ যে, (পরকালের জীবনের মুকাবিলায়) এ জগতের জীবন, ক্রীড়া, কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, অর্থ-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততিতে একে অপরের চেয়ে অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা। যেমন বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তার উৎপন্ন শস্যসম্ভার কৃষকদের খুব ভাল মনে হয়। তৎপর তা শুকিয়ে যায়। তখন একে হলদে বর্ণ দেখা যায়। তৎপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর পরকালের (অবস্থা এই যে, তথায়) ভীষণ শাস্তি ও পীড়ন রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন কেবল প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা বৈ কিছুই নয় ! [সূরা আল হাদীদ আয়াত : ২০]

তারা অকৃত্রিমভাবে এই জীবনকে পরকালের সাঁকো ও কর্মের এক সুযোগ সাব্যস্ত করে।

আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ـ

অর্থাৎ মাটির ওপর যা আছে তাকে আমি জগতের সৌন্দর্যের কারণ বানিয়েছি যেন মানুষকে পরীক্ষায় ফেলি! কে এমন হবে যার কার্য সবচেয়ে বেশি উত্তম হবে? [সূরা আল-কাহাফ : ৭]

অপর এক স্থানে আছে :

ٱلَّذِىْ خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط وَهُوَ ٱلْعَزِيْزُ ٱلْغَفُوْرُ ۔

অর্থাৎ যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমাদের পরীক্ষা করেন, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে বেশি উত্তম এবং তিনি শক্তিশালী ও ক্ষমাশীল।

[সূরা আল-মুলক : ২]

তিনি বলেছেন যে, পরকালের অনেক উত্তম ও স্থায়ী প্রকৃতির।

وَمَا ٱلْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلاَّ لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ ط وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ۔

অর্থাৎ এবং ইহকালের জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয় এবং যারা মুত্তাকী বা আল্লাহ্‌ভীরু তাদের জন্য নিশ্চয়ই পরকালের আবাসই উত্তম, (হায়! দুঃখ তোমাদের ওপর) তোমরা কি এ কথাও বোঝ না? [আল-আনআম : ৩২]

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ج وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ط اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ۔

অর্থাৎ এবং যা কিছু তোমাকে দেয়া হয়েছে তা কেবল (কিছু দিন) ইহকালের জীবন যাপনের জন্যই এবং এই স্থানের সৌন্দর্য ও শোভা (মাত্র) এবং যে (প্রতিদান ও পুরস্কার) আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তা বহু গুণে এর চেয়ে উত্তম এবং বহু দিন স্থায়ী থাকার। তোমরা কি (এই প্রভেদকে) বোঝ না? [আল কসাস - ৬০]

তিনি ঐ সমস্ত লোকের নিন্দা করেন যারা এই অস্থায়ী ক্রটিযুক্ত ও দোষে পরিপূর্ণ জগতকে চিরস্থায়ী, চিরন্তন, প্রশস্ত, প্রতিটি রকমের দুঃখ ও মলিনতা, রোগ ও ক্ষতি হতে এবং প্রতিটি সন্দেহ ও ভয় হতে মুক্ত, প্রতিটি বিপদ হতে নিরাপদ মনে করে এবং পরকালের ওপর প্রাধান্য দেয়।

কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا

بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ

অর্থাৎ যারা (মৃত্যুর পর) আমার সাক্ষাতে বিশ্বাস রাখে না, কেবল ইহকালের জীবনে মগ্ন রয়েছে আর এই অবস্থার ওপর শান্তিতে রয়েছে এবং যারা আমার প্রমাণাদি হতে অমনোযোগী তাদের শেষ ঠিকানা দোযখ হবে ঐ উপার্জনের কারণে যা (নিজ কর্মসমূহ দ্বারা) অর্জন করেছে। [সূরা ইউনুস : ৭-৮]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ النَّارُ ـ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ যারা জগতের জীবন এবং তার সৌন্দর্য ও শোভা চায় তা হলে তাদের চেষ্টা ও কার্যের ফলাফল এখানে পূর্ণভাবে দিয়ে দিই। এরূপ নয় যে, জগতে এর সঙ্গে ঘাটতি করা হবে। (কিন্তু স্মরণ রাখ) এরা ঐ সব লোক যাদের জন্য (পরকালের জীবনে) দোযখের আগুন ছাড়া অন্য কিছুই হবে না, যা কিছু তারা এখানে বানিয়েছে সমস্ত অকেজো হয়ে যাবে এবং যা করছে সমস্ত বাতিল ও রহিত হয়ে যাবে। [সূরা হুদ : ১৫-১৬]

وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ـ نِ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ط اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ـ

অর্থাৎ কঠিন শাস্তির ভীষণ বিপদ ঐ সমস্ত অস্বীকারকারীর জন্য যারা পরকালকে ছেড়ে ইহকালের জীবনকে পছন্দ করে নিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তা হতে মানুষকে বাধা দেয় এবং তারা চায় আল্লাহ্‌র পথকে বক্র করতে, ঐ সমস্ত লোকই ভীষণ পথভ্রষ্টতার মধ্যে আছে। [সূরা ইবরাহীম : ২-৩]

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ এ সমস্ত লোক কেবল পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত এবং তারা পরকাল হতে অনবহিত। [সূরা রুম :৭]

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلاَّ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ـ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ـ

অর্থাৎ অতএব, যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চল এবং সে তো কেবল ইহকালের জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই। তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন, কে তাঁর রাস্তা হতে বিচ্যুত এবং তিনি এও ভাল জানেন যে, কে সৎ পথে আছে। [সূরা আন-নাজম ২৯-৩০]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمًا ثَقِيْلاً ـ

অর্থাৎ এ সমস্ত লোক দুনিয়ার সাথে প্রেম রাখে এবং এরা পরবর্তী কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে চলে। [সূরা দাহর : ২৭]

অন্য এক জায়গায় পাওয়া যায় :

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ـ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (সত্যের সাথে) বিদ্রোহ করবে এবং (পরকালের অস্বীকৃতির সাথে) ইহকালের জীবনকে প্রাধান্য দেবে দোযখ (তার) ঠিকানা হবে।

[সূরা নাযিয়াত : ৩৭-৩৮-৩৯]

তিনি ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করেন যে ব্যক্তি পরকালকে প্রাধান্য দেয় এবং তাকে সম্মুখে রেখে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সফল জীবন যাপন করে। তিনি বলেন :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! দুনিয়াতেও আমাকে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাকে আগুনের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে রাখ।

[সূরা বাকারা : ২৫১]

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ভাষায় বর্ণিত হচ্ছে :

وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۔

অর্থাৎ এবং হে আল্লাহ্! এই পার্থিব জীবনে ও পরকালে আমাদের জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করে দাও এবং আমরা তোমার নিকট ফিরে এসেছি।

[সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৬]

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের প্রশংসা করে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔

অর্থাৎ তাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিয়েছি এবং নিঃসন্দেহে পরকালে তার স্থান ভাল লোকদের মধ্যে হবে। [সূরা নাহল : ১২২]

এই দুনিয়া সম্পর্কে একজন মুসলমানের ধারণা ও চিন্তাধারা খুবই সফলতার সাথে সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করছে একটি প্রজ্ঞাযুক্ত বাণী যা জুমআর কোন খুতবার একটি অংশ :

اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَاِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْاٰخِرَةِ ۔

অর্থাৎ দুনিয়াকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমরা পরকালের জন্য সৃষ্ট হয়েছ।

মুসলমান দুনিয়ার আসবাব ও অছিলা দ্বারা এভাবে উপকৃত হয় যেমন ঐ বস্তুটি তার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, বরং তারই জন্য এর অস্তিত্ব,আর একজন মুসলমান পরকালের জন্য এভাবে চেষ্টা করে যেমন মুসলমানকে তারই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মুসলমান দুনিয়া, তার আসবাব ও অছিলাকে সওয়ারী মনে করে, আরোহী মনে করে না। দাস ও অধীনস্থ মনে করে, মালিক ও মুনিব মনে করে না।

উপায় ও অছিলা মনে করে, উদ্দেশ্য ও পরিণাম মনে করে না। পরকালকে তারা তাদের ভ্রমণের গন্তব্য স্থান মনে করে, যেখানে তাদের পৌঁছতেই হবে এবং এমন বাসস্থান মনে করে যেখানে তাদের আশ্রয় নিতেই হবে। অতএব, তারা এর জন্যই সমস্ত কিছু সঞ্চয় করে, সর্ব প্রকারের কষ্ট স্বীকার করে, দৃঢ় সংকল্প ও উদ্দীপনার সঙ্গে নিজেদের অছিলাসমূহকে কাজে লাগাতে থাকে এবং তা নবুয়তের ঐ উদাহরণ যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

مَالِى وَلِلدُّنْيَا، اِنَّمَا اَنَا كَرَاكِبٍ ن اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

অর্থাৎ আমার ও দুনিয়ার সম্পর্ক কেবল এতটুকু যে, আমার দৃষ্টান্ত ঐ আরোহীর মত যে অল্পক্ষণের জন্য এক বৃক্ষের নিচে ছায়ার জন্য বসে গিয়েছে, আবার তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।[১] (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)।

দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে কুরআন পাকের বর্ণনার এই পদ্ধতি ও দৃষ্টান্ত প্রতিভাত হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-র জীবন, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষায়, তাঁর কথাবার্তায়, তাঁর আবেগ-উদ্যমে, তাঁর দোয়াসমূহে, তাঁর নির্জনতায় ও সমাবেশে। ঐ সমস্ত পবিত্র মানুষের (সাহাবী) জীবনেও তাঁর একই নকশা প্রতিফলিত হয়েছে, তাঁরা পয়গাম্বর ﷺ-এর দয়ার সুশীতল ছায়ায় শিক্ষা পেয়েছে এবং তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের গঠন হয়েছে। অনুরূপভাবে তাঁর শিক্ষার মাধমে তাবেয়ীদের জীবন ও অন্যান্য ঈমানদার ও বিশ্বাসিগণের জীবন গড়ে উঠেছে। তাঁরা সকলেই ঐ এক পথে চলেছেন এবং তাঁর উপদেশ মোতাবেক কর্মজীবন পরিচালিত করেছেন।

এটা তাঁদের স্বভাব ও প্রকৃতি হয়ে গিয়েছিল এবং তা এক ঐতিহাসিক সত্য যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা সেই কেন্দ্রবিন্দু বা বিষয় যেখানে আসমানী ধর্ম ও নবীগণের শিক্ষা অথবা (যদি এই বর্ণনা ঠিক হয়) নবুওতী মাদ্রাসার সঙ্গে বস্তুবাদ ও বস্তুবাদী চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। যে বস্তুবাদের বক্তব্য হলো, এই জগতেই সব কিছু, এটাই মানবের শেষ মনযিল। অতএব, তারা এর প্রশংসা করে, গুণ গায় এবং তার প্রেম ও ভালবাসায় মত্ত থাকে এবং আরও আরামদায়ক, আরও চমৎকার, আরও রুচিসম্মত করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা ও সাধনায় জীবন অতিবাহিত করে।

---

১. মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী।

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধবিরোধী সভ্যতা

এটা মানবতার এক বড় দুর্ভাগ্য এবং ইতিহাসের বড় বেদনাদায়ক ব্যাপার ছিল যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা এমন এক সময় এমন এক সম্প্রদায়েরর নিকট এসে উপস্থিত হয়, যখন সে সম্প্রদায় অদৃশ্যের ঈমান বা বিশ্বাসের মত ধর্মের ভিত্তির সঙ্গে বিদ্রোহী হয়েছিল। ধর্মের ঐ সমস্ত নামেমাত্র সমর্থকদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিল এবং তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী ছিল, যারা ধর্মকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করত এবং নিজেদের হীন অভিলাষ চরিতার্থ করার উপকরণ বানিয়ে রেখেছিল। তাদের কুকর্ম, তাদের বর্বরতা, অজ্ঞতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির রাস্তায় বাধা সৃষ্টির চেষ্টার দরুন তারা ঐ সমস্ত লোকের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিল। ফলে সভ্যতা, শিল্প ও তীব্র বস্তুবাদী প্রবণতা একই সঙ্গে বর্ধিত হতে লাগল।

এ দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য ছিল জীবনের অবকাঠামো খাঁটি বস্তুবাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হোক যাতে মানবতা ও মানব সংস্কৃতির সাথে স্রষ্টা ও পালনকর্তার সঙ্গে কোন সম্পর্কই না থাকে। এগুলো ঐ সকল কারণ ও ইউরোপের বিশেষ অবস্থার ফল ছিল, যে অবস্থায় এই সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছে। তারা বস্তুজগত ও পার্থিব শক্তিসমূহের ওপর ক্ষমতা লাভ করেছিল এবং বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যায় তারা বহু অগ্রসর হয়েছিল, এমন কি শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য দূরত্ব ও ব্যবধান প্রায় খতম হয়ে গিয়েছে। তারা এমন যোগ্যতা অর্জন করেছে যে, আকাশমণ্ডল পরিভ্রমণ করতে পারে, মহাশূন্যে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করতে পারে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভূমণ্ডলের চতুষ্পার্শে ঘুরতে পারে। তারা এমন সব সফলতা অর্জন করেছে যা পূর্ববর্তী প্রজন্ম স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেনি।

মুসলিম প্রাচ্যের আধুনিকতাপ্রিয় নেতাদের ওপর জড়বাদের প্রভাব

এই জড়বাদী প্রবণতা ও ধর্মবিরোধী অভিলাষ মুসলিম প্রাচ্যের আধুনিকতাবাদ, বরং বেশি শুদ্ধ বর্ণনায় পাশ্চাত্যবাদী নেতাদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে।

কামাল হতে জামাল[১] পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহের সকল নেতা জড়তার প্রেমে[২] একই প্রকারে বিহ্বল দেখা যাচ্ছে। তারাও শক্তি ও উন্নতিকে একমাত্র উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, যার উপাসনা অবশ্য কর্তব্য এবং যা ছাড়া কোন সত্তার অস্তিত্ব

---

১. কামাল আতাতুর্ক।

২. জামাল আবদুন নাসের।

নেই, যার বেদীমূলে সমস্ত চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, সম্মান ও প্রতিটি জাগতিক উপকারহীন সকল বস্তুকে উৎসর্গ করে দেয়া উচিত।

এর প্রমাণের জন্য ঐ সমস্ত জাতীয় ও রাজনৈতিক নেতার ভাষাণসমূহ, তাদের রচনাসমূহ, তাদের বাণী ও আদেশাবলী, তাদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও পদক্ষেপসমূহ এবং তাদের ঐ সমস্ত কার্যকলাপ যথেষ্ট, যা তারা ঐ সমস্ত দলের সাথে করে থাকে যে সমস্ত দল ঐ সকল কর্মের সমালোচনা করতে সচেষ্ট। যে ব্যক্তি ঐ সকল সরকারের অভিপ্রায়, পরিকল্পনা ও কর্মতৎপরতা সততার সাথে পরীক্ষা করবে, সে অনুভব করবে যে, তাদের সম্মুখে দেশের কেবল পার্থিব উন্নতি ও সচ্ছলতাই রয়েছে যাতে জীবনের মান উচ্চ করা যায় এবং ঐ সমস্ত জাতির ভ্রাতৃসংঘের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় যারা জড় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ছাড়া অন্য কোন কিছুর জ্ঞান রাখে না। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাই তাদের উপাস্য। জাগতিক উন্নতি ও দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি ছাড়া তাদের কোন উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা নেই। তারা কেবল মানুষের ঐ মৈত্রী বন্ধনে বিশ্বাস করে যা কোন জাতির সঙ্গে রাজনৈতিক চুক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং এই ধরনের বন্ধনই তাদের নিকট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

এই মনোভাব, স্বভাব ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা প্রতিটি যুগে জগতকে বিপদে ফেলেছে। ধর্মসমূহ এই সংকীর্ণ ও রোগগ্রস্ত মনোভাবের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। ইসলামও এ মনোভাবকে অপসারিত করার চেষ্টায় ছিল ও আছে। কোন মুসলিম দেশের নেতার এ ধরনের মনোভাব পোষণ করা এবং চিন্তার এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করা তার হীনমন্যতা ও অধঃপতনের লক্ষণ। কারণ তা ঈমানের দুর্বলতা, প্রশিক্ষণের ত্রুটি ও দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার পরিচায়ক এবং এটা তার নিজের জন্য ও সমস্ত জগতের জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও এই জগতে এই উম্মতের পদ ও মর্যাদার হেফাজতের অর্থ এবং ইসলামের বার্তা ও দাওয়াতের অনুভূতি পরকালের জীবন, জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকের ওপর বারবার তাকীদ দেয়া এমন পৃথককারী সীমানা (Line of demarcation) যা ঐ দু' সভ্যতাকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন করে দেয়। এক. ঐ সভ্যতা যার উৎস ইসলাম এবং তার দায়িত্বও ইসলাম গ্রহণ করেছে। এতে ইসলামী বৈশিষ্ট্যের আত্মদৃষ্টি ও আত্মপরিচয় দেখা যায়। দুই. ঐ সভ্যতা যা হতে ইসলাম সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করেছে। এতে মুসলমানদের শুধু ক্ষতিই ক্ষতি এবং

এতে মানসিক দাসত্ব ও পরাজিত হওয়ার ভাব প্রকাশিত হয়। বাঁদরের মত অনুকরণ করার (abirg) আগ্রহ ও তোতা পাখির ন্যায় প্রতিটি শ্রাব্য বস্তুর পুনরাবৃত্তি করার পদ্ধতি তা হতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

মেধা ও ইচ্ছা শক্তির পরীক্ষা

সভ্যতার কাঠামো তৈরি ও সংস্কৃতির আকৃতি অঙ্কন করা দ্বারা, মানবিক মেধার বিকাশ, জাতিগত প্রতিভা (Genius), ইচ্ছাশক্তি, উচ্চ সাহস ও ধর্মের সঠিক বোধের পরীক্ষা করা হয়, তা কেবল অনুকরণ ও সমালোচনা অথবা সংশোধন ও সংযোজনের কর্ম নয়। ইসলাম (হালাল ও হারাম) বৈধ ও অবৈধের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ঐ সীমা অতিক্রম করা অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে পবিত্র ও ন্যায্য পদ্ধতির জীবন দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিস্তর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। শর্ত এই যে, এতে যেন অপব্যয় ও কৃপণতা করা না হয়। অপরের দাবি ও অধিকার নষ্ট না হয়, পাপে লিপ্ত ও অপব্যয়ের মধ্যে পতিত না হয়। অর্থাৎ জীবনের ঐ নীতি না হওয়া চাই যা পুরুষোচিত গুণাবলী ও ভদ্র স্বভাবের বিপরীত। যেন এই স্পিরিট পোশাক, খাদ্য, গৃহ, গৃহের পরিবেশ ও জীবনের ভোগ-উপভোগ প্রতিটি শাখায়ই প্রচলিত থাকে।

ইসলাম কল্যাণকর কাজের প্রতি দৃষ্টি প্রদান এবং ক্ষতি ও অনিষ্ট হতে বেঁচে থাকার তাকীদ দিয়েছে। বস্তুগত অপরিহার্য শক্তি সাধ্যমত অর্জন করার এবং উপকারী ও লাভজনক জ্ঞানসমূহ দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু শর্ত এই যে, এটা তার মূল বৈশিষ্ট্যকে দুর্বল ও ইসলামী জাতীয়তাকে ঘায়েল না করে। তা যেন জাতির মধ্যে হীনমন্যতার অনুভূতি, বিশ্বাসহীনতা ও অপরের উদ্দেশ্যবিহীন ও আবেগজনিত নীতির অন্ধ অনুকরণ করা, তাদের রঙে রঙ্গিন হওয়া এবং তাদের জীবন পদ্ধতিকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখার অভিপ্রায় ও অভিলাষ সৃষ্টি না করে, এ ব্যাপারে তাকীদ করেছে।

ইস্পাতসম দৃঢ়তা ও রেশমতুল্য কোমলতা

এটা এই সভ্যতার মূল, যার একদিকে ইস্পাতের মত দৃঢ়তা, অন্যদিকে রেশমের মত কোমলতা রয়েছে। এ সভ্যতার মাঝে বাস্তবতা, নতুন বিষয়সমূহ ও সময়ের নতুন চাহিদার ব্যাপারে (অতিশয়োক্তি, নিছক ধারণা ও কল্পনা ছাড়াই) রেশমের মত কোমলতা রয়েছে। অন্য দিকে আকীদা (বিশ্বাস) ও চারিত্রিক সীমারেখার ক্ষেত্রে তা ইস্পাতের চেয়ে বেশি দৃঢ় ও পর্বতের মত অটল। তারা

পার্থিব জ্ঞানসম্পদের ক্ষেত্রে যতই দূর-দূরান্তে ও শহর-বন্দরের হোক না কেন, তাদের আত্মমর্যাদাশীল বলে বিবেচিত হয়। তারা জ্ঞানের চক্ষু (গ্রহণ করার জন্য) খুলে রাখে এবং অন্তরকে প্রশস্ত করে রাখে। ঐ সমস্ত সংগঠন ও পরিকল্পনাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে যা ধর্মকে ঘায়েল করে না এবং তার নৈতিক নীতির মধ্যেও কোন পরিবর্তন আনে না।

পাশ্চাত্য হতে উপকৃত হওয়ার প্রকৃত ক্ষেত্র ও তার সীমা

এখানে মুহাম্মদ আসাদ সাহেবের পুস্তক (Road to Mecca)-এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করা যাচ্ছে, যেখানে খেয়ালের ভারসাম্যতা, কল্পনার ও দৃষ্টির সুষ্ঠু ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাতে তিনি খুব সুন্দরভাবে ঐ রাজপথকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, যে রাজপথে মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্য হতে উপকৃত হওয়া এবং আধুনিক উপায়-উপকরণ দ্বারা কাজ নেবার ক্ষেত্রে বিচরণ করা প্রয়োজন মনে করে। তিনি বলছেন :

ইসলামী বিশ্ব ও ইউরোপ কখনও একে অপরের এত নিকটবর্তী হয়নি যতটা বর্তমানে হয়েছে এবং এই নৈকট্য প্রকাশ্য ও গোপন দ্বন্দ্বের কারণে হয়েছে, যা বর্তমানে উভয়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এর কারণ এই যে, মুসলমানদের এক বড় জনগোষ্ঠীর (পুরুষ ও মহিলা) আত্মা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে খুবই জড়সড় ও সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের অতীত অনুভূতি হতে দূরে সরে পড়েছে। জীবনোপকরণে তাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নই হল মানবআত্মার অনুভূতি সংশোধনের কেবল একটি উপায় মাত্র। ফলে তারা ঐ উন্নতির প্রতিমার উপাসনার শিকার হয়ে যাচ্ছে। আর এ কারণে ইউরোপ ধ্বংস ও উজাড় হয়ে যাচ্ছে। তারা ধর্মকে ঘটনা ও দুর্ঘটনাসমূহের পেছনে একটি অর্থহীন ধ্বনি বোঝাতে আরম্ভ করেছে। এ কারণেই তারা শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান হওয়ার পরিবর্তে নীচে ও অধঃপতনে যাচ্ছে।

আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মুসলমান পাশ্চাত্য হতে কোন উপকার গ্রহণ করতে পারবে না, বিশেষ করে শিল্প ও কারিগরি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য হতে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কারণ জ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা ও রীতিনীতি গ্রহণ করা প্রকৃতপক্ষে অনুসরণ করা নয়, বিশেষ করে এই উম্মতের জন্য। কারণ তাদের নবী করীম (সা) তাদেরকে প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে জ্ঞান অর্জন

করার আদেশ দিয়েছেন। জ্ঞান পাশ্চাত্যেরও নয়, প্রাচ্যেরও নয়। জ্ঞানের প্রকাশনা ও অনুসন্ধান এমন এক মালার পুঁথি, যার কোন শেষ প্রান্ত নেই এবং যাতে সমস্ত মানব জাতি সমানে সমান অংশীদার। প্রত্যেক জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক এই আদর্শের ওপর নিজ নিজ অনুসন্ধানের ভিত্তি রাখে, যা তাদের পূর্বসূরিগণ স্থাপন করেছেন। তারা তাদের জাতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে অথবা অন্য কোন জাতির সাথে, এভাবে এক মানুষ হতে অপর মানুষ, এক বংশ হয়ে অপর বংশ, এক সভ্যতা হতে অপর সভ্যতা পর্যন্ত এটা কোন বিষয় নয়, বরং গঠন, সংশোধন ও উন্নতির কাজ বরাবর জারি আছে ও থাকবে। এ কারণে বিশেষ যুগে বিশেষ সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতির বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে না যে, এটা কেবল ঐ যুগ বা ঐ সমাজ ও সভ্যতার সাথে নির্দিষ্ট ও সম্পৃক্ত। হতে পারে কোন এক যুগে কোন এক জাতি অধিক সাহসী ও উদ্যোগী ছিল, জ্ঞানের মাঠে আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করেছে, তদ্রূপ ভবিষ্যতেও হয়ত আর এক জাতির হাতে এই চক্র আরও জোরে ঘুরবে।

অবস্থা যা-ই হোক, এই কাজে সকলে তুল্য-মূল্য-অংশীদার, যুগে যুগে এমন আবর্তন এসেছিল। যেমন নিকট অতীতে মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি হতে অধিক জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। তারা ইউরোপকে অনেক বিপ্লবী প্রকারের শিল্প ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পদ্ধতি দান করেছেন। এর চেয়ে অধিক এই যে, তারা ইউরোপকে বৈজ্ঞানিক কার্য পন্থার মূল ও ভিত্তি শিক্ষা দিয়েছেন যা আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাবির ইবন হায়্যানের রসায়ন বিজ্ঞানকে 'আরব' বলা হয় না, অনুরূপভাবে বীজগণিত ও জ্যামিতির জ্ঞানকে ইসলামী জ্ঞান বলা হয় না, অথচ প্রথমোক্ত বিষয়ের আবিষ্কারক খওয়ারাযমী ও শেষোক্ত বিষয়ের আবিষ্কারক বত্তানী ছিলেন এবং উভয়ই মুসলমান। মহাকর্ষ-এর মতবাদের আবিষ্কারক ইংরেজ হলেও একে ইংরেজী নামে অভিহিত করা হয় না। এই সমস্ত বড় বড় জ্ঞান-বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট মতবাদ মানব জাতির সাধারণ মৌরুসী সম্পত্তি।

এভাবে যদি মুসলমান তাদের অবশ্য কর্তব্য হিসেবে শিল্প জ্ঞান, কারিগরি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নতুন প্রণালীকে নিজস্ব করে তাহলে তা কেবল অগ্রগতি ও উন্নতির স্বভাবজাত অভিলাষ ও উদ্যোগের কারণেই করে। অপরের অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিষয়টি মানুষের স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষা ও আবেগপ্রসূত। কিন্তু যদি তারা

(তাদের অপ্রয়োজনীয়) পাশ্চাত্য জীবনের আচার-আচরণ, ব্যবহার-বিধি, রীতিনীতি (Manners) ও সামাজিক চিন্তাধারাকে নিজস্ব করে নেয়, তাহলে এ দ্বারা তাদের কিঞ্চিৎ লাভও হবে না। কারণ ইউরোপ তাদেরকে এই ক্ষেত্রে যা দিতে পারবে তা মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম ও সভ্যতা যা দিয়েছে তার চেয়ে উত্তম হবে না।

যদি মুসলমান কিছুটা সৎসাহসী হয়, দৃঢ় মনোবলের সাথে কাজ করে এবং একটি উপায় ও অছিলা হিসেবে উন্নতির পথ ধরে, তা হলে তারা এভাবে কেবল নিজের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার হেফাজত করবে না, বরং সম্ভবত ইউরোপের অধিবাসীকে জীবনের হারানো আনন্দের রহস্য ও শিক্ষা দিতে পারবে।[১]

---

১. Road to Mecca, p.347.349 অনুবাদ-তুফান সে সাহিলতক, পৃ. ১৮৭-১৮৯।

মুসলিম বিশ্বে ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টির গুরুত্ব

সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল মানুষের মন-মানসিকতা যা জাতির উদ্দীপনা ও অনুভূতির গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। কোন জাতিকে তার বিশেষ সভ্যতা ও কৃষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া মানে তার জীবন-যুদ্ধ হতে তাকে সরিয়ে দেয়া। কারণ ধর্ম ও শরীয়তের ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছে যারা তাদের সভ্যতা, কৃষ্টি ও বিশেষ দীনী পরিবেশে ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে তাদের কাজকর্ম, আকীদা ও ইবাদত এবং দীনী রুসুম ও রেওয়াজের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাদের বর্তমান, তাদের অতীত কাল হতে ছিন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থার প্রভাব জাতি ও সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে তারা তাদের মূল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপর এক সামাজিকতার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কারণ এক ভিন্ন সভ্যতাকে তারা নিজস্ব করে নিয়েছে এবং এভাবে অতি সহজে ক্রমশ নিজ মৌলিক আকীদা ও জীবন প্রণালী হতেও তারা পৃথক হয়ে যায় যা তারা এতদিন অতি শক্তভাবে দাঁতে কামড়িয়ে ধরে রেখেছিল।

ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও মুসলিম সামাজিকতার অস্তিত্বের জন্য পাশ্চাত্য সামাজিকতা বিপজ্জনক। এর অর্থ এই নয় যে, জীবনের সহজসাধ্য বস্তুসমূহ দ্বারা উপকৃত হওয়া। পাশ্চাত্যের অর্জিত বিজ্ঞান ও কারিগরি, আবিষ্কারসমূহ ও আরাম-আয়েশের উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং সেই দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ। ইসলাম সর্বদা প্রশস্ত মনোভাবের অধিকারী এবং ভাল ও উপকারী বস্তু দ্বারা লাভবান হওয়া সম্পর্কে তার মন উদার ও চক্ষু উন্মুক্ত। কিন্তু এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য সামাজিকতা গ্রহণ করার অর্থ আরও ব্যপক। এর অর্থ যন্ত্রসমূহ, আবিষ্কারসমূহ ও জীবনের উপকারী অভিজ্ঞতাসসমূহ দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেয়েও অধিক ব্যাপক ও বিস্তৃত। চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, বুদ্ধিমত্তা ও উদ্দেশ্যও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি অবস্থিত। এর আসল অর্থ, পূর্ণ জীবনকে পাশ্চাত্য ফ্যাশন ও পাশ্চাত্য সামাজিক পরিকল্পনার অধীন করা এবং সেই জীবন পদ্ধতিকে নিজেদের করে নেয়া, যা ইসলামী মান, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সংযতচিত্ততা ও মধ্যপন্থার স্পিরিটের সঙ্গে অপরিচিত এবং শরীয়তের রীতিনীতি ও পয়গম্বর ﷺ-র সুন্নতের পালন করার পথে বাধা সৃষ্টিকারী। ঐ ইসলামী জীবন হতে দূরে অপসারণকারী যার আদর্শ রসূলে পাক ﷺ -এর সাহাবীগণ (রা) ও তাঁদের অনুসরণকারিগণ (তাবেয়ীন) জগতের সম্মুখে করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা উম্মতের

ওপর এক অপরিচিত রং চড়িয়ে দেয়। আর তখন তারা কেবল তাদের নাম অথবা ধর্মীয় ও জাতীয় পোশাক দ্বারা যা কোন কোন আরব ও মুসলিম জাতি এখনও ব্যবহার করে অথবা মসজিদসমূহে উচ্চৈঃস্বরে আযান দ্বারা অথবা বিভিন্ন দেশে কম বেশি সংখ্যায় মসজিদে গমনকারী মুসল্লিদের দ্বারা চেনা যায় যেন তারা ইসলামের রেওয়াজের একটি সরু সুতা যা দ্বারা কোন রকমে আটকা আছে আল্লাহ্ না করুন, যদি তা ছিঁড়ে যায় তাহলে সমস্ত কিছুই বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, একই সময় বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক সামগ্রীসমূহ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি, আবিষ্কৃত কলাকৌশল ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির বহু উপায়-উপকরণ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী সভ্যতার সৌন্দর্য, সরলতা, প্রকৃতিপ্রিয়তা, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও নৈতিক নীতিসমূহ, সামাজিক শিক্ষাসমূহ কার্যরত ও বহাল থাকা সম্ভব। কিন্তু এটা ঐ সময় সম্ভব হবে যখন ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজসমূহের স্বাধীনভাবে ইজতেহাদী চিন্তা, দৃষ্টি ও সাহসিকতাপূর্ণ পরিকল্পনাসমূহ কার্যকর করার সামর্থ্য রাখবে, যখন তাদের মধ্যে ঈমানী বিচক্ষণতা সত্যনিষ্ঠভাবে থাকবে এবং ইসলামী শিক্ষা, সভ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠত্বের উপর বিশ্বাস থাকবে।

এ পরিকল্পনা প্রণয়ন এতই দৃষ্টি আকর্ষণকারী, হৃদয়গ্রাহী,মর্যাদা ও সম্মানের যোগ্য হবে যে,তাদের জন্য এই মুসলিম দেশসমূহের দিকে বহির্বিশ্বের চিন্তাবিদ ও জ্ঞানীগণ এত বেশি যাতায়াত করবেন যেমন বর্তমানে আনন্দ উৎসবে লোকজন গমন করে। ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টির সৌন্দর্য বহু পাশ্চাত্য দেশকে কমপক্ষে এ বিষয় গাম্ভীর্যের ও গুরুত্বের সাথে চিন্তা করতে এবং ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করবে। যেভাবে স্পেনে অতীতে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে যার গভীর প্রভাব পাশ্চাত্য সভ্যতা, সাহিত্য ও দর্শনে পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, প্রাচ্য, পাশ্চাত্যের ও আরব ও অনারবের কোন মুসলিম দেশের এখন পর্যন্ত এর সামর্থ্য হয়নি এবং সাহসও হয়নি যে, তাদের কোন একটি দেশে অন্তত পরীক্ষামূলকভাবে ইসলামকে উপরোক্ত ধারায় প্রতিষ্ঠিত করে তার ফলাফল যাচাই করে দেখার। এই সমস্ত দেশ পাশ্চাত্য সভ্যতা-কৃষ্টির এক অসম্পূর্ণ ও ভুল সংস্করণ। সুতরাং তারা পাশ্চাত্যের শুষ্ক ও রুক্ষ ছবি বনে রয়েছে। ফলে এই সকল দেশে পাশ্চাত্য নাগরিকদের জন্য কোন

আকর্ষণ নেই। যখন তারা কখনও এই সমস্ত দেশে প্রমোদ ভ্রমণে আসে তখন তারা এটাই বলে যে, "بضاعتنا ردت إلينا" (অর্থাৎ এটা আমাদেরই বস্তু যা আমরা এখানে পাচ্ছি)।

সভ্যতার কর্ম পদ্ধতি কি? তা পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, সৃষ্টি করার যোগ্যতা, ইজতেহাদনির্ভীকতা ও দৃঢ় সংকল্পের নাম। এটা নকল করা ও অনুসরণ করা এবং আংশিক সংশোধন করার নাম নয়। ইসলাম হালাল ও হারামের (বৈধ-অবৈধ) সীমা নির্ধারণ করে তাকে লঙ্ঘন করা বা অতিক্রম করা নিষেধ করে দিয়েছে। ইসলাম পরিচ্ছন্ন, অথচ অনিষ্টকারী নয়, এমন আমোদ-প্রমোদের জন্য (যা অপব্যয়, অধিকার অনিষ্টকারী, অশ্লীলতা ও পাপ হতে মুক্ত) সুযোগ দিয়েছে। ইসলাম ঐ জীবনকে পছন্দ করে না যা সম্মানিত ও সাহসী লোকদের উপযোগী নয় এবং এ স্পিরিটই পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাদ্য-খাবার, মেলামেশা, লেন-দেন, আমোদ ও আনন্দ উপভোগ করার ব্যাপারে ইসলামী আদেশাবলী কার্যকর রয়েছে।

জনকল্যাণমূলক কাজে আগ্রহ, ক্ষতি ও অনিষ্ট হতে পরহেয, সামরিক ও প্রতিরক্ষা শক্তি অর্জন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাল ও উপকারী দিক গ্রহণের কেবল অনুমতি দেয়নি, বরং এ সব বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর জন্য শর্ত এই যে, এ সমস্ত জিনিস যেন ইসলামী জাতীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের কুরবানী দিয়ে অর্জন করা না হয় এবং তা দ্বারা জাতির মধ্যে নীচতা-হীনতার অনুভূতি, বিশ্বাসহীনতা, ত্বরিত ও হালকা অনুকরণ, অপরের রীতিনীতি অনুসরণের এবং অপরের জীবনের প্রতি প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি না হয়।

এগুলো ইসলামী সভ্যতার মূলত ভিত্তি যাতে রেশমের কোমলতাও আছে এবং ইস্পাতের কঠোরতা রয়েছে, বৈধ চাহিদাসমূহ সম্পূর্ণ করা এবং উৎস ও মূলসমূহ মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে কোমলতা, যা কল্পনা ও অতিশয়োক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

কঠোরতা হলো আকীদা ও নৈতিকতার সীমায় মজবুত ও শক্ত থাকার ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামী সভ্যতা খোলা মনোভাব ও প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী, তা ঐ সমস্ত উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানব অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হতে, দেশের কোন অঞ্চলে অথবা ইতিহাসের কোন যুগে, নিষেধ করে না, বরং এ সম্পর্কে তার হৃদয় বহু প্রশস্ত ও বড় উদার। কিন্তু শর্ত হলো এতে আগত কোন বস্তু ইসলামের মৌলিক রীতিনীতি ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং ধর্ম ও চরিত্রের জন্য ক্ষতিকর হবে না।

মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম শূন্যতা

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম শূন্যতা হলো, এক মহানুভব মহান নেতা ও উৎসাহী ব্যক্তির যিনি সাহস, বিশ্বাস, সততা ও নিশ্চয়তার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখীন হবেন। এই আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন কাঠামো, বিভিন্ন চিন্তা ও রাস্তার মধ্যে একটি নতুন সড়ক সৃষ্টি করবেন, সেই সড়ক অনুসরণ, অতিশয়োক্তি ও সীমালঙ্ঘনজনিত দোষ হতে মুক্ত হবে যিনি বাহ্যিক আকৃতি প্রিয় প্রদর্শনী ও হালকা দৃষ্টিভঙ্গি হতে উর্ধ্বে হবেন। সত্য, যোগ্য উপকরণ, শক্তি ও সার নিখাদ বস্তুর দিকে মনোযোগ দেবেন এবং বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতি আমল দেবেন না।

মুসলিম বিশ্বের মরদে কামিল

মুসলিম বিশ্বের জন্য একজন মরদে কামিল (পূর্ণ মানব) প্রয়োজন। তিনি অতুলনীয় প্রতিভাবান (Genius) এবং দেশ ও জাতির জন্য এমন এক রাজপথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবেন যে পথে একদিকে এমন ঈমান বিরাজ করবে যা কেবল পয়গম্বরী আলোকে আলোকিত এবং এমন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকবে যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ(ﷺ)র মাধ্যমে এই উম্মতকে দান করেছেন। অপর দিকে তার কাছে এমন জ্ঞান হবে যা কোন বিশেষ দেশ অথবা জাতি বা সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। তিনি ধর্ম হতে ভাল সংকল্প ও ভাল উদ্যোগ গ্রহণ করবেন যা মানবতার খেদমত ও সভ্যতা গঠনের জন্য সর্বোচ্চ সম্পদ হবে। তিনি সঠিক ও ভাল উদ্দেশে নির্ধারণ করবেন যা কেবল আসমানী দীন ও সঠিক ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এর সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্ট উপকরণ উপাদান ও যন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করবেন যা পাশ্চাত্য দীর্ঘ কালের অধ্যয়ন, গবেষণা ও শ্রমের মাধ্যমে অর্জন করেছে। কিন্তু ঈমান ও ভাল উদ্দেশ্যের অভাবে ঐ সমস্ত বস্তু হতে সঠিক উপকার লাভ করতে পারেনি, বরং একে মানবতা হত্যা ও সভ্যতার ধ্বংস অথবা অন্য কোন হীন উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

এই উচ্চ মস্তিষ্কসম্পন্ন সাহসী পুরুষ, যিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা, তার সমস্ত মতবাদ, আবিষ্কার ও শক্তি-সামর্থ্য এমনভাবে ব্যবহার করবেন যেন সেগুলো কাঁচামাল (Raw materials) ও তা দ্বারা এক নতুন শক্তিশালী সভ্যতার সৌধ গঠন করবেন, যা একদিকে ঈমান, চরিত্র, আল্লাহভীতি, দয়ার্দ্রচিত্ততাও ও সুবিচারের ওপর স্থাপিত হবে।

অপরদিকে সেই সৌধে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, আবিষ্কারের শক্তি ও চিন্তার নতুনত্ব প্রকাশ পাবে। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এই দৃষ্টিতে দেখবেন না যে, তা পরিপূর্ণতা ও উন্নতির শেষ মঞ্জিল অতিক্রম করেছে এবং এর ওপর শেষ সীল মোহর লেগে গেছে। ফলে তাতে আর কোন সংশোধন ও সংযোজনের স্থান নেই এবং তা যেভাবে আছে সেভাবে তার সমস্ত দোষ-ত্রুটিসহ গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই, বরং তিনি এর সামগ্রিক কাঠামোকে ভিন্ন ভিন্ন অংশ হিসেবে বিবেচনা করে তা হতে যে অংশ বাদ দেবার ইচ্ছা হয় বাদ দেবেন এবং যে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা হয় তা গ্রহণ করবেন।

অতঃপর এ দ্বারা জীবনের এমন এক কাঠামো তৈরি করবেন যা তার উদ্দেশ্যাবলী, তার আকীদা, তার নৈতিক মৌল বিষয়ষমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। ইসলাম তাকে জীবনের যে পদ্ধতি, দুনিয়া সম্বন্ধে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, মানব জাতির সাথে কার্যকলাপের জন্য যে বিশেষ আদেশবাণী ও পরকালের জন্য অবিরাম চেষ্টা ও অধ্যবসা এবং জিহাদের আবেগ উদ্যম দান করেছে এর ওপর তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। ফলে তা দ্বারা ঐ জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে যে জীবন সম্পর্কে কুরআন পাক সাক্ষ্য দিয়েছে :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে, সে পুরুষ বা মহিলা হোক এবং সে ঈমানও রাখে, তা হলে তাকে আমি ইহকালেও তার জীবন ভালভাবে অতিবাহিত করাবো এবং তাকে পরকালেও তার উৎকৃষ্ট কর্মের প্রতিদান নিশ্চয়তা দেব।

[সূরা আন নাহাল : ৯]

সে জীবন পদ্ধতি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-র প্রতি ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই আকীদার ওপরও প্রতিষ্ঠিত হবে যে, তিনি মানবতার জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ, চিরস্থায়ী পরিচালক ও নেতা এবং কেয়ামত পর্যন্ত অনুকরণীয় নমুনা এবং প্রিয় নবী ﷺ হলেন প্রিয় নেতা। তাঁর আনীত শরীয়ত জীবনের নীতি, আইন তৈরির ভিত্তি ও একমাত্র জীবন পদ্ধতি, যা দ্বারা ইহকাল-পরকালের সফলতা অর্জন করা যায় এবং এ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার নিকট অপর কোন জীবন পদ্ধতি গ্রহণীয় নয়।

সেই উচ্চ মেধাসম্পন্ন সাহসী ব্যক্তি যিনি পাশ্চাত্য হতে এমন জ্ঞান অর্জন করেন যা তার জাতি ও দেশের জন্য প্রয়োজন, যে সমস্ত জ্ঞানের কার্যকর উপকারিতা রয়েছে এবং যার ওপর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য কারও ছাপ বা সীল মোহর করা হয়নি। তাকে একমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ ও কার্যকর (Sciences) জ্ঞান বলা যেতে পারে। অন্ধকার যুগ ও ধর্মদ্রোহিতার আমলে (যখন ইউরোপ নিজের বুদ্ধিমত্তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল এবং ধর্মীয় সত্যাসত্য সম্পর্কে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করার উপযোগী ছিল না।) ঐ সমস্ত জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর যে ময়লা-আবর্জনা পড়েছিল তাকে পরিষ্কার করে দেবে এবং তাকে এভাবে ঝেড়েমুছে নেবে যেমন মাটির স্তূপ হতে অথবা কাদা হতে কোন হীরক অথবা চমকপ্রদ মুক্তা লাভ করা যায়। তিনি উপকারী জ্ঞানসমূহকে নাস্তিকতা, ধর্মদ্রোহিতা ও ঐ সমস্ত ভুল ফলাফল হতে পরিষ্কার ও মুক্ত করে অর্জন করবেন যা জোরপূর্বক ঐগুলোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য হতে যে সমস্ত জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন তার মধ্যে ঈমানের প্রাণ সঞ্চার করবেন এবং তাকে ধর্মীয় রঙে ডুবিয়ে নিজস্ব করে নেবেন। এ দ্বারা বৃহৎ ও বিপ্লবী ফলাফল সৃষ্টি করবেন যা মানবতার জন্য অতিশয় উপকারী ও মঙ্গলজনক হবে এবং তার এ ব্যবস্থার ফলাফল তার পাশ্চাত্য শিক্ষকদের শিক্ষা হতে অধিক মূল্যবান হবে। তিনি যেখানে পৌঁছবেন সেখানে তার শিক্ষকদের চিন্তা ও খেয়াল পৌঁছেতে সক্ষম হয়নি।

তিনি ঐ ব্যক্তি যিনি পাশ্চাত্যকে নিজের ইমাম, পরিচালক ও নিজকে পাশ্চাত্যের অনুসরণকারী শিষ্য ও মুখাপেক্ষী বলে মনে করেন না, বরং তিনি মনে করেন যে, তিনি পাশ্চাত্যের একজন সহগামী ভ্রমণকারী ও সমসাময়িক ব্যক্তি। অবশ্য তারা বিশেষ অবস্থার কারণে কতক জড় ও অর্থনৈতিক জ্ঞানে প্রাধান্য অর্জন করেছেন। তিনি পাশ্চাত্যের ঐ সমস্ত অভিজ্ঞতা হতে পাঠ গ্রহণ করবেন কিন্তু নুবূওয়াত (পয়গম্বরী শিক্ষা) যে আলো তাকে দান করেছে তা দ্বারা তাতে সংযোজন করবেন, বরং তিনি এ কথা মনে করবেন যে, তাকে পাশ্চাত্য হতে বহু কিছু অর্জন করার প্রয়োজন আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যেরও তার থেকে বহু কিছু অর্জন করার প্রয়োজন আছে। আর পাশ্চাত্য তার থেকে যা গ্রহণ করবে তা বহু গুণে উত্তম ও উন্নত হবে ঐ সমস্ত হতে যা পাশ্চাত্য হতে তিনি গ্রহণ করতে পারেন।

তিনি নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং জড়বস্তু ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের এক সুন্দর সমন্বয় সাধন করে এমন এক পথ, এমন এক জীবন

পদ্ধতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন যার প্রতি সম্মান দেখানো, যার অনুকরণ করার জন্য পাশ্চাত্যও বাধ্য হবে। ফলে চিন্তাধারা ও সভ্যতার পাঠশালার মধ্যে এমন এক পাঠশালার সংযোজন হবে যা বিশ্বের বৃহত্তম চিন্তাবিদগণকে চিন্তা ও মনোযোগের দাওয়াত দেবে এবং বৃহৎ জাতিসমূহকে কর্মের আমন্ত্রণ জানাবে। তা মুসলিম বিশ্বের অথবা কোন মুসলিম দেশের এমন উচ্চ মেধাসম্পন্ন সাহসী নেতার নমুনা হবে যার এ সকল দেশে (যেখানে প্রতি প্রকারের দলপতি ও নেতা প্রচুর সংখ্যক পাওয়া যায়) এখনও অভাব রয়েছে।

আমাদের এই সুন্দর হৃদয়গ্রাহী স্বপ্ন ও কল্পিত ব্যক্তি দেহে ও জ্ঞানে এতই শক্তিশালী হবেন যার পাশে যদি মুসলিম বিশ্বের অসহায় নকলপ্রিয় চাটুকার ও অনুগত নেতাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়, তবে তিনি ঐ মহৎ ব্যক্তির তুলনায় খুবই হীন বলে প্রতিপন্ন হবেন। চিন্তা, কল্পনা, সংকল্প, সাহস ও যোগ্যতায় নিম্ন মানের (PYGMIES) হবেন। প্রাচ্যের ঐ সরদার ও নেতা যারা এই অর্ধ শতাব্দিতে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন তারা কেউই নেতৃত্বের সেই উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারেননি এবং কেউ সেই সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেননি যা বর্তমান যুগে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কবি ইকবালের কবিতায় এ কথারই প্রতিফলন ঘটেছে :

نہ مصطفے ، نہ رضا شاہ میں ہے اس کی نمود
کروح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی -

অর্থাৎ মুস্তফা কামাল অথবা রেজা শাহ কারও মধ্যে এর প্রকাশ হয়নি। প্রাচ্যের আত্মা এখনও দেহের সন্ধানে রয়েছে।

মুসলিম দেশসমূহের কর্ম ও আধুনিক ইতিহাসের সর্ববৃহৎ কীর্তি

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতা উন্নতির শেষ সীমায় পৌঁছেছে। অন্য দিকে মুসলিম দেশসমূহ নিজেদের বিশেষ অবস্থা ও ঐতিহাসিক কারণে এতে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। সম্ভবত যদি ঐরূপ করতে পারা যায় বা করা হয় তাহলে তাদের জন্য তাদের আকীদা, জীবন পদ্ধতি, উদ্দেশ্য, বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এরূপ করা যেমন সম্ভব নয়, বৈধও নয় বা এটা তাদের জন্য ধর্মীয় মৃত্যু ও সামাজিক আত্মহত্যার সমতুল্য হবে। এই অবস্থায় অনুকরণ, অনুসরণ প্রত্যাখ্যানের মাঝে একটি সুরক্ষিত, উচ্চ ও সম্মানিত পথ রয়েছে। এটা কেবল

এই সমস্ত দেশের পদমর্যাদার উপযোগীই নয়, বরং তা নতুন ইতিহাসের সর্ববৃহৎ বিপ্লবী পদক্ষেপ এবং সময়ের সর্ববৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র চাহিদাও বটে। এটা হলো আধুনিক সভ্যতার নেতৃত্ব দান,এর মধ্যে জীবনের নতুন প্রাণ ফুঁকে দেয়া, একে সৎ উদ্দেশে ও যাত্রাপথের সঠিক গন্তব্য স্থানের সন্ধান দান করা, একে নুবুওয়াতের প্রদত্ত ঈমান ও প্রেমের মত দৌলতের সাথে পরিচিত করানো এবং এর সংশোধন ও পূর্ণতা দানের ব্যাপারে এমন খেদমত করা যা কেবল মুসলিম দেশসমূহই আঞ্জাম দিতে পারে এবং এই যুগে আর কেউ এই কাজে সাহস করে অগ্রসর হচ্ছে না।

শেষ কথা

এ কথা যতই তিক্ত ও অপ্রিয় হোক, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব সমষ্টিগতভাবে আত্মপরিচিত ও আত্মবিশ্বাসের দৌলত হতে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে। এই বিস্তৃত মুসলিম বিশ্বে যে সমস্ত দেশ স্বাধীন (হয়ত ঐ দেশ শত শত বছর হতে স্বাধীন অথবা তারা নিকট-অতীতে স্বাধীনতা লাভ করেছে) তার জ্ঞানে ও মানসিকতার দিক থেকে পাশ্চাত্যের এক প্রকার দাস। যেমন একটি পশ্চাৎপদ দেশ হয়, যে দেশ দাসত্বের পরিবেশে চক্ষু খুলেছে এবং বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী হয়েছে। কোন কোন সময় এই সমস্ত দেশের নেতাগণ রাজনৈতিক ময়দানে প্রশংসনীয় কথা বলেন। যে আবার কখনো যুদ্ধ জয় ও দেশের স্বাধীনতার জন্য জনগণের জান-মাল কুরবানী নিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

কিন্তু চিন্তাগত, সভ্যতা ও শিক্ষার ময়দানে তাদের মাঝে এই পরিমাণ আত্মবিশ্বাস, নির্বাচনের স্বাধীনতা ও সমালোচনার যোগ্যতা প্রকাশিত হয় না যতদূর একজন জ্ঞানী পূর্ণ বয়স্ক লোক হতে আশা করা যায়। অথচ ঐতিহাসিক দর্শনের এক স্বীকৃত নীতি এই যে, চিন্তা, সভ্যতা ও শিক্ষার দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্ব হতে অধিক বিপজ্জনক, গভীর ও কঠোর হয় এবং এর উপস্থিতিতে একটি ওয়াকিফহাল বিজয়ী জাতির নিকট রাজনৈতিক দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা তখন আর বাকি থাকে না। এই খ্রীস্ট্রীয় বিংশ শতাব্দির প্রথামার্ধে দুনিয়া দুই বিশ্ব মহাযুদ্ধ অতিক্রম করেছে এবং তৃতীয় বিশ্ব ধ্বংসকারী যুদ্ধের বিপজ্জনক ঘণ্টা বাজছে। এক দেশ অপর দেশকে দাস বানানো এবং কোন দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে গ্রাস করার বিষয়টি অবোধগম্য ও প্রায় অসম্ভব মনে করা হচ্ছে।[১]

---

১. কিন্তু আফগানিস্তানের ওপর রাশিয়ার সামরিক জবরদখল এই নীতিকে আহত ও সন্দিগ্ধ করেছে।

দুনিয়ার বড় শক্তিসমূহ বর্তমানে দিন দিন রাজনৈতিক ক্ষমতার স্থলে চিন্তাগত সভ্যতার প্রভাব ও সমমনা, সমনীতির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে এবং তা নিয়ে সন্তুষ্ট হচ্ছে। পাশ্চাত্যের এই চিন্তাগত নীতি ও মতবাদগত ঐক্যের প্রতি যদি দুনিয়ার কোন শক্তি চ্যালেঞ্জ করতে পারে এবং এ পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, তবে তা কেবল মুসলিম বিশ্বের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও তার ধর্মীয় ও নৈতিক দাওয়াত ও তার জীবন দর্শনই করতে পারে। কিন্তু একদিকে এই সমস্ত ঐতিহাসিক কর্ম পদ্ধতির কারণে যা আমি সামান্য বিস্তৃতির সাথে আমার রচিত "মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারলো"? গ্রন্থে বর্ণনা করেছি, মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্যের উত্থিত ও প্রসারিত শক্তির মুকাবিলার যোগ্য ছিল না।

তদুপরি যে শ্রেণীর লোক এই বিপ্লবী যুগে তাদের ভাগ্যের কর্ণধার হয়েছিল তারা (আমি পূর্বের এক পরিচ্ছেদে যার বর্ণনা দিয়েছি) সকলে পাশ্চত্যের কেবল মুখাপেক্ষীই ছিল না, বরং পাশ্চাত্যের ধাত্রীয় দুগ্ধ পানকারী শিশু ছিল। যাদের (মনোভাবগত) মাংস ও রক্ত এর দুগ্ধ ও কলিজার রক্ত দ্বারা প্রস্তুত হয়েছিল। অপর দিকে ঐ সমস্ত মুসলিম দেশের জনসাধারণ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের মধ্যে ঈমান ও আকীদার প্রভাব, নৈতিক বন্ধন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও প্রবৃত্তির প্ররোচনার মুকাবিলা করার যৎসামান্য শক্তি অবশিষ্ট ছিল (যা তা পাশ্চাত্য বহু দিন পূর্বে বঞ্চিত হয়েছে) তাকে পাশ্চাত্য বিভিন্ন উপায়ে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। তাদের বিভিন্ন কর্মপন্থার মধ্যে কোনটি দেখতে নিষ্পাপ ও উদার আর কোনটি বিষাক্ত ও দূষিত।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ইউনেসকো (UNESCO)-র সাহায্যে, পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের পরিকল্পনার মাধ্যমে, কখনও পাশ্চাত্য শিক্ষক ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের দ্বারা অনেক সময় সন্দেহ সৃষ্টিকারী এবং উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী এমন অসংযত সাহিত্য দ্বারা (যা স্রোতের ন্যায় মুসলিম বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করেছে) আবার কোন সময় জীবনের মানকে উন্নত ও জীবনকে আনন্দময় করার প্রলোভন দেখিয়ে ঘরে ঘরে টেলিভিশনের ব্যবস্থা করা দ্বারা সে শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করা হচ্ছে। অপর কোন সময় এ সমস্ত পশ্চাৎপদ দেশকে উদারতার সাথে সাহায্য করা হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত সাহায্যের শর্তাবলীর মধ্যে থাকে কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনের বিষয়। ঐ সমস্ত দেশের সরকার সেগুলো পূরণ করতে বাধ্য হয়।

পরিণামে ঐ সমস্ত দেশের মুসলিম জনসাধারণের স্বভাব ও সামাজিক রীতিনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, পাশ্চাত্য দূরে

অবস্থান করেও এই সমস্ত দেশের পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। ফলে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, দাসত্বের পুরাতন ঘর্ষিত রীতি হতে এই দেশগুলো মুক্তি পেয়েছে সত্য, অন্যান্য আরও জরুরী বিষয়ে তারা আরো অধিক পরিমাণে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ক্ষমতার কবলে গ্রেপ্তার রয়েছে। কবি আকবর মরহুমের সেই পুরাতন শ্লোকটির সুন্দর এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি এই মুসলিম দেশসমূহে যত্রতত্র দৃষ্ট হয় এবং তা এত দূর অগসর হবে, তা সম্ভবত কবির ধারণা ও কল্পনায়ও ছিল না।

کس رھے ھیں اپنے منقاروں سے حلقہ جال کا
طائروں پر سحر ھے ، صیاد کے اقبال کا

অর্থাৎ (পাখি) নিজ ঠোঁট দ্বারা জালের পরিধিকে কষে বাঁধছে, নিশ্চয় পাখিসমূহের ওপর শিকারীর কৃতকার্যতার যাদু বা মন্ত্র রয়েছে।

এই সমগ্র পরিবর্তন বা সংস্কারকর্ম প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ সমস্ত দেশের নেতাগণ বড়ই উদ্যোগী ও কর্মতৎপর। পাশ্চাত্যের আধুনিক মানুষগুলো এর চেয়ে অধিক কিছু করতে পারত না, অথচ এই নেতাদের কেউ কেউ ইসলামের দাবিদার ও কেউ কেউ ইসলামী শক্তি ও ইসলামী ব্লকের কথাও আওড়ায়। তারা যেভাবে অনায়াসে আমেরিকা ও রাশিয়ার সংস্কার ও শিক্ষার পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছে, যেভাবে তাদের বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞদেরকে এ সমস্ত দেশের মনোভাব ও স্বভাব পরিবর্তন করার নকশা বানাবার অনুমতি দেয়া হচ্ছে, যেভাবে আবেগ, উদ্যম, ইচ্ছা ও দৃঢ়তা সহকারে টেলিভিশনকে (কোন মৌলিক পরিবর্তন ও সংশোধন ছাড়া) ঘরে ঘরে পৌছাবার চেষ্টা চলছে এবং বিভিন্ন উপায়ে একে অধিক পরিমাণে সহজলভ্য করা হচ্ছে, যেভাবে প্রাচ্যবিদদের কোন কোন সৌভাগ্যবান শিষ্যদেরকে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উপায় ও সুযোগ যোগাড় করে দেয়া হচ্ছে এবং যেভাবে মহিলাদের সীমাহীন স্বাধীনতা, পর্দাহীনতা, সহশিক্ষা ব্যবস্থা করা হচ্ছে যেভাবে চলচ্চিত্র শিল্পের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে, তদ্দ্বারা সন্দেহ হয় যে, এ সমস্ত নেতা ঐ সমস্ত পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে কার্যক্রমের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, বরং পাশ্চাত্যের হীন ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাথে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে শরীক আছেন। আর হয়ত তারা দেশের জনগণকে ধর্মীয় মর্যাদাবোধ, চারিত্রিক অনুভূতি, ভাল মন্দের প্রভেদ এবং লজ্জা ও নির্লজ্জতার পার্থক্য হতে অপরিচিত করতে চাচ্ছেন।

অবশ্য জনগণ কোন কোন সময় তাদের ব্যক্তিগত বিপথে চলা এবং আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যবাদিতার পথে বাধা সৃষ্টি করে। যে কোন সময়েই একটি ধর্মীয় বিপ্লব ও ধর্মীয় পুনর্জীবনের আন্দোলন তাদের ক্ষমতার জন্য বিপদ হতে পারে। এটা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, যদি পরিবর্তন অথবা সংশোধনের কার্যকলাপ কয়েক বছর আরও চলতে থাকে এবং চারিত্রিক অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলার প্রকাশ আর কিছু সময় স্বাধীনভাবে সংঘটিত হয়,তবে এ সমস্ত দেশের এই প্রজন্মে, যাদের মধ্যে নতুন কিছু গ্রহণ করার পূর্ণ আগ্রহ বিদ্যমান, তারা এত বেশি প্রভাবিত হয়ে যাবে যে, তারা এই আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যপন্থী হওয়ার পথে কোন উল্লেখযোগ্য বাধা দিতে আর সক্ষম হবে না। এই নতুন প্রজন্ম এই বিষাক্ত পরিবেশে প্রতিপালিত হওয়ার পর তাদের এই অন্যায়ের পক্ষে কোন বিরোধিতা বা এর সঙ্গে মতবিরোধের কোন শক্তিই বাকি থাকবে না। এটা তো সন্দেহতীত যে, (এবং এর চিহ্ন প্রকাশ পেতে আরম্ভ হয়েছে) এ সমস্ত দেশের একটি বৃহৎ দল, বিশেষ করে সমৃদ্ধ সুখী পরিবার ও ক্ষমতাশালী শ্রেণী এই চারিত্রিক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে যাবে। পাশ্চাত্য সে রোগের পূর্ণ শিকার হয়ে গিয়েছে। এরপর সম্ভবত সমগ্র দুনিয়ার এমন কোন সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি বাকি থাকবে না, দুনিয়া পুনঃআধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক পবিত্রতাতর ক্ষেত্রে যারপর নির্ভর করতে পারবে।

পাশ্চাত্য কখনও মুসলিম বিশ্বের অকৃত্রিম বন্ধু হতে পারে না এবং মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে তাদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতি থাকতে পারে না। এটা অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য, ক্রুসেড যুদ্ধ এবং উসমানী খেলাফতও এর সাক্ষ্য। পাশ্চাত্য দেশসমূহের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এটা সত্য ও বাস্তব যে, কেবল মুসলিম বিশ্বই পাশ্চাত্যের বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার চ্যালেঞ্জ করতে পারে এবং এমন একটি নতুন ব্লক গঠন করার যোগ্যতা রাখে, যার ভিত্তি হবে একটি স্বতন্ত্র জীবন দর্শন ও বিশ্বব্যাপী আহ্বান। এই অনুভূতি জাগরিত হয়েছে এজন্য যে, অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের ভাণ্ডারে মুসলিম বিশ্ব অত্যন্ত সমৃদ্ধ যা এর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং তা পাশ্চাত্যের শিল্প, ব্যবসায় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার্থে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। অবশেষে বলা যায়, এটা মানব প্রকৃতির এক দুর্বল চাহিদা যে, মানুষ যখন চিকিৎসার অযোগ্য কোন রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার এ কথায় শান্তি আসে যে, অন্যান্য লোকও তার মত এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তখন সুস্থ ও রোগীর মধ্যে যাতে কোন পার্থক্য বাকি না থাকে।

মানব প্রকৃতির এই দুর্বলতা হতে ঐ সমস্ত লোক রক্ষা পায় অথবা তার ওপর জয়ী হয় যাদের মধ্যে পয়গম্বরদের (আলাইহি মুসাল্লাম) শিক্ষার প্রভাব, খাঁটি আল্লাহভীতি ও সত্য মানবপ্রেম সৃষ্টি হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত পাশ্চাত্য শত শত বছর এই সম্পদ হতে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্যের ক্ষমতা ও কৃতকার্যতার ইতিহাস পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, যে সমস্ত দেশ তাদের অধীনস্থ হয়েছে তাদের মধ্যে এই নৈতিক অপবিত্রতা ও অবক্ষয় নিশ্চয়ই অনুপ্রবেশ করছে। এই নৈতিক অবক্ষয় তাদের প্রধান ও নিত্য সহচর। যেমন কোন সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ গ্রন্থকার ও সমালোচকের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ প্রাচ্যের দেশসমূহে নৈতিক বিশৃঙ্খলা বিস্তার ও সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করেছে। খৃস্ট ধর্মের অনুসরণকারী পাশ্চাত্য তাদের ধর্ম বিশ্বাসে যদি সন্দিগ্ধ ও সংশয়ী (Agnostic) হয় এবং যদি তাদের আধুনিকতা ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের সীমা পর্যন্তও পৌঁছে দেয়, তবুও মুসলিম জাতি ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে তারা গোঁড়া খৃস্টান। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের জন্মশত্রু ও রক্তপিপাসু ইহুদীদের সাথেও আপস করে ও করতে পারে এবং তাদেরকে মুসলমানদের ওপর প্রকাশ্যে প্রাধান্যও দিতে পারে ও দিচ্ছে।

মুসলিমদের ব্যাপারে এই গোঁড়ামি তাদের অভ্যাস ও স্বভাব হয়ে গিয়েছে। অবস্থা যা-ই হোক, তাদের সুযোগ-সুবিধা তাদের নিকট প্রতিটি জিনিস হতে প্রিয় ও আদরণীয়। এ কথা বার বার পরীক্ষা করা হয়েছে যে, যদি কোন ইসলামী শক্তির সাথে কোন অনৈসলামী শক্তির সংঘর্ষ হয়, তা হলে তারা সর্বদা অনৈসলামী শক্তির পক্ষে খোলাখুলিভাবে থাকে অথবা পর্দার আড়ালে থেকে অনৈসলামী শক্তির সাহায্য করে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে আরব ইহুদীর সংঘর্ষ দিবালোকের মত এ কথা প্রমাণিত করে দিয়েছে যে, মুসলমানদের কোন সম্প্রদায় অথবা দল কোন পাশ্চাত্য অথবা প্রাচ্য ব্লক হতে কোন আন্তরিকতাপূর্ণ সাহায্য ও বন্ধুত্বের আশা করতে পারে না। মুসলমানদেরকে প্রতিটি পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের সময় আল্লাহর ওপর, নিজ বাহুবল ও নিজ উপায়-উপকরণের ওপর ভরসা করা উচিত।

মুসলিম দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ ও পরিচালকদের বোঝা উচিত যে, লক্ষ্যবিহীন আধুনিকতা, পশ্চিমা সভ্যতা, এর সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলা দ্বারা যদিও সাময়িকভাবে তাদের ও তাদের স্থলবর্তী লোকদের লাভ হচ্ছে কিন্তু সমষ্টিগতভাবে জাতির যেরূপ ক্ষতি হয়েছে এবং যেরূপে এর মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে, শত শত বছরের চেষ্টায়ও এর ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হবে না। এ সমস্ত মুসলিম জাতির মধ্যে বহু

দুর্বলতা ও জটিলতা থাকা সত্ত্বেও শক্তিশালী ঈমানী আবেগ, আল্লাহ্ তা'আলার নামে প্রাণ দেয়ার জযবা, আনুগত্য, বাধ্যতার স্বভাব, অকপটতা ও ভালবাসার উদ্যম যথেষ্ট পাওয়া যায়। চারিত্রিক এই সকল বৈশিষ্ট্য হতে দুনিয়ার অধিকাংশ বস্তুবাদী জাতি বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে। সমস্ত মুসলিম দেশের জনসাধারণ দুঃখজনক অজ্ঞতা ও পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও এমন উত্তম কাঁচামাল বা উপকরণ যা দ্বারা শ্রেষ্ঠ মানব তৈরি করা যেতে পারে। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হলো তাদের ঈমান ও অকপটতা এবং তাদের সরলতা ও আবেগপ্রবণ উদ্দীপনা।

এ শক্তি বার বার আশ্চর্যজনক কীর্তি সম্পাদন করেছে এবং কোন কোন সময় অসম্ভবকেও সম্ভব করেছে এবং যখন কোন সময় এই সমস্ত দেশের ওপর জটিল বিপদসংকুল সময় এসে পড়ে তখন মুসলিম জনসাধারণের এই ঈমানী আবেগ ও অকপটতা ও সরলতা কাজে আসে। নিখুঁত সত্যপ্রিয়তা ও বাস্তবাদিতার জন্য এই শক্তির কদর করা উচিত এবং এদের এই শক্তিকে দেশের হেফাজত, মজবুতির জন্য ও বিশ্বে কোন বড় ভূমিকা আদায় করার জন্য বৃহত্তম নির্ভরশীল সম্পদ মনে করা উচিৎ। কিন্তু এই আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যের প্রভাবে ঐ সমস্ত জনগণের শক্তিতে ঘুণ লেগে যাচ্ছে এবং তাতে এক নৈতিক ক্যান্সার সৃষ্টি হচ্ছে যার চিকিৎসা অসাধ্য।

শিক্ষা ও শিল্পে পাশ্চাত্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও অগ্রগতি অনস্বীকার্য। তাদের এই সফলতার প্রতি চক্ষু বন্ধ করে রাখা বুদ্ধিমানের কথাও নয় এবং ধর্মের শিক্ষাও নয়, কার্যত এট সম্ভবও নয়। মুসলিম বিশ্বের সম্মুখে কেবল দু'টি পথ উন্মুক্ত, প্রথমত তাদের বিস্ময়কর উন্নতি দ্বারা জাদুগ্রস্ত হয়ে তাদের পূর্ণ জীবন দর্শন, বিশ্ব জগত সম্পর্কে ধারণা, অদৃশ্য জগতের জ্ঞান ও আকীদা, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের নৈতিক মূল্যবোধ ও তাদের জীবন পদ্ধতি তথা সব কিছু গ্রহণ করা এবং নিজেদের অস্তিত্ব তাদের ছাঁচে সম্পূর্ণভাবে ঢালাই করার চেষ্টা করা। এটা করতে হলে নিজেদের মূল প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করতে হবে যা নির্লজ্জ ধর্ম ত্যাগ ও আত্মিক আত্মহত্যার সমতুল্য এবং ঐ মানবগোষ্ঠির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করা যার শেষ ভরসা হল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মত।

এই উম্মত লক্ষ্যহারা হলে, অপ্রয়োজনীয় পরিশ্রম ও লাভবিহীন শ্রমে আত্মনিয়োগ করলে দীর্ঘ ও জটিল মনোযুদ্ধ, আত্মিক অশান্তি, মানসিক শক্তি অপচয় ও সময়ের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হবে না। এটা একটি সুনির্মিত, মজবুত

অট্টালিকাকে বিধ্বস্ত করা, যার ধ্বংসাবশেষের ওপর অপর একটি সৌধ নির্মাণের কাঁচামাল ও উপকরণ আর নেই, এর যোগ্য স্থপতিও নেই, জলবায়ু ও পরিবেশের সঙ্গে এর সামঞ্জস্যও নেই, অতীতের সাথে কোন সম্পর্কও নেই। মুসলিম বিশ্বের যে যে অঞ্চলে ও যে সমস্ত দেশে এই চেষ্টা চলছিল তা কোথাও কৃতকার্য হতে পারেনি। যখনই এই অকৃত্রিম ও অস্বাভাবিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয় এবং জনসাধারণের প্রিয় ও কাজকর্ম প্রকাশ করার সুযোগ আসে তখনই তারা যত শীঘ্র সম্ভব এই ঝুলকে নামিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে। কারণ সেগুলো তাদের শরীরের গঠন, আত্মার প্রকৃতি ও সৃষ্ট স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। বর্তমানে তুরস্কে দেখা যাচ্ছে ও মিসরেও, সিরিয়ায়ও অতি শীঘ্র এটাই দেখা যাবে।

দ্বিতীয় পথ হল এই যে, পাশ্চাত্য হতে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্প কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যা ও গবেষণালব্ধ আবিষ্কারসমূহ যেগুলোর সম্পর্ক অভিজ্ঞতা,বাস্তবতা ও মানব পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের সাথে রয়েছে সেগুলোকে প্রশস্ত মনে গ্রহণ করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। অতঃপর সেগুলোকে ঐ আল্লাহপ্রদত্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও ইজতিহাদের (ইসলামী জ্ঞানের সুপণ্ডিতদের অনুসন্ধানী তৎপরতা) সাহায্যে ঐ সমস্ত উচ্চ উদ্দেশ্যের অধীন ও খাদিম বানিয়ে দেয়া, যা শেষ নবী ﷺ ও শেষ কিতাব (কুরআন) তাদেরকে দান করেছে এবং যার কারণে তারা শ্রেষ্ঠ উম্মত ও শেষ উম্মতের উপাধি পেয়েছে। উপায় ও উদ্দেশ্যাবলীর এটা এক অতি সুন্দর মিলন, যা থেকে বর্তমানে পাশ্চাত্য বহির্ভূত ও প্রাচ্য বঞ্চিত। পাশ্চাত্য কেবল শক্তিশালী উপায়-উকরণসমূহের পুঁজিতে পুঁজিবান বটে, তবে ভাল উদ্দেশ্যাবলী হতে শূন্যহস্ত। প্রাচ্য (ইসলামী) ভাল উদ্দেশ্যাবলীর একমাত্র ধারক-বাহক নিঃসন্দেহে কিন্তু প্রভাবশালী উপাদানসমূহ হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

পাশ্চাত্য সব কিছুই করতে পারে কিন্তু করে না। আরো ভাল কথায় বলা যায় তারা করতে জানে না। ইসলামী প্রাচ্য সব কিছুই করতে চায় কিন্তু কিছুই করতে পারে না। এই সুস্থ-সুষ্ঠু উপাদানের সমন্বয়ে ও সংমিশ্রণে জগতের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয়া যেতে পারে এবং তাদেরকে আত্মহত্যা ও আত্মদহনের পথ হতে সরিয়ে ইহকাল ও পরকালের চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের পথে পৌঁছে দেয়া- এটা এমন এক কীর্তি হবে যা ইতিহাসের প্রবাদ ও জগতের ভাগ্য পরিবর্তন করে ছাড়বে। এই কার্য এই উম্মতই সমাপ্ত করতে পারবে। কারণ তারা শেষ নবী ﷺ-এর স্থলবর্তী এবং তাঁর শিক্ষার বাহক ও রক্ষক। এ কারণে মুসলিম বিশ্বের একটিই ঘোষণা, পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, সমুদ্র ও মহাশূন্যে গর্জিত হবে।

কবির ভাষায় যা এই :

عالم همه ویرانه زچنگیزی افرنگ
معمار حرم باز به تعمیر جهاں خیز

অর্থাৎ সমস্ত জগত বিজন প্রান্তর হয়ে গিয়েছে, চেঙ্গিসী-ফিরিঙ্গীদের জুলুমে ও উৎপীড়নে। হে হেরেমের স্থপতি! আবার জগতকে গঠন করার জন্য গাত্রোত্থান কর।

প্রাচ্যের এক সাহসী ও উদ্দীপনাময়ী দেশ জাপান এই পদক্ষেপের এক অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে খুবই নীচু মানের পরীক্ষা করেছে। তারা পাশ্চাত্য হতে জ্ঞান ও শিল্পের শিক্ষা অর্জন করেছে এবং এমন লাভবান হয়েছে যে, শিক্ষক ও শিষ্যের মধ্যে এখন আর পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। এর সঙ্গে তারা নিজ বিশ্বস্ততা, নিজের সভ্যতার বিশেষত্ব ও ঐতিহ্য পুরোপুরি বহাল রেখেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সভ্যতা বর্তমান সময়ের সাথে মিল রাখে না, এতে কোন উপকারিতাও নেই এবং মানব খেদমতের কোন দিকও নেই, এর বিশ্বজনীন বার্তাবাহক হবার যোগ্যতাও নেই।

এটা কতক পুরাতন বিশ্বস্ত ঐতিহ্যের সমষ্টি যাকে নতুন জাপান নিজ বক্ষে লাগিয়ে রেখেছে, এটা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি, নিজেদের অতীতের সাথে সম্পৃক্ততার এক মনোহর ভঙ্গি যা তারা এখনও ছেড়ে দেয়নি। কিন্তু মুসলিম দেশসমূহের ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের নিকট এমন ধর্ম, এমন শরীয়ত ও এমন আইন রয়েছে, যার জন্য পুরাতন নতুনের পরিভাষা অর্থহীন। ইসলামের এমন এক সভ্যতা রয়েছে যার ভিত্তি চিরস্থায়ী প্রকৃতির ওপর স্থাপিত এবং তা এমন এক বৃক্ষ যার বসন্তকাল সর্বদা বিরাজ থাকে, যা কোন সময়ই বৃদ্ধির শক্তি, ফল, ফুল ও প্রজনন যোগ্যতা হতে বঞ্চিত হয় না। এই প্রেক্ষিতে এ সমস্ত দেশের জন্য আধুনিক জ্ঞান ও শিল্প এবং নিজস্ব চিরস্থায়ী আকীদা ও প্রকৃতির মধ্যে একতা সাধন ও উভয়ে পরস্পরে সাহায্যকারী হওয়াতে নিশ্চিতভাবে কোন অসুবিধা হতে পারে না এবং এর ফলাফল ঐ প্রথম পথের চেয়ে অনেক বেশি বিপ্লবী ও বিশ্বজনীন প্রভাব বিস্তারকারী হতে পারে। জাপানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এটাই প্রকাশ পেয়েছে।

জাপান ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী দেশে এই চেষ্টা যেমন কাচ ও লৌহ এবং তুলা ও আগুনের সংমিশ্রণের তুল্য। কিন্তু একজন মুসলমানদের নিকট এর মধ্যে কোন

বৈপরীত্য ও প্রতিকূলতা নেই। তাদের নিকট যথার্থ দীন ও যথার্থ জ্ঞানের মধ্যে সংঘর্ষ সম্ভব নয়। তাদের নিকট জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ এবং এর প্রকৃত মালিক তারাই। তাদের নিকট উপাদানের ভাল ও মন্দ হওয়ার মীমাংসা এর ওপর নির্ভর করে যে, তা কোন উদ্দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদের নিকট প্রতিটি শক্তি, প্রতিটি জ্ঞান, প্রতিটি গবেষণা, প্রতিটি কার্যকর উপায় এ কারণেই সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তা আল্লাহ্ তা'আলার দীনের নির্দেশ মত ব্যবহৃত হয়ে সৃষ্ট জীবের উপকারে আসে। তাদের অবশ্য কর্তব্য, একে অশুদ্ধ স্থান হতে বের করে শুদ্ধ স্থানে ব্যবহার করা, একে ধ্বংস করার স্থলে গঠন করার উপায় বানানো।

কিন্তু এ কাজের জন্য এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, চিন্তার নির্ভীকতা, এমন ঈমান ও আন্তরিকতার প্রয়োজন, যা অনুকরণপ্রবণতা, প্রচলিত ধ্বনি, সাজসজ্জা এবং ব্যক্তিগত ও দলীয় সুবিধা-স্বার্থের মোকাবেলা করতে পারে যার জন্য আমাদের মুসলিম দেশসমূহের নেতাগণের খাঁটি আত্মত্যাগ, নিজ স্বার্থের ওপর অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া ও উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হওয়া অপরিহার্য। এ কাজে সফলতার ফল অথবা পুরস্কারস্বরূপ তারা তাদের দেশে মিত্রতার এমন স্থান লাভ করবেন যা অন্য কোন উপায়ে তাদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হতো না। অতঃপর তারা তাদের দ্বারা তাদের দেশ হয়ত ইমামতের এমন উচ্চ পদ লাভ করবে যা তারা বর্তমানে স্বপ্নেও দেখতে পান না।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় পূর্ণভাবে ঘুণ লেগে গেছে। এটা বর্তমানে কেবল যোগ্যতা ও জীবনের অধিকার হিসেবে বেঁচে থাকেনি, বরং বেঁচে আছে এ কারণে যে, দুর্ভাগ্যবশত অপর কোন সভ্যতা তার জায়গা নিতে প্রস্তুত হয়নি। বর্তমানে যত সভ্যতা অথবা নেতৃত্ব রয়েছে তা হযত পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণকারী এবং তার শুষ্ক আকর্ষণহীন প্রতিকৃতি মাত্র অথবা এত দুর্বল ও সহায়হীন যে, তার সাথে প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম। বর্তমানে যদি মুসলিম দেশসমূহ ও মুসলিম বিশ্ব সমষ্টিগতভাবে এই শূন্যতা পূর্ণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, যা পাশ্চাত্য সভ্যতার পতনের ফলে জগতে সৃষ্টি হবে, তাহলে তাদেরকে দুনিয়ার ইমামতের পদ পুনর্বার অর্পণ করা যেতে পারে যা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম অনুযায়ী এক সাহসী, শক্তিশালী ও কর্মপরায়ণ জাতি অথবা নেতৃত্বের প্রতি সমর্পণ করা হয়।

এখন ঐ নেতাদের সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন যে, পাশ্চাত্যের আজীবন অনুগত ও ভিখারী হয়ে থাকা উত্তম নাকি বিশ্বের নেতৃত্ব পরিচালনার উচ্চ পদ ও মানব জগতের হেদায়েতের উচ্চ আসন লাভ করা উত্তম। কারণ (নবীর পদের পর) এ

পদের অধিক কোন উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এর জন্য কি বাহ্যিক নাম ও খ্যাতি, পদমর্যাদা, আরাম-আয়েশ, জড় ও দৈহিক উদ্দীপনার উৎসর্গ করা অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ব্যাপার নয়? যদি তার জন্য শত শত প্রাণ উৎসর্গ করা হয়, তা হলেও প্রকৃত পক্ষে তা সস্তা ক্রয় এবং এতে লোকসান, ক্ষতি ও অনিষ্টের কোন ব্যাপারই নেই।

اے دل تمام نفع ھے سودائے عشق میں

اك جان كا زياں سوايسا زياں نهيں

অর্থাৎ হে মন! প্রেমের ক্রয়-বিক্রয়ে শুধু লাভই লাভ। একটি প্রাণের ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু এই প্রকার উৎসর্গে কোন ক্ষতি নেই।

এখন দেখতে হয় যে, কোন্ মুসলিম দেশ এই মহৎ কাজের জন্য সাহস করছে? এর চেয়ে অধিক বিপ্লবী, প্রশংসনীয় ও উজ্জীবন দানকারী কোন কাজ এই যুগে হতে পারে না। কারণ এর সম্মুখে ইউরোপের নব জাগরণের আন্দোলন, ফ্রান্সের বিপ্লব ও রাশিয়ার কমিউনিজমের দর্শন, কার্ল মার্কসয়ীয় আমন্ত্রণের কথা উল্লেখ করার যোগ্যও নয়। এর মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার মূল পদার্থ রয়েছে, সঞ্জীবনী ও বিপ্লবী যোগ্যতা লুক্কায়িত আছে, এ দ্বারা কেবল সেই দেশই নয় যে দেশে এর পরীক্ষা চলবে, বরং সম্পূর্ণ মানব জগতে চিন্তা ও কার্যক্রমের যে নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে এবং সত্যতা ও শান্তির যে পথ পাওয়া যাবে, তার সম্মুখে ঐ সমস্ত পূর্বের বিপ্লব যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এক ভবঘুরে সাহসিকতা মনে হবে অথবা এক শিশুসুলভ ভঙ্গির চেয়ে বেশি কিছু মনে হবে না।

এই মহৎ কাজ কেবল ঐ জাতিসমূহ, ঐ ধর্মাবলম্বীরা, ঐ দল ও ঐ ব্যক্তিবর্গ সমাপ্ত করতে পারে, যারা ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের অনুকরণ ও অনুসরণকারী এবং যারা দীনের সম্পূর্ণতা (তাকমীল) ও খাতুমে নবুওয়াতের পুরস্কার ও শুভ সংবাদ দ্বারা ভূষিত ও বরেণ্য হয়েছে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সমস্ত নেতা ও পরিচালকদের জন্য ঐ 'চিরন্তন বাণী' এখনও রয়েছে যার সাথে প্রথম যুগের মুসলমানদের হৃদয় ও কর্ণ পরিচিত হয়েছিল।

وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ - مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ

عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ـ

অর্থাৎ এবং (আল্লাহ্‌র) রাস্তায় জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা কর্তব্য। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই পূর্বে (প্রথম কিতাবসমূহে) তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবও (এ নামই রাখা হয়েছে যাতে জিহাদ কর) যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় এবং তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে (দীনকে) মজবুতির সাথে অবলম্বন কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

[সূরা হজ্জ : ৭৮]

এ লেখকের আরো অন্যান্য কিতাব

মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?

২. সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (১–৫ খণ্ড)
৩. নবীয়ে রহমত (সা.)
৪. সীরাতে রাসূল (সা.)
৫. প্রাচ্যের উপহার
৬. ঈমান যখন জাগলো
৭. নয়া খুন
৮. আমার আম্মা
৯. নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস
১০. আরকানে আরবাআ
১১. তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহ্বান
১২. হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া (র)
১৩. শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র)
১৪. সালাত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১৫. সিয়াম : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১৬. ইসলামী জীবন বিধান
১৭. কারওয়ানে মদীনা
১৮. ঈমান দীপ্ত কিশোর কাহিনী
১৯. বিধ্বস্ত মানবতা
২০. হজ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
২১. যাকাত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
২২. ছোটদের আলী মিয়া
২৩. মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
২৪. পুরানো চেরাগ (১ম খণ্ড)
২৫. পুরানে চেরাগ (২য় ও ৩য় খণ্ড)
২৬. সীরাতে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ) ১ম-২য় খণ্ড [যন্ত্রস্থ]
২৭. কারওয়ানে জিন্দেগী (১-৭ খণ্ড) [যন্ত্রস্থ]
২৮. খুতবাতে আলী (১-১০ খণ্ড) [যন্ত্রস্থ]
২৯. ইসলামে নারীর অধিকার [যন্ত্রস্থ]
৩০. আমার আব্বা [যন্ত্রস্থ]
৩১. ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যদা [যন্ত্রস্থ]
৩২. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)-এর জীবন ও কর্ম [যন্ত্রস্থ]